ধ্রুপদ ও খেয়ালের
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উৎপলা গোস্বামী এম.এ., পি-এইচ্. ডি.

ক্লাসিক প্রেস
৩/১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

DHRUPAD O KHEYĀLER UTPATTI O KRAMAVIKĀS
[Origin and Development of Dhrupad and Kheyāl]
by Utpalā Goswami
Price : Rs. 10/- (Rupees Ten Only)

প্রথম সংস্করণ : ১৯৭১

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ : অজিত দত্ত

প্রকাশিকা : হিরণ্ময়ী দেবী
'পূর্বাচল'
উদয়পুর, কলিকাতা-৪১

মুদ্রাকর : সৃষ্টিধর রায়
'শ্রীবাণী মুদ্রিকা'
১৩-সি, বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

পরম পূজনীয়

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

এবং

শ্রীমতী রাণী মুখোপাধ্যায়-এর

শ্রীচরণে—

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

পড়াশুনায় হাতে খড়ি আর সুরের সাধনা একই সঙ্গে আমার জীবনে সুরু হ'য়েছিল। তাই আজও কোনটীকে জীবন থেকে পৃথক করতে পারি না। পড়াশুনা আর গান একই সঙ্গে চলে আসায় গানের ব্যবহারিক দিকটার দিকে যত জোর দিয়েছি, ঔপপত্তিক জ্ঞানের তৃষ্ণা তত বেড়েছে। এরই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ।

যে বিষয়টী নিয়ে আমি গবেষণা করেছি সে সম্পর্কে বহু মত ও বহু পথ বর্তমান। আমাদের দেশের সংগীতের ইতিহাসটাই কিম্বদন্তীর আড়ালে চাপা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিম্বদন্তীর ওপরে ঐতিহাসিক কাহিনী দাঁড় করানো হয়েছে—চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এইগুলিই আজ আবার ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অথচ প্রাচীন সংগীত-শাস্ত্র-গ্রন্থের অভাব নেই। তাছাড়া মধ্যযুগের বিদেশী ঐতিহাসিকেরা রাজরাজড়ার উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে, সমাজ, সাহিত্য, চিত্রকলা সংগীত এরও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি সম্ভবমত ঐ সব সংগীত-শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারার একটা স্পষ্ট পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। কতটা সার্থক হয়েছি তার বিচার করবেন সহৃদয় পাঠকেরা।

তবে একটী কথা আমি এখানে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই এবং তা হচ্ছে এই যে, তথ্য অনুসন্ধানের সময় পণ্ডিত রতনজংকার-এর এই কথাটী আমি সব সময়ে মনে রেখেছি—"ধর্ম, ভাষা ও শিল্পের মত সংগীতও মানুষের সৃষ্টি। হতে পারে, সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগীত এসেছে। কিন্তু সব সংগীতই মানবধর্মী।"

'ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'- এই বিষয়টী নিয়ে গবেষণার কাজে আমাকে উৎসাহিত করেন, সংগীতরত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই; তাই এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষণে তাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

যে গবেষণালব্ধ ফল এই গ্রন্থ সেই গবেষণার কাজ আগাগোড়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁর অকৃপণ স্নেহ ব্যতীত এই গবেষণা সুষ্ঠুভাবে চালান সম্ভব ছিল না।

এই গবেষণার কাজে আরও যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতা লাভ করেছি তাঁরা হলেন শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার, শ্রীউদয়ভূষণ ভট্টাচার্য, এসিয়াটিক সোসাইটীর ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান শ্রীদ্বিজেন্দ্র গুপ্ত, সুজাতা গুহ ও অঞ্জলি ঘোষ দস্তিদার।

গ্রন্থে ভুল ত্রুটি থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাই দয়া করে কেউ যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তবে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার ইচ্ছা রইলো।

—উৎপলা গোস্বামী

ভূমিকা

ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতা পর্যালোচনা ক'রে একাদশ শতাব্দীতে মনীষী আল্‌বেরুণী বলেছিলেন, 'হিন্দুরা এক এবং অবিভক্ত এক জাতি'।[১] উনবিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছেন, "India offers unity in diversity",—অর্থাৎ ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা "The Music of India" বইতে (পৃঃ ১) হার্বার্ট.এ. পপ্‌লে লিখেছেন,—"ভারতীয় সংগীতে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে। এই সংগীতের আত্মা এক।" তিনি আরও লিখেছেন "ভারতবর্ষ সম্পর্কে যিনি জ্ঞানলাভ করতে চান, তিনি যদি উত্তর থেকে দক্ষিণে ভ্রমণ করতে থাকেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন বার বার একই ভারতবর্ষ কথা বলছে। একই রহস্যময় ভক্তির পরিবেশ—সমস্ত ভক্তের অন্তরে একই রকম ভক্তি ; বীর ও সাধুদের সম্পর্কে একই ধরণের কাহিণী ও কিম্বদন্তী প্রচলিত ; একইভাবে কৃষিকার্য চলছে—ব্যবসায়ও চলেছে একই ভাবে ; একই ধরণের পল্লীগৃহ এবং সমস্ত কলাশিল্পের পিছনে একই হৃদয়বৃত্তি কাজ করছে" (পৃঃ ১)। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, এই বিরাট ভারতবর্ষের প্রকৃতি এবং জনসাধারণেব মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য রয়েছে। সাংস্কৃতির অন্যতম ঐক্য-সূত্র সংগীত সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিচিত্ররূপ সত্ত্বেও সমস্ত রাজ্যের সংগীত একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। সংগীতের রাগ-রাগিণীর ভাণ্ডারে যেমন সিন্ধুর সৈন্ধবী, বংগের বাঙালী, সুরাটের সৌরাটী, কর্ণাটের কর্ণাটী, কলিংগের কালেংগরা, মুলতানের মুলতানীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে ; তেমনি মূল গায়নপদ্ধতিও দাঁড়িয়ে আছে একই ঐতিহ্যসমন্বিত ভিত্তির ওপরে।

ইদানীংকালে উত্তর ভারতীয় সংগীত এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত, প্রধানতঃ এই দু'টী নামে ভারতীয় সংগীত চিহ্নিত হয়েছে এবং দু'টী সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত

১। আলবেরুনীর পুরো নাম 'আবু রয়হান মহম্মদ ইব্‌নে আহ্‌মদ আলবেরুণী।' সুলতান মামুদের সময় (১১শ শতাব্দী) ইনি ভারতে আসেন। ইনি ভারতবর্ষ' সম্পর্কে যে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'কিতাব-আত্‌ তহকীক আল্‌-হিন্দ্‌'। এই গ্রন্থে উল্লিখিত মন্তব্য করা হয়েছে ।

হচ্ছে। আবার একদিকে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, ভজন, কীর্তন, রবীন্দ্র সংগীত এবং কত লোক-সংগীতের ধারা ; অন্যদিকে রাগমালিকা, কৃতি, পদম্, জাবলি, তিল্লানা, স্বরজাতি, জাতিস্বরম্, বর্ণম্—এমনি কত বিচিত্র ধারা। এগুলির গতি প্রকৃতি অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব—এই প্রবাহ ভারতের নদীগুলিরই মত। মানস সরোবর থেকে হিমালয়ের বুক বেয়ে যে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধুর ধারা সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিল তা নানাপ্রবাহে বিভক্ত হয়েছে, নানা ধারা এসে তাদের সঙ্গে মিশেছে, নানা নামে চিহ্নিত হয়েছে ; তারপর এসে মিশেছে একই মহাসাগরে। তেমনি, আজ যে সংগীত ধারাগুলিকে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের উৎসস্থল এক। যুগে যুগে যেমন ভারতের তীর্থক্ষেত্রে বহু মানুষের ধারা এসে মিলেছে এবং তার ফলে গড়ে উঠেছে এক বিশাল জাতি—ভারতবাসী ; ঠিক তেমনি যুগে যুগে নানা বিচিত্র সংগীতের ধারা ভারতীয় সংগীতকে পুষ্ট করেছে এবং মিশে গেছে ভারতীয় সংগীতের বিরাট কলেবরে। এই বিচিত্র ধারার মধ্যে রয়েছে 'ধ্রুপদ' এবং 'খেয়াল'। এই দুটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আমার আলোচ্য বিষয়।

এই পৃথিবীতে অনেক কিছুরই উদ্ভব ঘটে এবং অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। তবুও কবি বলেছেন—

"যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি সারা।"

এটা শুধু কবির বিশ্বাস নয়—এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। নদীর প্রাণচঞ্চল উচ্ছল ধারা হারিয়ে যায় মরুভূমির বালুকা-রাশির মধ্যে—কিন্তু সেইখানেই তার শেষ নয়। সেই হারিয়ে যাওয়া ধারাই অন্যত্র. অন্যভাবে এবং অন্যরূপে প্রবাহিত হয়, কিংবা অন্তঃসলিলা ফল্গু-ধারার মত অন্তরে রস বিস্তার ক'রে চলে। তেমনি জাতির প্রাণ-রস শুকিয়ে যখন মরুর সৃষ্টি হয় তখন তার সংস্কৃতির ধারা যায় সেই মরুতে হারিয়ে। যেমন এদেশে হারিয়ে গেছে সামগান, মার্গসংগীত এবং প্রবন্ধ সংগীতের ধারা। আজকের সংগীতের কলেবরে সেই সব ধারার প্রকাশ্য স্বাক্ষর খুঁজতে গেলেও আমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় সংগীতের অন্তরে তাদের মন্দাকিনী ধারা অব্যাহত। মূল ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কোনও জাতি জাতীয় সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলতে পারে না এবং তা করলে তা আর যা-ই হোক জাতীয় সংস্কৃতি হয় না। এ যুগের একটি স্বতন্ত্র সংগীত ধারার স্রষ্টা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "ভারতবর্ষের

বহুযুগের সৃষ্টি করা যে সংগীতের মহাদেশ তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়।......সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি।"[১] "তবুও যত দৌরাত্মই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হতে পারিনি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তাদের বজায় থাকে।"[২] তাই আমিও বলতে চাই যে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিচিত্র বিহঙ্গ আপন আপন ডানায় ভর করে মুক্ত আকাশের যেখানেই উড়ে চলুক তাদের "বাসাটা" (অর্থাৎ বুনিয়াদ) প্রাচীন ভারতীয় অভিজাত সংগীতের মহাদেশে।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। ধ্রুপদ এবং খেয়াল এই দু'টী ধারা স্বতন্ত্রভাবেই পরিচিতি লাভ করেছে অবশ্য অনেক পরে, কিন্তু ভারতের যে মূল সংগীত-কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে এইসব ধারাগুলির সৃষ্টি হয়েছে তা অতি প্রাচীন। কারণ ভারতীয় সংগীতের উৎস যে সামবেদ, তার রচনাকাল কমপক্ষে ১২০০—১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ।[৩] আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৫০০ থেকে খৃঃ পূঃ ২০০০-এর মধ্যে আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁরা ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়ে তোলেন সেই সভ্যতার যুগ শুধু ভারতের নয়, বিশ্বসভ্যতার একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই অধ্যায়ে রয়েছে সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের সঙ্গে সংগীতের স্বাক্ষর।

সিন্ধুসভ্যতার যুগ

ইদানীংকালে মহেঞ্জোদড়ো (সিন্ধু) ও হরপ্পা (পাঞ্জাব) খনন করে সিন্ধু-সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাকে বৈদিক-পূর্ব সভ্যতা ব'লে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৪] খনন কার্যের ফলে এই নূতন সভ্যতার যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে সংগীত সম্পর্কিত তথ্য কিছু কম নেই। এ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে ষ্টুয়ার্ট পিগট তাঁর Pre-historic India বইতে বলেছেন—"নাচের সঙ্গে সে যুগে করতালের সহযোগ থাকতো। এ ছাড়াও নৃত্যের সঙ্গে মৃদঙ্গ, বেণু বা বাঁশী,

১। সুর ও সঙ্গতি—পৃঃ ৮

২। 'সংগীতের মুক্তি', প্রবন্ধ—ছন্দ, পৃঃ ১৮১

৩। ম্যাক্সমুলার-এর মতে বেদ ও ব্রাহ্মণ-এর রচনা কাল এইরূপ। কোন কোন ঐতিহাসিক ঋক্‌বেদের রচনা কাল খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতক মনে করেন। উইন্টারনিৎস-এর মতে ঋক্‌বেদ সংকলনের বয়স খৃঃ পূঃ ২৫০০ বছরের বেশী নয়।

৪। সিন্ধু সভ্যতার কাল নির্ণয় সম্পর্কে মতানৈক্য বর্তমান। স্যার জন মার্শাল ও তাঁর অনুসরণকারীদের অনেকে সিন্ধু সভ্যতার কাল নির্ণয় করেছেন খৃঃ পূঃ ৫০০০ থেকে খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ। আবার কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সিন্ধু উপত্যকার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া কয়েকটি উপাদান থেকে অনুমান করেন যে, সিন্ধুসভ্যতার কাল খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দ। Mr. Gadd এবং Prof. Langdon অনুমান করেন যে, সিন্ধু সভ্যতার বয়স খৃঃ পূঃ ২৮০০ বছরেরও বেশী।

তন্ত্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, হার্প (harp) বা লায়ার (lyre) প্রভৃতি জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ ছিল। এগুলিতে ধ্বনিত হতো সাতটি স্বর।"[১]

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে আমরা জানতে পারছি যে, সাতটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণা, চামড়ার বিভিন্নপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যশীলা নারী ও নর্তকের ব্রোঞ্জের ভগ্নমূর্তি প্রভৃতি সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে যে সংগীতের ব্যাপক অনুশীলন ছিল এ নিদর্শনগুলিই তার প্রমাণ। অবশ্য ভারতীয় সংগীতের যে ধারা আজ অব্যাহত সেটা সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, একথা প্রমাণ করা কঠিন, বরং আমরা বৈদিক যুগের সংগীত থেকে ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশের পরিচয় সহজেই পেয়ে থাকি।

বৈদিক যুগের গান

আর্যদের সভ্যতা বিস্তারের সংগে সংগে যে সাহিত্য ভারতের মাটিতে স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছিল, তা বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত এই সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদ।

ঋক্‌বেদে ১০টি মণ্ডল বা অধ্যায় আছে। সবগুলি মণ্ডলে ১০২০টি (মতান্তরে ১০১৭টি) সূক্ত আছে। কণ্ব ও অঙ্গিরা বংশের মাতৃকদের উদ্দেশে এই সূক্ত বা গান-গুলি রচিত হয়েছিল। অষ্টম মণ্ডলের ৯২টি সূক্তের সমগ্রভাবে নাম প্রগাথ বা প্রগাথা। ঋক্‌বেদের নবম মণ্ডলের ১১৪টি সূক্ত সোমদেবতার বা চন্দ্র দেবতার উদ্দেশে রচিত। সোমলতা থেকে সোমরস আহরণ করার সময় এগুলি গাওয়া হ'ত এই গানও বৈদিক যুগের গান তথা সাম গান।

সামবেদের স্তোত্রগুলির সংখ্যা ১৮১০ বা ১৮০৮। যাগযজ্ঞের সময় উদ্‌গাতাগণ এগুলি গাইতেন। সামবেদ সংহিতা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম 'আর্চিক' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম 'স্তোভিক'। আর্চিকে যে ৫৮৫টি সূক্ত আছে তার মধ্যে ৫৩৯টি ঋক্‌বেদ থেকে নেওয়া এবং স্তোভিক-এর ১২২৫টি সূক্তের মধ্যে ১৯৪টি ঋক্‌বেদ থেকে নেওয়া। 'স্তোভ' অর্থ প্রশংসা অর্থাৎ দেবতা বা ঋষিদের উদ্দেশে প্রশংসাসূচক গানই স্তোভ।

আর্চিকের আবার তিন ভাগ—(১) পূর্বার্চিক, (২) উত্তরার্চিক এবং (৩)

(১) "Cymbals were used to accompany dancing, and in addition to this and the drum there were reed flutes or pipes, a stringed instrument of the lute class, and a harp or lyre, which is mentioned as having seven tones or notes"—Prehistoric India—Stuart Piggott, (Pelican Edition, 1961) P. 270

অরণ্য সংহিতা। পূর্বাচিক মূল সূত্রের সমষ্টি। উত্তরার্চিক প্রধানতঃ ত্রিঋচ্ (এই সূক্তগুলিতে তিনটি করে ঋক্ থাকতো বলে এই নাম) নিয়ে রচিত।

গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ্য ও উহ্—এই চারটি গানভাগ নিয়ে সামবেদের গাথা, গান বা সংগীতাংশ রচিত হয়েছে। গ্রামগেয় গান—মূল গান। উহ ও উহ্য গানের মূল স্বর ঐ গ্রামগেয় গান থেকেই সৃষ্টি হ'ত। অরণ্যবাসী ঋত্বিক ও সামগদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল অরণ্যগেয় গান এবং গ্রামবাসী, গোষ্ঠী বা সাধারণ শ্রেয়কামীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল গ্রামগেয় গান।

গ্রামগেয়গান গাওয়া হতো সাধারণ সমাজে। এতে পূর্বাচিকের (ছন্দরূপ আর্চিককে পূর্বাচিক বলে) সংযোজন ছিল। অরণ্যগেয়গান নির্বাচিত ছিল অরণ্যবাসী যাজ্ঞিকদের জন্য। এই গানকে অলৌকিক এবং পবিত্র হিসাবে গ্রহণ করা হতো। এই গানের অন্তর্ভুক্ত ছিল আরণ্যক সংহিতা। উহ গানগুলি গ্রামগেয়গান-এর মতই ছিল। উহ অর্থ উপযোগী ক'রে সংযুক্ত করা।

গ্রামগেয়গান সাধারণ সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের সমাজে তার আদর হয়। অন্যদিকে অরণ্যগেয়গান অরণ্যচারী অধ্যাত্ম শান্তিকামী ঋষি ও ঋত্বিকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। এই দু'প্রকার গানের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও দু'টাই যে বৈদিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৈদিক যুগ বলতে শুধু চারটি বেদের প্রচলন কালকেই বোঝায় না, উপনিষৎ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যগুলির প্রণয়ণ, সংকলন এবং প্রচলনকালকেও বোঝায়। তাই বৈদিকযুগের পরিসর ঋক্‌বেদের কাল থেকে 'শিক্ষা' ও 'প্রাতিশাখ্য'-এর কাল পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৩০০০—১ম শতাব্দ)। বৈদিকগান বা সামগানের প্রচলন এই কাল ব্যবধানের মধ্যেই ছিল। বৈদিকোত্তর যুগে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬০০ খৃঃ পূঃ ৫০০-এর মধ্যে গান্ধর্ব সংগীত তথা মার্গসংগীত নবজন্ম লাভ করে। বৈদিক সংগীতের উপাদান নিয়ে এই গান্ধর্বের কাঠামো রচিত হয়েছিল। রামায়ণ-এর যুগে (খৃঃ পূঃ ৪০০) গান্ধর্ব তথা মার্গসংগীতের প্রচলন দেখা যায়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে 'প্রবন্ধ সংগীতের' কথা পাওয়া যায়। ধ্রুপদ সংগীতের সৃষ্টি বহু পরে; তবে এটা এসেছে মার্গ—প্রবন্ধ সংগীতের ধারা বেয়ে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত

খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীকাল ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে রাগ-নাম কল্পনা, রাগরূপ, রাগবিকাশের মধ্য

দিয়ে রাগের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়। সমগ্র ভারতের সংগীতক্ষেত্রেই একটা শুদ্ধি-যজ্ঞের সূচনা হয়। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে রাগ-নামগুলিই তার প্রমাণ। এই শুদ্ধি-যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল আর্য ও অনার্য অধিবাসীদের দেশীয় ও জাতীয় গানের সুরগুলিকে পরিশুদ্ধ ক'রে অভিজাত রাগগোষ্ঠিভুক্ত করা। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের দেশীয় ও জাতীয় সুরগুলি এই সময় সংস্কৃত হয়ে অভিজাত রাগতালিকায় স্থান পেল বটে, কিন্তু তাই ব'লে এই তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ এই ধরণের কোন চিহ্ন রইল না, বরং সবগুলিই অখণ্ড ভারতের রাগ বলে গণ্য হতে লাগলো।

প্রখ্যাত তামিল নাটক 'শিলপ্পাদিকরম্'-এ দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন সংগীতের উল্লেখ আছে। এতে কট্টু (দ্রুত), আসই (লয়), তুক্কু (গুরু), অলবু (প্লুত) এবং চীর (অনুদ্রুত) প্রভৃতি কাল বা তালের পরিচয় আছে। তামিল সাহিত্য প্রধানত ইয়াল, ইসাই ও নাটকম এই তিনভাগে বিভক্ত এবং ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের নাম কুরাল, তুত্তাম, কৈক্কলাই, উলাই, ইলাই, বিলারি ও তায়ম। উত্তর ভারতীয় স্বড়জাদি সাতস্বর থেকে এরা নামে পৃথক, কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতি পৃথক ছিল না।

চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে লেখা রাজা সোমেশ্বর-এর 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে (১১৩১ খৃঃ) সংগীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই গ্রন্থে আলোচিত গীতবিনোদ (গীতাধ্যায়) ও বাদ্যবিনোদ (বাদ্যাধ্যায়) পার্শ্বদেবের 'সংগীত সময় সার' (খৃঃ ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা) এবং শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থের আলোচিত গীত ও বাদ্য অধ্যায়েরই অনুরূপ। সুতরাং দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গীতি, রাগ ও বাদ্যের অভিজাতরূপ, গতি ও বিকাশ প্রায় এক ধরণেরই ছিল।

এই সময় আমরা পাই সংগীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেবকে (১২১০—৪৭ খৃঃ)। শার্ঙ্গদেব দেবগিরি রাজ্যের যাদব বংশীয় রাজসভায় প্রধান সংগীতাচার্য ছিলেন। এই সময় মারাঠা সাম্রাজ্য দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জন্যই অনুমান করা চলে যে শার্ঙ্গদেব দক্ষিণ ও উত্তর ভারত—এই দুই অঞ্চলের সংগীত ধারারই সংস্পর্শে আসেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সংগীত-রত্নাকর' পাঠ করলে সেই কথাই মনে হবে। তবে তিনি দু'টি ধারার কোনও পার্থক্য নির্দেশ করেননি।

উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) এবং দক্ষিণ-ভারতীয় (কর্ণাটক)—এই দুই নামে ভারতীয় সংগীত পথকভাবে চিহ্নিত হয় শাঙ্গদেবের প্রায় ১০০ বছর পরে। তখন খিলজী সুলতানেরা দিল্লীর মসনদে সমাসীন। এইসময় চালুক্যরাজ হরিপালের

লেখা 'সংগীত-সুধাকর' গ্রন্থে এই দুটি পৃথক নাম দেখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ১৩০৯ থেকে ১৩১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতের সংগীতে পারসীক সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে এবং তার ফলে ভারতীয় সংগীতের মূল গায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন সূচিত হয়। তথাপি অনেকের মতে, এই সময়েও দক্ষিণ ও উত্তর সংগীতের এই দুটী স্পষ্ট ও পৃথক ধারার উৎপত্তি হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধব বিদ্যারণ্য প্রবর্তিত ১৫টী 'মেল রাগ তথা জনক রাগ এবং ৫০টী জন্য রাগ ভারতীয় সংগীতে বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট করলেও তার ফলে ভারতের অখণ্ড সংগীত ধারার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। তাই কারও কারও মতে যখন মাধব বিদ্যারণ্যের জনক ও জন্য রাগগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে পণ্ডিত রামামাত্য ২০টী জনক মেল ও ৬০টী জন্যরাগ এবং সোমনাথ ২৩টী মেল রাগ ও ৭৭টী জন্য রাগ সৃষ্টি করেন তখন থেকেই পার্থক্যের লক্ষণ সূচিত হয়। তারপর ১৭শ শতাব্দীতে বেঙ্কটমখী যখন ৭২টী মেল রাগ তথা মেল কর্ত্তার প্রচলন করেন তখন থকে বলতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণ—দুটী ধারা স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এই পার্থক্যও বৈচিত্র্যের জন্য পার্থক্য। কারণ সুর, তাল একটু হাল্কা এবং দ্রুত, কি ছোট তান দিয়ে সুরের বিস্তার, এমন কি রাগ-রাগিণীর নামের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মধ্যে ঐক্যসূত্র বর্তমান, কারণ উভয় সংগীতেরই ভিত্তি এক।

সংগীতের প্রবহমান ধারা

ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি বৈদিক যুগেই রচিত হয়েছিল; যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন আদিম লোকসংগীতের ধারা ও অনুশীলন সকল দেশেই বিদ্যমান ছিল। তাব পর থেকে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংগীতেব ধারা প্রবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন হিন্দু রাজা সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এঁদের মধ্যে কোনও কোনও নরপতি নিজেরাই সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাম করা যেতে পারে সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০—৩৭৫ খৃষ্টাব্দ)। সাহিত্যিক, কবি শাস্ত্রজ্ঞ এবং সংগীতানুরাগী হিসাবে তিনি অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তে তাঁকে 'কবিরাজ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর নামাঙ্কিত বহু মুদ্রায় তাঁর বীণা বাদনরত মূর্তি আছে।

সমুদ্রগুপ্তের পরে আর একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬—৬৪৭

খৃষ্টাব্দ)। তাঁর অর্থ ও অনুগ্রহপুষ্ঠ নালন্দা যেমন এশিয়ার বৃহত্তম বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তেমনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতেরও যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল। হর্ষবর্দ্ধন নাট্যকার ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

প্রতিহার বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ভোজের পুত্র মহেন্দ্র পালের রাজত্ব কালে (৮৮৫—৯১০ খৃষ্টাব্দে) শিল্পী, সংগীত, সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। 'কর্পূর মঞ্জরী' নাটকের রচয়িতা রাজশেখর মহেন্দ্র পালেরই সভাসদ ছিলেন।

সপ্তম শতাব্দী থেকেই ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ শুরু হয়, সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং এই সময় থেকেই মুসলমান যুগের শুরু, এই দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা জয় সিংহ, সোমেশ্বর, নান্যদেব, পরমর্দী, জগদেকমল্ল, হরিপাল, সোমরাজ প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের নাম পাই। এঁরা সবাই প্রাচীন ভারতীয় সংগীতেরই অর্থাৎ মার্গ এবং প্রবন্ধ সংগীতের চর্চা করেছেন। প্রাচীন সংগীতের সুবর্ণযুগের অবসান এই দ্বাদশ শতাব্দীতেই ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতে আবার নূতন করে জয়যাত্রা শুরু হয়।

মুসলমান রাজশক্তি উত্তরভারতে যত সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল দক্ষিণ ভারতে তা পারেনি। এঁদের রাজধানী ছিল উত্তর ভারতে এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারত তাঁরা কোন দিনই জয় করতে পারেননি। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব দক্ষিণভারত জয় করতে গিয়ে নিজের জীবনের অবসান ঘটান।

উত্তর ভারতে মুসলমান রাজশক্তির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। মুসলমান বাদশাহদের রাজসভায় হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর গুণী ব্যক্তিরাই স্থানলাভ করেছিলেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের মত ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে আরব ও পারস্যের সংগীতেরও মিশ্রণ ঘটেছিল। তার ফলে উত্তর ভারতের সংগীত ধারা নূতন পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের যুগেও, এমনকি তার পরবর্তী কালেও দেখা যায়, খাঁটী ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার লোকের অভাব হয়নি। পঞ্চদশ যোড়শ শতকে বৃন্দাবনের সংগীত চর্চাই তার প্রমান। পরবর্তী কালে প্রাচীন ধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে না গেলেও মুসলমান যুগ থেকে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল—তা চলতে থাকে এবং নূতন নূতন সংগীত ধারার সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনের ধারাতেই আমরা যেমন পেয়েছি ধ্রুপদ এবং খেয়াল, তেমনি পেয়েছি ঠুংরী; টপ্পা প্রভৃতি।

প্রথম অধ্যায়

উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে

ভারতীয় সংগীতের জয় যাত্রা সুরু বৈদিক যুগ থেকে। এই বৈদিক যুগের আরম্ভ ঋকবেদ থেকে। অন্যান্য বেদের মত ঋক্ বেদেরও 'সংহিতা' ভাগ আছে। সংহিতা অংশ ছন্দ বা কবিতার আকারে লেখা, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়, বরুণ, সোম, বিশ্বামিত্র, ব্যাসদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিদের স্তুতিবাচক এই মন্ত্রগুলিই প্রকৃত পক্ষে 'ঋক'। এই ঋক্‌গুলি সুর সহযোগে গাওয়া হ'ত।

ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস—সামবেদ

পূর্বার্চীক, আরণ্যক সংহিতা ও উত্তরার্চিক-এই তিনটী নিয়ে সামবেদের পাঠ-ভাগ গঠিত। গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্য—এই চারিটী গানভাগকে নিয়ে সামবেদের সংগীতাংশ গঠিত।

'সাম' শব্দের অর্থ সুর অথবা সুমিষ্ট স্বর। ঋক্ ছন্দের ওপর ঐ সুর সংযোজিত হয় এবং তা থেকেই সামগানের বিকাশ। 'সাম' অর্থ তাই স্বরযুক্ত ঋক্ এবং স্বরযুক্ত ঋক বা সামের সমষ্টিই সাম বেদ। এই সামবেদই ভারতীয় সংগীতের উৎস— একথা সংগীত-ঐতিহাসিকগণ বলেন। এই সাম গান থেকেই-সংগীতের ধারা অব্যাহত ভাবে চলে আসছে।

বৈদিকোত্তর যুগের সংগীত

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬০০ থেকে খৃঃ পূঃ ৫০০-এর মধ্যে বৈদিকোত্তর যুগের প্রারম্ভ। তখন আর্যরা ক্রমশ ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়ছিলেন এবং গ'ড়ে তুলছিলেন নূতন নূতন জনপদ, সৃষ্টি হচ্ছিল নূতন নূতন রাজবংশ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারার মধ্যে নূতন ভাবে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল।

এই নূতন ভাঙাগড়ার মধ্যে ভারতীয় সংগীত অক্ষুন্ন থাকলেও রূপে বা গঠনে ও বিকাশে নূতন পরিবর্তন এলো। এর ফলে আমরা দেখতে পাই মার্গ সংগীতের সৃষ্টি ও বিকাশ। এই যুগে সামগান সীমাবদ্ধ ছিল 'সামগ' ও 'যাগবিলাসী' ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকদের মধ্যে। এ ছাড়া শ্রুতিবচন, আশীর্বচন, অভিষেক, উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সামগানের প্রচলন ছিল। তারই পাশাপাশি নতুন ধারায় প্রবর্তিত আভ্যুদায়িক ও নিশ্রেয়মূলক মার্গসংগীতের প্রচলন হ'তে সুরু করে।

সামগানের সৃষ্টি যেমন ঋক্ ও প্রথমাদি স্বরের সমবেত মূর্তি থেকে, মার্গ

সংগীতও তেমনি সাহিত্যের সংগে লৌকিক ষড়জাদি স্বরের সমাবেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সামগানের মতই মার্গসংগীত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল না; কারণ বৈদিক সাহিত্যে সাধারণের অধিকার ছিল না এবং মার্গ সংগীতের স্বরের যে বাঁধন ছিল তাতে নৈপুণ্য লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমরা বৈদিকোত্তর যুগেই সাম গান ও মার্গসংগীতের পাশে আর এক শ্রেণীর সংগীত দেখতে পাই এর নাম দেশী সংগীত। অহোবলের 'সংগীত পারিজাত' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"মার্গ দেশীয় ভেদেন দ্বেধা সংগীত মুচ্যতে।" অর্থাৎ সংগীত দুরকমের: মার্গ ও দেশী—এই দু'শ্রেণীর সংগীতকেই সুখদায়ক বলা হয়েছে—

"তদ্দেশীয় মিতি প্রাহুঃ সংগীতং দেশভেদতঃ।
তদ্‌দ্বয়ং সুস্বরস্তানৈরুপেতং সুখসাধনম্॥"

অর্থাৎ দেশভেদে সংগীত পদ্ধতিও বিভিন্ন। তাই এই সংগীতকে দেশী সংগীত বলে। এই দু'রকমের (মার্গ ও দেশী) সুস্বরে গীত হ'লে সুখদায়ক হয়। দেশী সংগীত দেশ, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রকারে গাওয়া হ'ত। মার্গ এবং দেশী এই দু' শ্রেণীর সংগীতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মার্গ সংগীত আলাপ, তান, লয়, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি অলংকারের সমাবেশে সুসম্বদ্ধ এবং তার ধারাবহিকতা অক্ষুণ্ণ—অন্যদিকে দেশী সংগীতে এ সবেরই অভাব।

গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীত

'গান্ধর্ব' এবং 'মার্গ'—এই দুটি শব্দ নিয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই।[১] বৈদিকোত্তর যুগের মার্গ সংগীতই প্রকৃতপক্ষে গান্ধর্ব সংগীত। গান্ধার দেশের অধিবাসী সঙ্গীতকুশলী গন্ধর্বরাই প্রকৃতপক্ষে মার্গ সংগীতের স্রষ্টা। পূর্বে গান্ধার বলে' যে অঞ্চল অভিহিত ছিল তার প্রায় সবটাই আফগানিস্থানের পূর্বে অবস্থিত এবং অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান্ধারের ভৌগলিক অবস্থিতি সম্পর্কে বায়ুপুরাণে এইরূপ আছে:—

গান্ধার বিষয়ে সিদ্ধে
তয়োঃ পূর্যোই মহাত্মনোঃ

১। নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরত বলেছেন গন্ধর্বদের প্রিয় বলে বৈদিকোত্তর মার্গ-সংগীত গান্ধর্ব নামে পরিচিত হয়। এই গান দেবতাদের কল্যাণ ও প্রীতিকর ছিল—"অত্যর্থমিষ্টং দেবাণাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ" (২৮।৯)

তক্ষস্ত দিক্ষু বিখ্যাতা
রম্যা তক্ষশীলা পুরী
পুষ্করস্যাপি বীরস্ত বিখ্যাতা
পুষ্করাবতী ॥

এ থেকে বোঝা যায় তু'টি বিখ্যাত নগরীকে ধারণ করত প্রাচীন গান্ধার—একটি তক্ষশীলা এবং অপরটি পুষ্করাবতী বা পুষ্কলাবতী। তক্ষশীলা অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায়; আর বৃটিশ আমলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবং বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার জেলায় অবস্থিত পুষ্করাবতী। বর্তমানে এর নাম হয়েছে চারসাদা।

উপরোক্ত গান্ধারের অধিবাসী গন্ধর্বদেব প্রবর্তিত 'ত্রৌর্যত্রিক' বিদ্যাই সে যুগে ছিল গান্ধর্ব তথা বৈদিকোত্তর মার্গ সংগীত। গন্ধর্ব সামগানোত্তর, অথচ এই গান সামগানের গুণ ও প্রকৃতিধর্ম সংগীত। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্ব গানের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

"যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্য সমাশ্রয়ম্।
গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্॥"

এখানে 'তন্ত্রী' শব্দে বীণা বোঝাচ্ছে। নানা আতোদ্য বলতে বীণাদি তন্ত্রী-বাদ্যযন্ত্র, সুষির বা বাঁশী, ঘন ও মুরজাদি অনবদ্ধ। অর্থাৎ বীণাদি বাদযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সংগীতের নাম গান্ধর্ব:

"গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্"।
ত্রিবিধস্যাপি বক্ষ্যামি লক্ষণং চৈব কর্মভি:॥

স্বর, তাল, পদের সমবেত রূপ যে গান্ধর্ব সেগুলির পরিচয়ও দিয়েছেন ভরত। তিনি স্বরের পরিচয় দিয়েছেন তার অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলি নিয়ে। তাই তিনি 'স্বর' প্রসঙ্গে ষড়জাদি সাত স্বর, তাদের অন্তর্বর্তী সূক্ষ্মস্বর হিসেবে শ্রুতি, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, স্থান, সাধারণ. আঠার জাতিরাগ, অলংকার, ধাতু, বর্ণ, গীত ও বীণা প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন।

গান্ধর্বগানের আঙ্গিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাতে রয়েছে—

স্বর—স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতি (জাতি রাগ), চার বর্ণ, অলংকার, ধাতু ও গীত।

তাল—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক বা প্রবেশ, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলী, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, পাদ, ভাগ, পাণি প্রভৃতি।

পদ—ব্যঞ্জন, স্বর,বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি।

গান্ধর্বগানের যে উপাদান স্বর, তাল, পদ এবং তাদের মধ্যে স্বর সামান্যভাবে শ্রুতি ও গ্রামাদির বোধক হলেও তার নিজস্ব রূপ লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরকে নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে।

রামায়ণে কুশীলব যে গান গাইতেন সেটী গান্ধর্ব সংগীতই। সেই জন্যই রামায়ণ রচয়িতা তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন -"মার্গবিধানসংপদা। গানং দ্বিবিধম্। মার্গো দেশী চেতি। তত্র প্রাকৃতাবলম্বি গানং দেশী। সংস্কৃতাবলম্বি তু গানং মার্গ।"

মহাভারতের সমাজেও গন্ধর্ব গানের প্রচলন ছিল। মহাভারতে গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্সরাগণের নৃত্য-গীত, গাথা গান, শঙ্খ, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, স্তোম, তাল, লয়, মূর্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তবে গান্ধর্বগানের কি রূপ ছিল তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। রামায়ণে সাংগীতিক রূপ ও ভাবের কিছু উল্লেখ আছে।

'সংগীত রত্নাকরে'র প্রবন্ধ অধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব গান্ধর্বগানের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে গান্ধর্বগানের দু'টী শ্রেণীর কথা উল্লেখ আছে: মার্গ ও দেশী। গান্ধর্ব-গানের সূত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"অনাদিকাল ধ'রে গুরু শিষ্য পরম্পরায় যে সংগীত গন্ধর্বরা অনুশীলন ও প্রচার করেছে এবং যা নিয়ত বা গ্রহ-অংশ-মূর্চ্ছনাদিযুক্ত, মোক্ষপ্রদ ও কল্যাণকর তাকেই গান্ধর্ব বলে। আর বাগগেয়কারেরা গ্রহ অংশাদি দশ লক্ষণযুক্ত ক'রে যে দেশীয় ও জাতীয় সুর বা রাগগুলিকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন তাদের দেশীয় সংগীত বলে।"[১] প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গান্ধর্ব গানই পরবর্তী কালে পরিবর্তিত আকারে

১। অনাদিসম্প্রদায়ং যদ্ গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে।
নিয়তং শ্রেয় সো হেতুস্তদ্গান্ধর্বং জগুর্বুধাঃ॥
যত্তু বাগ্গেয়কারেণ রচিতং লক্ষণান্বিতম্।
দেশীরাগাদিষু প্রোক্তং তদ্গানং জনরঞ্জনম্॥

—সঙ্গীত রত্নাকর ৪।২—৩

এবং উপাদানে দেশী সংগীত রূপে আখ্যাত হয়। তাই দেশী শব্দ বলতে গ্রাম্য বা লোক সংগীত (Folk song) নয়—তা শাস্ত্রীয় গানেরই অংগীভূত।

শার্ঙ্গদেবের দ্বারা উল্লিখিত অনাদি সম্প্রদায় শব্দটীর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'অনাদি' শব্দের আভিধানিক অর্থ আ-হীন, উৎপত্তি শূন্য, অর্থাৎ যা কিছু থেকে সৃষ্টি হয়নি এমন। কিন্তু এই অনাদি শব্দের অন্য অর্থ স্বয়ম্ভূ ভগবান বা পরমেশ্বর অর্থাৎ আদি নেই যাঁর।

টীকাকার কল্লিনাথ ব'লেছেন—"গান্ধবং মার্গঃ। গানং তু দেশীত্যবগন্তব্যম্।" মার্গসংগীত বৈদিক সংগীতের মাল মশলা এবং রীতি নীতি নিয়ে রচিত। এই জন্য গান্ধর্ব-কে বৈদিকত্বের কৌলিন্য দান করা হয়। শার্ঙ্গদেবও এই জন্য 'অনাদি সম্প্রদায়ং' কথাটি গান্ধর্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। 'অনাদিসম্প্রদায়ং' সম্পর্কে কল্লিনাথ বলেছেন—"গন্ধর্বস্য বেদবদপৌরুষেয়ত্বমিতি সূচিতং ভবতি" অর্থাৎ কল্লিনাথ 'অনাদিসম্প্রদায়'-এর দ্বারা গান্ধর্ব সংগীতের বেদের মতই অপৌরুষেয়ত্ব সূচিত হয়েছে ব'লে মনে করেন। টীকাকার সিংহ ভূপাল বলেছেন—"তস্য গীতস্য গান্ধর্বং গানমিতি ভেদদ্বয়মুক্তং ভরতাদিভিঃ"—অর্থাৎ ভরত প্রভৃতিও গান্ধর্ব গানের পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। সিংহ ভূপাল 'অনাদিসম্প্রদায়ং' কথাটির অর্থ করেছেন এইভাবে—"গুরুশিষ্যপরম্পরয়া পবিজ্ঞানম্ তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্; শ্রেয়স ঐহিকসুখস্য স্বর্গাপবর্গরূপস্য হেতুঃ করণম্"। সিংহ ভূপালের এই উক্তি থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধর্বরা যে গান গাইতেন তা তাঁরা নিজেরা সৃষ্টি করেননি। সিংহভূপালের "অনাদিমান্যো যঃ সংপ্রদায়ো গুরুশিষ্য পরম্পরয়া পরিজ্ঞানম্, তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্"—এই থেকে বোঝা যায় যে বৈদিকোত্তর মার্গ-সংগীত সাম-সংগীতের (অর্থাৎ সামগান) মালমশলা ও নিয়মকে ভিত্তি ক'রে রচিত এবং সাম-সংগীত ও মার্গ-সংগীতের মধ্যে যোগ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় গুরুশিষ্য পরম্পরায়ক্রমে বিধিবদ্ধ অনুশীলন দ্বারা। তবে লোকপরম্পরায় কোন কিছু প্রবর্তিত এবং অনুশীলিত হলে পরবর্তী ধারায় আংশিক অথবা অধিক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হ'য়ে থাকে। কিন্তু এর ফলে মূল বস্তুর বা মূল রূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একথা মানতে হয় যে পরবর্তী মার্গ-সংগীতে যদি মেল, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, মূর্ছনা প্রভৃতির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে মার্গ-সংগীতের আগের রূপ যে বৈদিক সাম-সংগীত তাতে এ'সকলের ব্যবহার ছিল একথা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়।

মার্গ সংগীত বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে অহোবল তাঁর 'সংগীত-পারিজাত' গ্রন্থে বলেছেন—

"মার্গাখ্য সংগীতং ভরতাযা ব্রবীৎস্বয়ম্।

ব্রহ্মনোহধীত্য ভরতঃ সংগীতং মার্গ সংজ্ঞি তৎ।"

অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান॥

অর্থাৎ ভরতকে মার্গসংগীত শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং ভরত আবার তা শিখিয়েছিলেন অপ্সরা ও গন্ধর্বদের—মহাদেবের নিকট পরিবেশন করবার জন্য।

মার্গ সংগীত সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সংগীত রত্নাকর'-এ লিখেছেন—

"যো মার্গিতবিরিঞ্চাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।

দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তোঽভ্যুদয়প্রদঃ॥

'মার্গ' বলতে 'পথ' বুঝায়, আবার 'অন্বেষণ'ও বুঝায়। এক্ষেত্রে মার্গ অর্থ 'অন্বেষণ'ই ধরতে হবে এবং তা ধরলে এই শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ—বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মাদি কর্তৃক যা (চতুর্বেদ থেকে) অন্বেষিত হ'য়ে ভরতাদি কর্তৃক মহাদেব এবং অপর দেবগণের সম্মুখে অভ্যুদয় উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছিল তা-ই মার্গ সংগীত। 'মার্গ' শব্দের অর্থ পথ ধরলে উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ—বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রদর্শিত পথে ভরতাদির দ্বারা মহাদেব এবং অপরাপর দেবগণের সম্মুখে যে সংগীত প্রযুক্ত হয়েছিল তা-ই মার্গ সংগীত। গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগান রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজে প্রচলিত ছিল। গান্ধর্ব যে 'মার্গ' নামেও প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ রামায়ণের 'মার্গবিধানসংপদা' শব্দগুলি থেকেই পাওয়া যায়। বৈদিক সামগানের মত মার্গ-শব্দটি মঙ্গলবাচী ছিল; অর্থাৎ যে গান ছিল ছিল আভ্যুদয়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপার্থিব তাকেই মার্গ বলা হ'ত। অবশ্য 'মার্গ' শব্দের অর্থ যে বৈদিক সংগীতের পরবর্তী গান্ধর্বের বিশেষ বোধক 'যো মার্গিতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ' এই শব্দগুলি থেকে তা বোঝা যায়। শার্ঙ্গদেবের মতে মার্গিত বা অন্বেষিত অর্থাৎ চার বেদ থেকে সংগৃহীত গানই মার্গ: "সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ"। স্মার্ত যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত হ'ল—এই গান্ধর্বগান মুক্তির পথ দেখায় বলে মার্গ: "মোক্ষমার্গে স গচ্ছতি।" গান্ধর্ব তথা মার্গগানের যুগেও সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে সংগীত বিকশিত ছিল।

পাণিনি ও পতঞ্জলির যুগের সংগীত

পাণিনির যুগেও গান্ধর্ব সংগীতের বিকাশ আমরা দেখতে পাই। খৃঃ পূঃ পঞ্চম

শতকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী[১] ব্যাকরণ রচনা করেন। অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি যে ভিক্ষু ও নটসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় যে সে যুগের সমাজে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল।

খৃঃ পূঃ তৃতীয়—দ্বিতীয় শতকে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর সময়ে অভিনয়, মঞ্চ এবং নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। ছিল। তিনি রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রন্থিক, শোভনিক প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নাটকাভিনয়ের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া সংগীতের উপাদান হিসাবে মৃদঙ্গ, পিথর বীণা, দুন্দুভি, প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মহাভাষ্যে নৃত্য ও নর্তকীর কথাও রয়েছে।

জাতকের যুগে গান্ধর্ব গান

বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ইতিহাস হ'ল জাতক। এই বৌদ্ধ জাতকগুলি রচিত বা সংকলিত হয় আনুমানিক খৃঃ পূঃ তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে। জাতকগুলির সংখ্যা ৫৫০-এর অধিক। এর মধ্যে ১৫ খানি জাতকে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা থেকে সে যুগের সংগীতের পরিচয় পাওয়া যায়। যে জাতকগুলিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা আছ সেগুলির নাম হ'ল—নৃত্য-জাতক, ভেবীবাদক-জাতক, বিশ্বন্তর জাতক, কুশ-জাতক, অসদৃশ্য জাতক, সর্বদ্রংষ্ট্র-জাতক, গুপ্তিল-জাতক, ভদ্রঘট জাতক, বীণাস্থূণা-জাতক, চুল্ল-প্রলোভন-জাতক, ক্ষান্তিবাদি-জাতক, কাকবতী-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মৎস্য-জাতক, বিদুরপণ্ডিত-জাতক। এগুলি থেকে জানা যায় যে জাতকের যুগে বীণার প্রচলন ছিল। দু'একটি জাতকে গীত ও বাদ্যের কিছুটা নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে রাগ রাগিণীর নির্দিষ্ট কোন রূপের পরিচয় জাতকে পাওয়া যায় না। একমাত্র মৎস্য-জাতকে 'মেঘ গীতি' এবং গুপ্তিল-জাতকে উত্তম ও মধ্যম মূর্ছনা দু'টির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা চলে যে জাতকের যুগে রাগ, রাগিণী অলঙ্কার, শ্রুতি, তাল, মূর্ছনা প্রভৃতির প্রচলন থাকাই সম্ভব।

বৌদ্ধ-জাতক এবং গাথাগুলির (থের গাথা ও থেরী গাথা) পর সংগীতের

১। পাণিনির সময় নিয়ে মতভেদ আছে। স্যার উইলসন্ হাণ্টারের মতে পাণিনির সময় প্রায় ৩৫০ খৃঃ পূঃ; কিন্তু ম্যাকডোনেল তাঁর India's Past গ্রন্থে পাণিনির সময় নির্ধারণ করেছেন ৫০০ খৃঃ। গোল্ড স্টুকারের মতে তিনি খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকে এবং ম্যাকসমুলার, ওয়েবারের মতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। লেখা

উপাদান পাওয়া যায় হীনযানী বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রহ 'মহাবস্তু', 'ললিতবিস্তার', 'লঙ্কাবতার সূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'ললিতবিস্তারে' নৃত্য, গীত, বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ থাকলেও তাদের নির্দিষ্ট কোন রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতের কি রূপ ছিল তা আমরা জানতে পারি যে দুটি গ্রন্থ থেকে তা হচ্ছে নারদ রচিত 'শিক্ষা' এবং ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। এই দুটি গ্রন্থ যদিও পুরোপুরি সংগীত সম্পর্কীয় গ্রন্থ নয় তথাপি ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশকে বুঝতে হ'লে উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি অপরিহার্য।

নারদের 'শিক্ষা-র মূল আলোচ্য বিষয় বৈদিক ছন্দ। কিন্তু এই গ্রন্থে বৈদিক এবং লৌকিক সংগীতের মূলগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' মূলত নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কিত গ্রন্থ, কিন্তু নাটকে প্রযুক্ত গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভরত এই গ্রন্থে সে যুগের সংগীতের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের গ্রন্থে যে গানের আলোচনা করা হয়েছে তা গান্ধর্ব গান।

ভরতের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ভরত বিস্তারিত ভাবে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় সংগীত, নৃত্য এবং নাটকের আলোচনা করেছেন। ভরতের সময়ে গান্ধর্ব গানের গায়ন রীতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—ধর্মীয় স্থানের গান, রাজসভার গান, এবং নাটকের গান। ধর্মীয় স্থান অর্থাৎ মন্দিরে যে গান গীত হ'ত তা ছিল পবিত্র। রাজ সভার গান রাজদরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নাট্য-সংগীত অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'ত। ভরত এই নাট্য-সংগীত অবলম্বনেই সংগীতের আলোচনা করেছেন।

নারদী শিক্ষায় সংগীত

বৈদিক সামগানের প্রকৃত রূপ ও রীতিনীতি এবং সেই সঙ্গে লৌকিক, মার্গ ও দেশী সংগীতের সঙ্গে বৈদিকের সম্পর্ক এবং সে-সম্বন্ধে খুটিনাটি তথ্য জানতে হলে যে বইটি অপরিহার্য তার নাম 'শিক্ষা'। এই 'শিক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা নারদ।[১] এর গ্রন্থ রচিত হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে।

'শিক্ষা' গ্রন্থে নারদ লিখেছেন যে, বেদে উচ্চ, নীচ, মধ্য তথা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটী ব্যবহৃত হ'ত। এই স্বর তিনটী ছাড়াও সামগানের সাত

১। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষোড়শ-অষ্টাদশ পর্যন্ত আমরা চার জন নারদের নাম পাই। ঋক্‌বেদে ৩৩টা মন্ত্রের রচয়িতা হিসাবে ও নারদের উল্লেখ আছে।

স্বর—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট এবং লৌকিক সাত স্বর —ষড়্জ ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের পরিচয় দিয়েছেন। স্বর সংখ্যার তারতম্যে এবং প্রয়োগে গানগুলির বিচিত্র নাম হ'ত। যেমন আর্চিক, গাথিক, (গাথা), সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ গান। আর্চিকগানে থাকৃত একটী মাত্র স্বর, গাথিকে বা গাথায় দুটী, সামিকে তিনটী, স্বরান্তরে চার, ঔড়বে পাঁচ, ষাড়বে ছয়, এবং সম্পূর্ণগানে সাতটী স্বর। কিন্তু ঐ সাতটী শ্রেণীর গান একই সময়ে সৃষ্ট হয়নি, ক্রমবিকাশের ধারাকে অবলম্বন ক'রে সাতটী শ্রেণীর পূর্ণবিকাশ হ'তে কয়েক শ' বছর লেগেছিল। মোটামুটী সাতটি যুগের অবদান সাত স্বর ও সাত শ্রেণীর গান। বর্তমানে প্রথম চারটী স্তর লুপ্ত হয়ে গেছে। শেষের ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ শ্রেণী আজও অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

এর পরে নারদ পরিচয় দিয়েছেন স্বর-স্থানের। তিনি বলেছেন:

"উরঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চৈব স্থানানিত্রীণি বাঙ্‌ময়ে"

অর্থাৎ—উর, কণ্ঠ ও শির এই তিনটী স্থানে স্বর মন্দ্র, মধ্য, ও তার অথবা নীচ, মধ্য ও উচ্চরূপে প্রকাশ পায়। তিনি শাখাভেদে বৈদিক স্বরের প্রয়োগ সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে দেখিয়েছেন যে, বেদের প্রতিটি শাখা তাদের সামগানে পৃথক পৃথক প্রণালীতে সাত বা তার কম স্বরের সমাবেশ করতো।

'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথমে নারদ সামগানের প্রকৃত পরিচয় দান করেছেন। তারপর থেকে তিনি লৌকিক সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন: 'তান, রাগ, গ্রাম, মূর্ছনা, অলংকার—এই সব লৌকিক তথা মার্গ ও দেশী সংগীতের অঙ্গাভরণ, সেই সঙ্গে বৈদিক গানের লক্ষণ এবং স্বরূপ তিনি লৌকিক সংগীতের পাশে পাশে উল্লেখ ক'রে গেছেন।

স্বর, গ্রাম ও মূর্ছনার পরিচয় দেবার সময় নারদ বলেছেন:

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।

তানাএকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্॥

"স্বর সাতটী, গ্রাম তিনটি, মূর্ছনা একুশটী ও একোনপঞ্চাশৎ তান আর এদের সমবেত রূপের নাম 'স্বরমণ্ডল'।"[১] "সপ্ত স্বরাঃ" বলতে শিক্ষাকার নারদ প্রথমাদি সাত স্বরের কথা বোঝাননি, তাঁর মতে "ষড়্‌জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো পঞ্চমস্তথা, পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ"। নারদ যে সময় 'শিক্ষা' রচনা করেন তার বহু আগে থেকেই বৈদিক সমাজে বেদগানের পাশাপাশি

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা (১৯৫৩) পৃঃ ২১৭।

লৌকিক গান প্রচলিত ছিল এবং "তার সুস্পষ্ট নিদর্শন অরণ্যগেয়গান ও গ্রামগেয় গানের অনুশীলন থেকে পাওয়া যায়।"[১]

তিনটি গ্রামের কথা নারদ বলেছেন—

ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারস্ত্রয়ো গ্রামাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

অর্থাৎ ষড়্‌জ, মধ্যম এবং গান্ধার এই তিনটী গ্রাম। 'শিক্ষা'র রচয়িতা নারদের সময়ে গান্ধার গ্রামের প্রচলন ছিল না। কিন্তু গান্ধার গ্রাম সম্পর্কে যে তিনি অবহিত ছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর গ্রন্থে।

শিক্ষাকার নারদ বৈদিক ও লৌকিক, এই দু'রকম গানের দশ রকম গুণের কথা বর্ণনা করেছেন। এই গুণগুলি হ'ল—রক্ত, পূর্ণ, অলংকৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, বিক্রুষ্ট, শ্লক্ষ্ণ, সম, সুকুমার ও মধুর। এই দশটি গুণযুক্ত হলে তান সার্থক হয়। গুণের সঙ্গে সঙ্গে গানের দোষ সম্পর্কেও নারদ বলেছেন। এই দোষগুলি হ'ল— শঙ্কিত, কম্পিত, কাকস্বরবৎ কর্কশ, অতি উচ্চ, তীক্ষ্ণ, বিরস ও ব্যাকুলিত। গায়কের এইসব দোষ থাকলে তার স্বর শ্রুতি মধুর হয় না।

তিনটি গ্রামের নাম ও মূর্ছনার পরিচয় প্রসঙ্গে শিক্ষাকার নারদ সাতটি লৌকিক স্বরের নাম করেছেন,

ষড়্‌চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমী ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ॥

নারদ তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে সামস্বর ও সামগানের কিছু কিছু আলোচনা করেছেন বটে, তবে লৌকিক দেশী ও মার্গ সংগীতের সব কিছুর পরিচয় দেবার দিকেই তাঁর বেশী প্রবণতা দেখা যায়। শিক্ষাকার নারদের সময়ে সমাজে লৌকিক গানের প্রচলন এবং সমাদর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন বৈদিক গান যাজ্ঞিক সামগ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ এই জন্য তিনি লৌকিক সংগীত নিয়ে বেশী আলোচনা করেছেন। "দেশী সংগীতের প্রচলন বৈদিক যুগেও ছিল, সাম-গানের পাশে পাশে, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিচয় পাই বৈদিক অরণ্যগেয় গান ও গ্রামগেয় গানের মধ্যে। গ্রামগেয় গানই পরে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত রূপ নিয়ে লৌকিক গান্ধর্বে ও গানে তথা মার্গসংগীতে ও দেশী সংগীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একথাও সহজে অনুমান করা যায়, বৈদিক সাত স্বর প্রথমাদির সমসাময়িক লৌকিক সাত স্বর ষড়্‌জাদির প্রচলন ছিল। তবে একথা ঠিক যে, উভয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না; উভয়েই ছিল সমান্তরাল রেখার মত প্রসারিত।

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা (১৯৫৬) পৃঃ ২১৭।

নারদের কৃতিত্ব হল সেই যোগসূত্র রচনায় বা প্রতিষ্ঠায়। তিনি উভয়কেই গণ্য করেছিলেন সমগোত্রীয় হিসেবে। উভয়ের মধ্যে একটা মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন ক'রে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানী ক্ষেত্রকে চির-অব্যাহত রাখতে মনস্থ করেছিলেন। তাই বৈদিক ও লৌকিক এই দুই শ্রেণীর স্বরগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ বা উচ্চারণ গত একটি সামঞ্জস্যের তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন।"[১]

নারদ বৈদিক স্বর এবং লৌকিক স্বর—এ দুটির মধ্যে ধ্বনিগত ঐক্য দেখিয়ে সাত স্বরের বিকাশ এবং জন্মকাহিনী লিখেছেন। তাঁর মতে—"পশুপক্ষীদের ধ্বনির অস্তিম স্বরের মধ্যে ষড়্জাদি সাত স্বরের বিকাশ রয়েছে।" তিনি আবার কণ্ঠ থেকে ষড়্জের, শির থেকে ঋষভের, নাক থেকে গান্ধারের, উরু থেকে মধ্যমের, উরু, শির ও কণ্ঠ এই তিন স্থান থেকে পঞ্চমের, ললাট থেকে ধৈবতের ও সর্বসন্ধি থেকে নিষাদের উৎপত্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। নারদ সাতটি লৌকিক স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ঋষিদের নাম করেছেন। যেমন ষড়্জ ও ঋষভের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, গান্ধারের সোম বা চন্দ্র, মধ্যমের বিষ্ণু, পঞ্চমের নারদ এবং ধৈবত ও নিষাদের তুম্বুরু। নারদ তাঁর শিক্ষায় শ্রুতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর গ্রন্থে মাত্র পাঁচটি শ্রুতির নাম পাওয়া যায়। এই পাঁচটি শ্রুতি হচ্ছে—'দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা'। লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের শ্রুতি সম্বন্ধেও কোন কথা নারদ উল্লেখ করেননি।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সংগীত

খৃষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকের নাট্য অনুষ্ঠানে সংগীত কি ভাবে ব্যবহার করা হ'ত তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের[২] 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে। ব্রহ্মাভরত রচনা করেছিলেন আদি নাট্যবেদ 'ব্রহ্মভরতম্'। পরবর্তী সংগীতশাস্ত্রীরা এই ব্রহ্মাকেই 'দ্রুহিন ব্রহ্মা' বলেছেন। এই দ্রুহিন ব্রহ্মা রচিত আদি নাট্যশাস্ত্রের সার সংকলনই আচার্য ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থটীতে আর কোনও প্রাচীন ও প্রামানিক নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ নেই এবং এতে বিষয়বস্তুর আলোচনাও সংক্ষিপ্ত। এজন্য গ্রন্থখানিকে নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা (১৯৫৩), পৃঃ ২৪৭

২। ভরত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গুণী। ডাঃ রাঘবন ভরতের কাল নির্দিষ্ট করেছেন দ্বিতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার, ডাঃ ভাণ্ডারকর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাট্যশাস্ত্র রচনার কাল নির্দেশ করেছেন—খৃঃ পূঃ থেকে ২য় শতাব্দী।

গ্রন্থ বলে মনে করেন অনেকেই। "the book forms probably the earliest record of the science"—History of Classical Sanskrit Literature—Dr. Krishnamachari, (P. 825). আচার্য ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র 'ব্রহ্মভরতম্'-এর সার সংকলন এবং তাঁর স্বীকৃতি অনুসারে তাঁর গ্রন্থের মূল বিষয়, নাটকীয় নৃত্যগীত, ভাব ও রস পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে তাঁর পূর্ববর্তী সংগীতশাস্ত্রীদের অনুসরণ ক'রে। সুতরাং ভরত তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক হলেও তাঁর গ্রন্থ যে প্রাচীনতম নাট্যকলা ও নাট্য-গীতির পরিচয় বহন করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভরতের আলোচনার মূল বিষয় নাট্য-বিজ্ঞান। নাটকের অঙ্গ হিসাবে তিনি সংগীতের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে দিক থেকে 'নাট্যশাস্ত্রের' সব অধ্যায়গুলিতেই সংগীতের কোনও-না-কোনও পরিচয় বর্তমান। তবে ২৮ থেকে ৩৩ শ অধ্যায়গুলিতে বিশেষ ভাবে নাট্য-সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে যুগে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য কিভাবে নাটকে প্রয়োগ করা হ'ত এবং সেই সংগীতের রূপের বিস্তৃত পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে বার হাজার শ্লোক নিয়ে আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' সম্পূর্ণ ছিল। পরে মাত্র ছ'হাজার শ্লোক নিয়ে এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে। এই গ্রন্থের দুটি সংস্করণ বর্তমান। অনেকে এই দু'টি সংস্করণের দু'টি নামকরণ করেছেন। বড় সংস্করণটির নাম 'নাট্যবেদাগম' এবং ছোট সংস্করণটির নাম 'নাট্যশাস্ত্র'। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অঙ্গ বা সহায়ক হিসাবে সংগীতের আলোচনা করেছেন। ভরত 'নাট্যশাস্ত্রে' সংগীতের যে আলোচনা করছেন তা বেশ সুসম্বদ্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত। ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতে ভরত জাতিগান, ধ্রুবাগীতি, আলোচনা প্রসঙ্গে রাগ ও গানের বর্ণ,[১] অলংকার, মূর্ছনা, রাগ ও ভাব প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু লৌকিক উদাত্তাদি স্থান-স্বরগুলির সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে সম্ভবত ১৭শ অধ্যায়ে পাঠ্যের প্রসঙ্গে স্থান-স্বরগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগের কথা তিনি আলোচনা করেছেন। ভরত উদাত্তাদি চার বর্ণের রসস্ফূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা,—স্বরিত ও উদাত্ত থেকে হাস্য ও শৃঙ্গার রস, উদাত্ত ও কম্পিত থেকে বীর ও রৌদ্রের এবং অনুদাত্ত, স্বরিত এবং কম্পিত থেকে করুণ, বীভৎস ও ভয়ানক রসের স্ফূর্তি হয়।

১। ভরত 'বর্ণ বলতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, ও কম্পিত এই চার বর্ণ বুঝিয়েছেন। জাতি রাগের বেলায় বর্ণ বলতে আবার তিনি আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারীর কথা বলেছেন।

ভরত নাটকের দশরূপ বা দশটি বিভাগ প্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং ষড়জ্ ও মধ্যম গ্রাম দু'টির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, "জাতি ও শ্রুতি যেমন গ্রাম সৃষ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা নাটক সৃষ্টি করে। ষড়জ্ ও মধ্যম গ্রাম দু'টিতে যেমন সকল স্বরেরই সমাবেশ থাকে, তেমনি নাটক ও প্রকরণে সকল বৃত্তি থাকে।"

প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ভরত। কখন কোন গান হ'ত, কোন গানের সঙ্গে কি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হ'ত, গায়ক ও বাদকেরা কোথায় কি ভাবে ব'সত, তার বিস্তৃত বর্ণনা 'নাট্যশাস্ত্রে' রয়েছে।

যবনিকার বহির্ভাগে ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন ভরত। বৈদিক যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় যাগমণ্ডপের বাইরে 'বহিস্পমানস্তোত্র" নামে যে গান করার রীতি ছিল, কেউ কেউ বলেন যে, যবনিকার বহির্ভাগের গান তারই অনুকরণ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্ব গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভরত বলেছেন, "বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সংগীতের নাম গান্ধর্ব।" এই স্বর, তাল, ও পদযুক্ত গান্ধর্বে পদের অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক 'বস্তু' ও যা-কিছু অক্ষর সন্নিবদ্ধ তাই 'পদ' নামে অভিহিত। পদ দু'প্রকার—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। নিবদ্ধ পদ তালযুক্ত। ধ্রুবা গানে নিবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হ'ত। অনিবদ্ধ পদে অক্ষর ছন্দ ও যতি থাকে কিন্তু তাল থাকে না। অনিবদ্ধের অন্য নাম 'আলাপ'। তবে দু'প্রকার পদেই বেণু, বীণা, ঘন ও মৃদঙ্গাদি বাদের সহযোগ থাকে। মোট কথা, ষড়্জাদি সাতটি স্বর, তালযুক্ত নিবদ্ধ এবং তালহীন অনিবদ্ধ —এই সব মিলে হ'ল গান্ধর্বের সামগ্রিক রূপ।

স্বরগোষ্ঠীর মধ্যে ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' ৭টি শুদ্ধ এবং এগারটি বিকৃত—এই আঠারটি জাতি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে একটি জাতিরাগ বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হলে বিকৃত জাতির সৃষ্টি হয়। এই জাতি রাগশ্রেণীভুক্ত কি না এ বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমান। তবে অনেকে এই জাতিকে আদিম ভারতীয় রাগ বলে স্বীকার করেছেন।

ভরত সংগীতের চার বর্ণের কথা বলেছেন। বর্ণের পরে তিনি অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভরত বলেছেন "চন্দ্রহীন রাত্রি বা অলংকার বিহীন রমনী যেমন সৌন্দর্যহীন,তেমনি গানে অলংকার না থাকলে গান অসুন্দর ব'লে প্রতিভাত হয়।" প্রসন্নাদি, সম, বিন্দু, কম্পিত, কুহর—এমন বহু অলংকারের নাম ভরত উল্লেখ করেছেন।

স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অলংকারের পরই ভরত 'ধাতু'-র উল্লেখ করেছেন। বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন—এই চার প্রকার ধাতুর কথা তিনি বলেছেন। এই ধাতুগুলিকে তিনি বাদ্যযন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ বলেছেন। এই ধাতুর সংখ্যা মোট ৩৪টি।

স্বর প্রবাহের পর ভরত তাল বা তালশ্রেণীভুক্ত উপাদানের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে তাল দু'প্রকার—(১) সশব্দঃ—শম্যা, তাল ধ্রুব ও সন্নিপাত (২) নিঃশব্দ :—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক।

'বস্তু' ও 'বিদারী' সম্বন্ধে আলোচনায় ভরত বলেছেন সব গীতের অংশ বা অবয়বের নাম 'বস্তু' আর গানের ও আলাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হচ্ছে 'বিদারী'।

পদের পরিচয় প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন, যা-কিছু অক্ষর দিয়ে তৈরী তাই পদ। স্বর, ব্যঞ্জন, সন্ধি, বিভক্তি আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি পদের উপাদান।

গান্ধর্বের স্বর হিসাবে ভরত নারদের মত লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বর ও তাদের দশ লক্ষণের কথা বলেছেন। তবে পরবর্তী গ্রন্থকারদের মত স্বরের জাতি, কুল, বর্ণ, দেবতা, স্থান প্রভৃতির কথা বলেননি।

ভরতের মতে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী শ্রুতি-সংখ্যার মাধ্যমে নির্ণয় করা উচিত। তিনি ষড়জ গ্রামের শ্রুতি বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন। মূর্ছনা এবং তান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি কিন্তু তানের আভিধানিক পরিচয় দেননি।

ভরত জাতি তথা জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য দশ-লক্ষণ স্বীকার করেছেন। এ থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভরত কর্তৃক উল্লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলি রঞ্জনা শক্তি ও লাবণ্য গুণবিশিষ্ট রাগই। তিনি জাতিরাগে তিনটির বেশী অংশের কথা বলেছেন। ভরতের মতে—"গ্রহ বা অংশাদি যুক্ত জাতিরাগগুলি চিত্রা, আবৃত্তি দক্ষিণা—এই তিনটি বৃত্তির সহযোগে এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা—এই চারিটি গীতির সঙ্গে প্রয়োগ করা হ'ত।

ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' নিবদ্ধ গান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ছন্দক আসারিত, বর্ধমানক, ঋক্, পানিকা, গাথা, সাম বৈদিকোত্তর নিবদ্ধ গান। এগুলি বৈদিক গানের উপাদানেই তৈরী। ভরত বলেছেন যে, নাটকে ব্যবহারের জন্য বিবিধ ছন্দে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে অনুবিদ্ধ ঋকাদি অংগগুলির সে যুগে অনুশীলন করা হত। ধ্রুবা গান উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিনভাগে বিভক্ত। এই

গানের ভাষা সম্বন্ধে ভরত বলেছেন যে ধ্রুবায় শূরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হ'ত। দিব্যভাষা হিসেবে সংস্কৃতের সমাদর স্বভাবতই ছিল। তবে অর্ধ-সংস্কৃতই ছিল ছিল মানুষের উপযোগী।

ভরত নাট্য, গীত, বাদ্য ও নৃত্যের স্রষ্টা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' এ-সব বিষয় সম্পর্কে যে-তথ্য ও তত্ত্ব তিনি উল্লেখ করেছেন তা ঐতিহাসিকদের কাছে অমূল্য সম্পদ। কারণ "বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন সামগানের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি, তেমনি ক্লাসিক্যাল যুগের গান্ধর্ব-সঙ্গীত যে বৈদিক সঙ্গীতের মালমসলা নিয়ে নতুন রূপে ও ভাবে গ'ড়ে উঠেছিল তার সকল কিছুর পরিচয় পাই মুনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে।"[১]

নাট্যশাস্ত্রোত্তর কয়েকটি গ্রন্থ

ভরতের পর সংগীতশাস্ত্রী হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন স্বাতী, কোহল, শাণ্ডিল্য, বিশ্বাখিল, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি, শার্দূল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর, তুম্বুরু, যাষ্টিক, মতঙ্গ প্রভৃতি। এঁরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সংগীতশাস্ত্রী। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন যে ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসব রূপ নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বাতীকে ভাণ্ডবাদক এবং নারদকে গায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। কোহল 'সঙ্গীতমেরু' প্রমুখ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ষড়জাদ্রি সাত স্বর ও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বর অবিনাশী ও অনন্ত—এই বিচার প্রসঙ্গে জাতিরাগ ও ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। ভরত যে জাতি বা জাতিরাগের কথা বলেছেন তার প্রচলন কোহলের সময় ছিল। তাছাড়া গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের বিকাশও তাঁর সময়ে ঘটেছিল। জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের প্রকাশের সার্থকতা ও পরিপুষ্টির জন্য মূর্ছনার প্রয়োজন। কোহল বলেছেন রাগের লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে মূর্ছনার প্রয়োগ দরকার।

রামায়ণ টীকাকার কুশীলব কর্তৃক গীত শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগের অনুযায়ী শাণ্ডিল্য অনুমোদিত সাতটি শুদ্ধ জাতির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিকৃত কোন জাতি-রাগের কথা বলেননি। শাণ্ডিল্য ভরতের অনুগামী তা সত্ত্বেও বিকৃত জাতিরাগের কথা তাঁর প্রসঙ্গে যে উল্লিখিত হয়নি, তার কারণ শাণ্ডিল্যের সংগীতগ্রন্থ অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। মহাভারতে যে বিশ্বাবসুর নাম পাওয়া যায় তিনি গন্ধর্বরাজ এবং তাঁর সংগীতের জ্ঞান ছিল। কিন্তু ভরত এবং নারদ বিশ্বাবসুর নাম

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি,' উত্তর ভাগ, কলিকাতা (১৯৫৬)

না করায় মনে হয় সংগীতশাস্ত্রী বিশ্বাবসু পরবর্তীকালের লোক। এই বিশ্বাবসু শ্রুতির ব্যাখ্যা করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, যে সূক্ষ্ম স্বরগুলি কানে শোনা যায় তাদের শ্রুতি বলে। শার্দুলও দীপ্তাদি পাঁচটি শ্রুতির অন্তর্গত বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ করেছেন। শার্দুল দেশজরাগগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর সময়ে গান্ধর্বের পরিবর্তে অভিজাত (মার্গ প্রকৃতি সম্পন্ন) দেশজরাগগুলির সামাজিক প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল।

দত্তিল ভরতকে অনুসরণ ক'রে নাট্যের উপযোগী গান্ধর্ব সংগীতেরই আলোচনা করেছেন।[১] ভরত যেমন স্বর-তাল-পদাত্মক গানকে গান্ধর্ব গান বলেছেন, দত্তিলও তেমনি বলেছেন পদের মধ্যস্থ স্বরসমূহ এবং তালের দ্বারা যে গান অবধানের সঙ্গে (মনঃসংযোগ এবং সেই অনুসারে একান্ত যত্ন ও অধ্যাবসায়) প্রযুক্ত হয়, তাকেই গান্ধর্ব বলে—

পদস্থস্বরসঙ্ঘাতস্তালেন সুমিতস্তথা।
প্রযুক্তশ্চাবধানেন গান্ধর্বমভিধীয়তে ॥

দত্তিল উল্লেখ করেছেন যে, গান্ধর্ব গানকে যে উপাদানগুলি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ করে সেগুলি হ'ল: শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তান, স্থানবৃত্ত, শুষ্ক বা নির্গীত বাদ্য, সাধারণ, জাতি, বর্ণ, অলঙ্কার ও রস। দত্তিলও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী, তবে তিনি শ্রুতিকে বলেছেন ধ্বনি। তিনি স্বরমণ্ডলের রূপ বর্ণনা করেছেন। বিকৃত স্বর হিসাবে দত্তিল ভরতের মত অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবর্তী সময়ে তুম্বুরু, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি সংগীতগুণীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁদের গ্রন্থ না পাওয়ার ফলে আমাদের ধারণা হয় যে মতঙ্গই দেশী রাগের সংগ্রাহক ও প্রবর্তক। মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' প্রকৃতপক্ষে একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ। মতঙ্গ তাঁর গ্রন্থে তাই বার বার পূর্ববর্তী সংগীতাচার্যদের কথা উল্লেখ করেছেন।

মতঙ্গ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে গানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—"নিবদ্ধশ্চানিবদ্ধশ্চ মার্গোহয়ং দ্বিবিধো মতঃ"। আলাপ হচ্ছে অনিবদ্ধ এবং কথা, রাগ, তাল যুক্ত গান হল নিবদ্ধ।

১। 'দত্তিলম্' গ্রন্থের মুখবন্ধে আছে—

(প্রণম্য পরমেশাণাং) ব্রহ্মাদ্যাংশ্চ গুরূংস্তথা।
গান্ধর্বশাস্ত্রসংক্ষেপঃ সারতোহয়ং ময়োচ্যতে ॥

ভরতের মতানুবর্তী হয়ে মতঙ্গ[১] বাইশটি শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। বাইশটি শ্রুতি ছাড়া ৬৬টি ও অনন্তশ্রুতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গ স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তান, বর্ণ প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন 'বৃহদ্দেশী' প্রধানত অভিজাত (দশলক্ষণ যুক্ত) দেশী গানের সংগ্রহ ও পরিচিতি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আমরা নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত ১৮টি জাতি তথা জাতিরাগের পরিচয় পাই। দেশীগানের আলোচনা প্রসঙ্গে মতঙ্গ যে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন তার কারণ তিনি এই কথাই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে জাতিরাগই গ্রামরাগ এবং বিভিন্ন ভাষাদিও দেশী রাগের কারণ।

ভরত প্রমুখ সংগীতশাস্ত্রীরা রাগের উল্লেখ বা পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা বলেননি। মতঙ্গ বলেছেন—

যোঽসৌ ধ্বনির্বিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ॥

*　　　*　　　*

ইত্যেবং রাগশব্দস্য ব্যুৎপত্তিরভিধীয়তে।
রঞ্জনাজ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতা॥

স্বরবর্ণ (এবং ব্যঞ্জনবর্ণ)-যুক্ত যে ধ্বনিতরঙ্গ মানুষের মনে প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার করে তা-ই 'রাগ' নামে পরিচিত। স্বরসমূহের বিশিষ্ট রচনা যা মানুষের চিত্তকে মুগ্ধ করে তাকেই রাগ বলে।

কল্লিনাথ বলেছেন যে, জাতি, গ্রামরাগ এবং ষড়বিধ রাগ গান্ধর্ব পর্যায়ের অন্তর্গত। প্রাচীন কালে যখন রাগরাগিণীর উদ্ভব হয়নি, তখনকার সংগীতের সংজ্ঞা ও ভেদাভেদ নিরূপিত হত জাতিকরণের দ্বারা। পরবর্তীকালে এই জাতিভেদকে ভিত্তি করেই গ্রাম রাগের উদ্ভব হয়: ষড়জ গ্রামের রাগ, মধ্যম গ্রামের রাগ ও গান্ধার গ্রামের রাগ। কালক্রমে এই তিনটী গ্রামের মধ্যে 'গান্ধার' লুপ্ত হয়ে গেল এবং গ্রাম-রাগগুলি রূপান্তরিত হ'ল রাগ-এ। এই রাগগুলিকে প্রাচীন গ্রামের ভিত্তিতে জাতিকরণ পদ্ধতিতে শ্রেণী বিন্যাস করতে গিয়ে রাগ-রাগিণী পরিবারগুলির মধ্যে গোলযোগ পরিলক্ষিত হতে থাকলো এবং শেষ পর্যন্ত

১। মতঙ্গ কোন যুগের এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতিতে মতঙ্গ মুনির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা যাঁর কথা আলোচনা করছি সেই সংগীতশাস্ত্রী মতঙ্গ মুনি 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর কোন এক সময় জীবিত ছিলেন।

উত্তর ভারতে গৃহীত হ'ল দশ ঠাটের বনিয়াদ। অবশ্য এই দশ ঠাটের বনিয়াদ রচিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের বাহাত্তর মেল-এর অনুকরণেই।

জাতিরাগ

বাল্মীকির রামায়ণে (১।৪।৮-১০)[১] আমরা শুদ্ধ-সপ্ত জাতিগানের উল্লেখ পাই। কুশীলবের কণ্ঠে এই গান লীলায়িত হ'ত। রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব হিসাবে জাতি-রাগ ও গ্রামরাগ গানের প্রচলন ছিল—একথা মনেকরা যেতে পারে; কারণ 'বালকাণ্ডে' (চতুর্থ অধ্যায়) সাতটি শুদ্ধ জাতিগান ও 'সুন্দর কাণ্ডে' (প্রথম অধ্যায়) "চরিতে কৈশিকাচার্যৈরৈরাবতনিষেবতে" শ্লোকে 'কৈশিক' শব্দ কৈশিক রাগই প্রমাণ করে—'কৈশিক' রাগ বা গ্রাম রাগ। এর উল্লেখ 'মহাভারত,' 'হরিবংশ,' পুরাণাদি,' নারদের 'শিক্ষা' এবং ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে। কৈশিক সম্পর্কে টীকাকার বলেছেন, "কৈশিকং গাননৃত্যবিদ্যা তদাচার্যৈস্তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বৈশ্চরিতে সেবিতে।" 'শিক্ষা'-র রচয়িতা নারদ বলেছেন কৈশিক গ্রামরাগটি ঋষি কশ্যপের উদ্ভাবিত—"কৈশিকং কশ্যপং প্রাহ"। সাতটি শুদ্ধ জাতি গান বা জাতিরাগ গানের তখন প্রচলন ছিল; বিকৃত জাতি বা জাতিগানের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাই আমরা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'। জাতিরাগ ও গ্রাম রাগগুলি ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মূর্চ্ছনা, মন্দ্রাদি তিন স্থান, তাল, লয় ও বিচিত্র রসে গান করা হ'ত।

শুদ্ধ-সপ্ত জাতি হ'ল ষাড়জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী (জাতয়ো দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ তত্র শুদ্ধা ষড়জগ্রামে ষড়্জী আর্ষভী স ধৈবতী নিষাদবতী গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী মধ্যম গ্রামে)। শুদ্ধজাতি বা জাতিরাগ-গুলিকে ষড়জ ও মধ্যম দুটি গ্রামের উল্লেখ করা হয়েছে। গান্ধারী, ও রক্তগান্ধারী, গান্ধরোদীচ্যবা, মধ্যমোদীচ্যবা, মধ্যমা, পঞ্চমী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী, নন্দয়ন্তী, কর্মারবী বা কার্মারবী, ও কৈশিকী এই এগারটি বিকৃত জাতি মধ্যম গ্রামে লীলায়িত। সাতটি স্বরের নাম অনুসারে শুদ্ধ জাতি রাগগুলি ও বিকৃত জাতিরাগ

১। পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥

* * *

তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ-স্থান-মূর্চ্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গান্ধর্বাবিবরূপিণৌ॥

উভয় গ্রামেই বিকশিত। ভরত ষড়জ ও মধ্যম দুটি গ্রাম যে স্বীকার করেছেন তার কারণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গান্ধার গ্রাম সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। ভরত বলেছেন একটি জাতিরাগ আর একটি বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই উপরোক্ত বিকৃত এগারোটি জাতি সৃষ্টি করে।

এখন প্রশ্ন হ'ল যে, রামায়ণের যুগে রক্তিজনক ও অনুরণকযুক্ত সাতটি স্বর ছিল কিন্তু 'রাগ' ছিল কি—না। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' রাগ শব্দটির পাঁচবার উল্লেখ আছে। উপরোক্ত জাতি রাগ শ্রেণীভুক্ত কি—না এবিষয়ে মতভেদ থাকলেও ঐ জাতি যে ভারতীয় আদিম রাগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৃহদ্দেশী রচয়িতা মতঙ্গ তাঁর গ্রন্থে ভরতের অনুসরণে বলেছেন, সকল রাগের কারণ বা বীজ জাতিরাগ ("জাতিসম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগানামি")। দেশী রাগের আলোচনায় মতঙ্গ যে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন, তার কারণ হচ্ছে সকলকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া যে জাতি রাগই গ্রাম রাগ এবং বিভিন্ন ভাষাদি ও দেশী (ক্ল্যাসিকাল) রাগের কারণ। 'জাতি' বলতে কি বোঝায় এ সম্পর্কে মতঙ্গ স্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলংকার বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে স্বরসম্ভাব প্রকাশিত হয় তাকে জাতি বলে; যে স্বর সন্দর্ভের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের—প্রত্যেকটি স্বর গঠনের বা রাগরূপের রস প্রতীতি হয় তাকে জাতি বলে; গান্ধর্ব ও দেশীরাগগুলি যে মূল রাগ থেকে জন্ম গ্রহণ করে তাকে জাতি বলে। সুতরাং রাগের মূর্ছনা, বর্ণ, অলংকার প্রভৃতি সকল অঙ্গের বৈশিষ্ট্যই নির্ভর করে 'জনক' জাতির বৈশিষ্ট্যের উপর। জাতির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই সে যুগে রাগের গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী প্রভৃতি স্বরের প্রয়োগ নিরূপিত হ'ত।

জাতিগানে যে তালের প্রয়োগ করা হ'ত তাকে বলা হয়েছে মার্গতাল। এই মার্গতালে ক্রিয়া দু'প্রকার—সশব্দ ও নিঃশব্দ। নিঃশব্দ ক্রিয়ার হাতের সংকেত এবং আঙুলের সংকোচন বা প্রসারণ বুঝায়। এই নিঃশব্দ ক্রিয়া চার প্রকারের—আবাপ, নিষ্ক্রাম, প্রক্ষেপ, প্রবেশক। করতলে আঘাত দ্বারা শব্দ ক'রে সশব্দ তালের প্রকাশ হয়। এই সশব্দক্রিয়াও চার রকম—ধ্রুব, শম্যা তাল, সন্নিপাত। মার্গ তালে চারটী মার্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে: ধ্রুব, চিত্র, বার্তিক এবং দক্ষিণ। এই মার্গ চারটী মাত্রা দ্বারা নির্দিষ্ট। ধ্রুব মার্গে একটী মাত্রা, চিত্র দ্বিমাত্রিক, বার্তিক চারমাত্রিক এবং দক্ষিণ আট মাত্রিক।

পরবর্তী যুগে রাগ-সংগীতের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও এই মার্গগুলিকে আশ্রয় ক'রেই গান করার রীতি ছিল। আরও পরবর্তীকালে দেশী সংগীতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মার্গ অবলম্বনে তালরক্ষা বা মাত্রাবিন্যাস দেখিয়ে দেবার রীতি চলে গেলেও মার্গতালের বনিয়াদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। ভারতীয় সংগীতের জয়যাত্রার পথে আমরা বহু বিবর্তনই লক্ষ্য করি। এর মধ্যে খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী কাল ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়। এই সময়ের মধ্যে রাগ নাম কল্পনা, রাগরূপ ও রাগ বিকাশের মধ্য দিয়ে রাগের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধ সংগীত

গান্ধর্ব গান নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ উভয় রূপেই বিকশিত ছিল। শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ বলেছেন—

অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতমুদীরিতং।
আলপ্তিবর্দ্ধহীনঃ সাদ্রাগালাপনরূপিনী॥

—অর্থাৎ গীত অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ ভেদে দু'প্রকার। আলপ্তি বা আলাপে রাগের আলাপ মাত্র হয়, এটি অর্থযুক্ত কথার দ্বারা আবদ্ধ নয়।

নিরর্থক হুংকার 'সা রে গ ম' বা আতানারি প্রভৃতির দ্বারা যে আলাপচারি হয়, তার নাম অনিবদ্ধ সংগীত। এই গান তালেরও অপেক্ষা রাখে না, তবে অক্ষর, ছন্দ ও যতি থাকে। অনিবদ্ধ-এর অন্য নাম 'আলাপ'।

শার্ঙ্গদেব এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন—

"বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
আলপ্তিবন্ধহীন ত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতা॥"--সঙ্গীত রত্নাকর

চারিটী ধাতু (উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ) এবং ছটী অঙ্গ (স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট, তাল) যুক্ত হলে নিবদ্ধ এবং বন্ধনহীন অর্থাৎ তালাদি বর্জিত আলপ্তির নাম অনিবদ্ধ। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত রত্নাকরে নিবদ্ধ গানকে প্রবন্ধ বস্তু, ও রূপক বলেছেন—"সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধস্য প্রবন্ধো বস্তুরূপকম্"।

রামায়ণে শুদ্ধ সপ্ত জাতি বা জাতিরাগ গান প্রবন্ধ জাতীয় ছিল। পরবর্তীকালে 'ধাতু'-শব্দের দ্বারা প্রবন্ধ গানের অংশ বা অবয়ব বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ধাতু শব্দের একটি অর্থ 'গেয়'। শার্ঙ্গদেব বলেছেন "পূর্বং ধাতুশব্দেন গেয় মুক্তং"। এখানে 'পূর্বং' বলতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগের কথাই বলা হয়েছে এবং তখন গেয় শব্দের অর্থ ছিল প্রবন্ধানুগতধর্ম—"গেয়ং নাম সকল প্রবন্ধানুগত ধর্মঃ।" এ থেকেই নিবদ্ধ প্রবন্ধ গানের প্রাচীনত্ব সূচিত হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রবন্ধ গানের কথা পাওয়া যায়। ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' এই গানের কথা বলেছেন। মতঙ্গ, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব তাঁদের রচিত গ্রন্থে এই প্রবন্ধ সংগীতের পরিচয় দিয়েছেন।

'সংগীত সার' গ্রন্থে এই সংগীতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে— শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ। 'সঙ্গীত রত্নাকর' অনুসারে এই বিভাগ তিনটীর নাম— প্রবন্ধ, বস্তু এবং রূপক।

শুদ্ধ সংগীতের নাম প্রবন্ধ—"প্রকৃষ্টো যস্য বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে"। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যে গানের বন্ধন আছে তাকেই প্রবন্ধ সংগীত বলা হয়। এই গান ধাতু ও অঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং 'প্রবন্ধ' অর্থ রীতি ও নিয়মে আবদ্ধ ক্লাসিক্যাল গান (গীতি)।

প্রবন্ধের ধাতু

প্রবন্ধ সংগীতের চারটী ধাতু ও ছয়টি অঙ্গ। ধাতু অর্থে অবয়ব বা ভাগ। যেমন উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব আভোগ।

(১) **উদ্‌গ্রাহ**—গানের প্রথম পাদ বা কলি। যেমন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ, তমনি উদ্‌গ্রাহ হচ্ছে গানের ভূমিকা স্বরূপ।

(২) **মেলাপক**—মেলাপক হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ ও ধ্রুবের মেলাকারক মধ্য অবস্থান বিশেষ। উদ্‌গ্রাহের পরেই যে অংশ তাকে বলে মেলাপক। প্রথম অংশ উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় অংশ ধ্রুব—এই দুই অংশের মিলন ঘটায় বলে এই দ্বিতীয় অংশের নাম মেলাপক।

(৩) **ধ্রুব**—মেলাপকের পরের অংশ ধ্রুব বা ধ্রু-কলি। এই অংশ মধ্যভাগে অবস্থিত। এই অংশের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন, "ধ্রুবাত্তাচ্চ ধ্রুব"। টীকাকার কল্লিনাথ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে নিত্যত্বহেতুই এই অংশের নাম ধ্রুব। প্রবন্ধে এ এই অংশ কখনই বর্জিত হবে না।

(৪) **আভোগ**—আভোগ হচ্ছে প্রবন্ধের শেষ অবয়ব। আভোগ অংশে কবি ও নায়কের নাম থাকে। এই অংশে গান পরিপূর্ণতা অর্থাৎ ভাবের শাখা-পত্র-পল্লব বিস্তার বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

অন্তরা—ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে আর একটী ধাতু আছে। এই অংশ হরিনায়কের মতে "অন্তরা"। এই 'অন্তরা' অংশটী সব রকম প্রবন্ধে দেখা যায় না—সালগসূড় প্রবন্ধে এই অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। কল্লিনাথ বলেছেন— "অয়মন্তরো লৌকিকরূপান্তর ইত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ এই অন্তরা লৌকিক রূপান্তর মাত্র। এটা ধীরে ধীরে ধ্রুব-এর স্থান অধিকার করেছে।

প্রবন্ধের অঙ্গ

প্রবন্ধের অঙ্গ ছয়টী : স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল।

'তেনক 'শব্দটী মঙ্গলবাচক। মহাকাব্যের আদিতে যেমন ওঁ তৎ সৎ উচ্চারিত হয়, তেনক অঙ্গে এই ধরণের বাক্য থাকে। তেনক অঙ্গটীকে নেত্রের সঙ্গে এবং পাট, বিরুদকে হস্তদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর মধ্যে পাট হচ্ছে বোল (বাদ্যাক্ষর) আর বিরুদ গুণবাচক অংশ। এই অংশ পদের শেষে থাকে। স্বর বলতে ষড়জাদি স্বর যা, সা, রে, গ, ম প্রভৃতি অক্ষরে প্রকাশ করা হয়। পদ বলতে সমগ্র গানটীকেই বুঝায়। শার্ঙ্গদেব বিরুদ অংশটী ছাড়া গানের বাকি অংশকে পদ বলেছেন।

(১) **স্বর**—স্বর বলতে ষড়জাদি স্বর যা সা, রে, গ, ম প্রভৃতি অক্ষরে প্রকাশ করা হয়।

(২) **বিরুদ**—"গদ্য পদময়ী রাজস্তুতিঃ বিরুদ মুচ্যতে"-অর্থাৎ স্তুতিমূলক ছন্দ-পদকে বিরুদ বলে। শার্ঙ্গদেব, রাজা রঘুনাথ নায়ক প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞরা বলেছেন 'বিরুদ' অর্থে বিরোধ বুঝায়। মাহারাষ্ট্র-এ 'বিরুদ' অর্থ শক্তি শৌর্য্য। প্রবন্ধগীতির অঙ্গ হিসাবে বিরুদ অর্থে আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা বুঝায়। সংগীতের যে অংশে এটী থাকে সেই অংশকে সূচিত করে।

(৩) **পদ**—যে বিষয় নিয়ে গীত-বস্তু রচিত তাকেই পদ বলে।

(৪) **তেনক**—মঙ্গলবাচক শব্দ। যেমন তেন, না, তে ইত্যাদি।

(৫) **পাট**—মৃদঙ্গাদি বাদ্যের অনুকরণে যে বোল বলা হয়।

(৬) **তাল**—ছন্দ রাখার নিয়মিত আঘাত।

প্রবন্ধ সংগীতের জাতি

প্রবন্ধ সংগীতের পাঁচটী জাতি :

প্রবন্ধ জাতয়ঃ পঞ্চ বর্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ।
ষড়্‌ভিরঙ্গৈর্মেদিনী স্যান্নন্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ॥
চতুর্ভির্দীপনী প্রোক্তা ত্রিভিরঙ্গৈস্ত ভাবনী
দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যামুপজায়তে॥

—সঙ্গীত পারিজাত

অর্থাৎ—

ছয়টী	অঙ্গযুক্ত	প্রবন্ধ	"মেদিনী"	জাতীয়,
পাঁচটী	,,	,,	"আনন্দিনী"	,,
চারটী	,,	,,	"দীপনী"	,,
তিনটী	,,	,,	"ভাবনী" বা পাবনী জাতীয়	
দুইটী	,,	,,	"তারাবলী"	

প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধগীতের জাতি বা প্রকার ভেদ অসংখ্য: "ভেদঃ শুদ্ধ প্রবন্ধানামানন্ত্যাদেখ এব হি"

প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রাচীনকালে বহুপ্রকারের প্রবন্ধগীতি প্রচলিত ছিল। সেগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—সূড়, আলি বা আলিসংশ্রয় এবং বিপ্রকীর্ণ। ধ্রুব প্রবন্ধগীতি সূড় অর্থাৎ সালগসূড় প্রবন্ধের অন্তর্গত: "ধ্রুবাদি সালগ মত" (সঙ্গীতরত্নাকর ৪/৩১১)। শার্ঙ্গদেব সূড় প্রবন্ধকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—খাঁটি এবং মিশ্র (শুদ্ধ এবং সালগ অথবা ছায়ালগ)।

শুদ্ধসূড় প্রবন্ধ বলতে জাতি অথবা জাতিরাগ; ব্রহ্মগীতি, যেমন কপাল এবং কম্বল; এর সঙ্গে গ্রামরাগ, উপরাগ, ভাষারাগ, বিভাষারাগ এবং অন্তর-ভাষা-রাগ এবং প্রকরণগীতি, যেমন মদ্রক, অপরান্তক, উলোপ্য, প্রকরী, ওবেনক, রবিন্দক, এবং উত্তর; এর সঙ্গে গীতি যেমন ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, পাণিকা, ঋক্, গাথা এবং সাম। শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "জাত্যাদন্তর-ভাষাণতম্ শুদ্ধম্ প্রকরণ-মভিতম্"। টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন, "শ্রুতি প্রকরণমারব্যা-অন্তরভাষা-পর্যন্তম।" রাজা রঘুনাথ নায়ক একইভাবে সালগ-সূড় ধ্রুব বর্ণনা করেছেন ('সংগীত সুধা,' পৃঃ ৮০৮-৮০৯)।

সুতরাং এ থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধর্ব অথবা মার্গগীতি প্রবন্ধ বলে' পরিচিত ছিল। একথা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরত এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব সমর্থন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যগীতি, ধ্রুবা সম্পর্কে ভরত যা বলেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

যা ঋক পাণিকা গাথা সপ্ত-রূপংগমেব চ।
সপ্ত-রূপ-প্রমাণাম্ হি সা ধ্রুবেত্যভিসঙ্গীতা॥

—নাট্যশাস্ত্র, ৩২।২

শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ "এলাদি শুদ্ধ" প্রভৃতির কথা বলেছেন। দেখা যাচ্ছে যে ভরত এবং শার্ঙ্গদেব প্রবন্ধগীতি হিসাবেই গান্ধর্ব এবং ব্রহ্মগীতির ব্যাখ্যা করেছেন। ভরত ধ্রুবাকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। সিংহভূপাল এলা এবং অন্যপ্রকার প্রবন্ধের প্রসঙ্গে এগুলির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন "নন্থ ভরতেন এলাদিনাম্ ছায়ালগত্বং উক্তম তৎ কথম্ শুদ্ধত্বম্ উচ্চতে, তত্রাহ-ছায়ালগত্বমিতি।" এথেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ক্ল্যাসিকাল গীতি শ্রেণীর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। চৌষট্টি প্রকার ধ্রুবার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ধ্রুবা বিভিন্ন বর্ণে (সম-বৃত্তাক্ষর-কৃত), ধাতুতে, অঙ্গে যেমন স্বর, বিরুদ, তেনক, পদ, পাট ও তাল প্রভৃতি সহযোগে রচিত হ'ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধ্রুবা গান্ধর্ব শ্রেণীর প্রবন্ধগীতি হিসাবে পরিচিত ছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে ভরত কপাল, কম্বল প্রভৃতি ব্রহ্মগীতির আলোচনা করেছেন। কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবের অনুসরণ বলেছেন, "জাতি-কপাল-কম্বল গ্রামরাগোপরাগ-ভাষা-বিভাষান্তরভাষা-পর্যন্ত মিত্যর্থ।" এর অর্থ জাতিরাগ এবং কপাল ও কম্বল-গীতি প্রভৃতি শুদ্ধসূড় প্রবন্ধগীতি রূপে পরিচিত ছিল। এথেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শুদ্ধ শ্রেণীর ধ্রুব প্রবন্ধ ভরতের পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী সংগীত শাস্ত্রীদের মধ্যে দত্তিল তাঁর রচিত পুস্তক 'দত্তিলম্'-এ মদ্রক, অপ্রান্তক, উলপ্যক প্রভৃতি প্রকরণের বর্ণনা দিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে যে শার্ঙ্গদেব মদ্রক, অপ্রান্তক, প্রভৃতি শুদ্ধ-সালগ-সূড় প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও দত্তিল নির্দিষ্টভাবে ধ্রুব প্রবন্ধের উল্লেখ করেননি তবুও এটা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি শুদ্ধ-সূড়-প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটা খুবই প্রত্যাশিত যে তাঁর মনে ধ্রুব শ্রেণীর সালগ-সূড়-প্রবন্ধের কথা ছিল।

মতঙ্গ-র বৃহদ্দেশীতে (পঞ্চম-সপ্তম খৃষ্টাব্দ) প্রবন্ধগীতির বর্ণনা আছে। মতঙ্গ প্রবন্ধকে বলেছেন 'দেশী' অর্থাৎ আঞ্চলিক ক্ল্যাসিকাল গীতি। তিনি বিভিন্ন প্রকারের প্রবন্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—ঢেঙ্কি, এলা, দণ্ডক, দ্বিপদী, চতুরঙ্গ, স্বরবর্ত্তিল প্রভৃতি। বৃহদ্দেশীর ত্রিবান্দ্রম্ সংস্করণকে দত্তিলমের মতই কেউ কেউ অসম্পূর্ণ বলেছেন। সুতরাং এই বইতে ধ্রুব প্রবন্ধে সঠিক উদাহরণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যেহেতু বৃহদ্দেশীতে শুদ্ধ-সূড়-শ্রেণীর প্রবন্ধের বর্ণনা করেছেন সেই হেতু তিনি সালগ-সূড়-এর অন্তর্গত ধ্রুব প্রবন্ধের আলোচনাও ক'রে থাকবেন। কিন্তু পার্শ্বদেব স্পষ্ট ক'রেই শুদ্ধ এবং সালগসূড় প্রবন্ধ (ধ্রুব অথবা

ধ্রুবপদ সহ) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁর 'সংগীত সময় সার' গ্রন্থে (৭ম-৯ম অথবা ৭ম-১১শ শতাব্দী)। তিনি বলেছেন "সাল-সূড়-ক্রমং ব্যক্ষে—আদৌ ধ্রুব ততো মট্ঠৌ" ইত্যাদি। এখানে "সাল-সূড়"—অর্থে সালগ ও সূড় বোঝানো হয়েছে, ধ্রুব অর্থ ধ্রুবপদ এবং মট্ঠৌ অর্থ মঠ।

পার্শ্বদেবের পরে শার্ঙ্গদেব বিস্তৃতভাবে তাঁর 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনটি প্রধান শ্রেণী এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধের আলোচনা ক'রে শার্ঙ্গদেব সালগ প্রবন্ধের আলোচনা করেছেন।

বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধ

প্রবন্ধের প্রধান বিভাগ তিনটি—(১) সূড়, (২) আলি বা আলি সংশ্রয় (৩) বিপ্রকীর্ণ। শুদ্ধসূড় আট প্রকার—এলা, করণ, ঢেঙ্কি, বর্তনী, ঝোম্বড়া, লম্ভ, রাসক এবং একতালী। এই আটটি শুদ্ধসূড়কে সিংহভূপাল 'মার্গসূড়' ব'লে অভিহিত করেছেন।

আলি জাতীয় প্রবন্ধ চব্বিশ প্রকার—বর্ণ, বর্ণস্বর, গদ্য, কৈবাড়, অংকচারিণী, কন্দ, তুরগলীল, গজলীল, দ্বিপদী, চক্রবাল, ক্রৌঞ্চপদ, স্বরার্থ, ধ্বনীকুট্টনী, আর্যা, গাথা, দ্বিপথক, কলহংস, তোটক, ঘট, বৃত্ত, মাতৃকা, রাগকদম্বক, পঞ্চতালেশ্বর, তালার্ণব। এই প্রবন্ধগুলি আবার সূড়ক্রমের মধ্যে মিশেও থাকতে পারে। আটটী সূড় জাতীয় প্রবন্ধ এবং চব্বিশটি আলিজাতীয় প্রবন্ধ মিলে মোট প্রবন্ধ সংখ্যা হ'ল বত্রিশ।

সূড় এবং আলিজাতীয় প্রবন্ধ ছাড়া অন্য যে সব গান ছড়িয়ে রয়েছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে বিপ্রকীর্ণ। এই ছড়ানো গানগুলি থেকে ছত্রিশটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন শার্ঙ্গদেব। এই প্রবন্ধগুলি হ'ল—শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গী, পঞ্চানন, উমাতিলক, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ষট্পদী, বস্তু, বিজয়, ত্রিপথ, চতুর্মুখ, সিংহলীল, হংসলীল, দণ্ডক, ঝপট, কন্দুক, ত্রিভঙ্গী, হরবিলাস, সুদর্শন, স্বরাংক, শ্রীবর্ধনী হর্ষবর্ধন, বদন, চচ্চরী, চর্যা, পদ্ধড়ী, রাহড়ী, বীরশ্রী, মঙ্গলাচার, ধবল, মঙ্গল, ওবী, লোলী, ঢোল্লরী, দন্তী।

বিভিন্ন প্রকারের শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধ

শুদ্ধ সূড়ের অন্তর্গত প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধের নাম 'এলা'। এই গীতরূপের উদ্‌গ্রাহ অংশটির তিনটি ভাগ—খণ্ডদ্বয়, প্রয়োগ ও পল্লব। শার্ঙ্গদেব প্রথম অংশটিকে অঙ্ঘ্রি বলেছেন। অঙ্ঘ্রি বলতে চরণ, বৃক্ষমূল অথবা চতুর্থাংশ

বোঝায়। এই দুটী খণ্ডের পদ অর্থাৎ বাক্যাংশ এক না হলেও গাইবার পদ্ধতি একই রকম। এই এক পদ্ধতিতে গাওয়ার নাম 'এক ধাতু'। গাইবার ধরণে ভিন্নতা থাকলে তাকে বলা হয় ভিন্ন ধাতু। খণ্ড দু'টি অনুপ্রাসযুক্ত অর্থাৎ পদান্তে মিল বর্তমান।

খণ্ড দুটির পরবর্তী ভাগ হ'ল প্রয়োগ। গানের মধ্যে স্বল্প আলাপযুক্ত অংশের নাম প্রয়োগ। প্রয়োগ গমকযুক্ত আলাপের মত সুরের কাজ। কিন্তু প্রয়োগে আলপ্তির মত ব্যাপকতার অভাব।

প্রয়োগের পর তৃতীয় ভাগ হ'ল পল্লব। পল্লবের তিনটি পদ আছে—প্রথম দু'টি বিলম্বিত এবং তৃতীয়টি দ্রুত।

এই তিনটি ভাগ মিলিয়ে একটি পাদ। সম্পূর্ণ পাদটি উদ্‌গ্রাহের অন্তর্ভুক্ত। উদ্‌গ্রাহ গাওয়া হয় তিন বার। তৃতীয়বার গাইবার সময় প্রয়োগে সম্বোধন পদযুক্ত হয় এবং শুধু প্রয়োগটুকু গাওয়া হয়; পল্লবের অনুষ্ঠান হয় না। শার্ঙ্গদেবের লেখা থেকে জানা যায় যে সোমেশ্বর প্রভৃতি সংগীতজ্ঞগণ এই তৃতীয় পদের প্রয়োগটিকেই মেলাপক ব'লে স্থির করেছেন। শেষের প্রয়োগটি আগের দু'বার গাওয়া প্রয়োগের মত হবে না—এটি হ'বে ভিন্নধাতুক।

এর পরে ধ্রুব অংশে ইষ্টদেবতা, রাজা বা নায়কের নামাঙ্কিত তিনটি পদ গাওয়া হয়। এই পদত্রয় গাওয়া হয় মধ্যবিলম্বিত লয়ে। এই তিনটি ধাতুর প্রথম দুটী একধাতুক অর্থাৎ সমান ভাবে গাওয়া হয় এবং তৃতীয়টি ভিন্নধাতুক অর্থাৎ বিসদৃশভাবে গাওয়া হয়। এরূপ ধ্রুব গাওয়ার পর আভোগের অনুষ্ঠান হয়। এই আভোগ অংশে বাগগেয়কার তাঁর নিজের নামটি জুড়ে দেন। আভোগ গাওয়ার পর ধ্রুবাংশটি আর একবার গেয়ে গান শেষ করতে হয়।

বিষমে অর্থাৎ অতীত বা অনাগত-এ এলাজাতীয় গানের আরম্ভ (গ্রহ) হয়। মঠ, প্রতিতাল, দ্বিতীয়, কঙ্কাল তালে এই গানে গাওয়ার রীতি। এই গানে ত্যাগ. সৌভাগ্য, শৌর্য, ধৈর্য প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

শার্ঙ্গদেব এলার উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগের পদের নাম উল্লেখ করেছেন। ষোলটি পদ নিয়ে এলাটি সম্পূর্ণ হয়। শার্ঙ্গদেব এই ষোলটি পদের ষোলটি অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উল্লেখ করেছেন—পদ্মালয়া, পত্রিণী, রঞ্জনী, সুমুখী, শচী, বরেণ্যা, বায়ুবেগা, বেদিনী, মোহিনী, জায়া, গৌরী, ব্রাহ্মী, মাতঙ্গী, চণ্ডিকা, বিজয়া, চামুণ্ডা। এই পদগুলির দশটি প্রাণের উল্লেখ করা হয়েছে—সমান, মধুর, সান্দ্র, কান্ত, দীপ্ত, সমাহিত, অগ্রাম্য, সুকুমার, প্রসন্ন এবং ওজস্বী।

দ্বিতীয় প্রকার শুদ্ধসূড় প্রবন্ধের নাম 'করণ'। স্বকরণ, পাটকরণ, বন্ধকরণ, পদকরণ, তেনকরণ, বিরুদকরণ, চিত্রকরণ ও মিশ্রকরণ—এই আটপ্রকার করণ প্রবন্ধ বর্তমান।

স্বকরণে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব এই ধাতু দুটি স্বব দ্বারা বদ্ধ। আভোগ বাক্যাংশ দিয়ে তৈরী। এই অংশে বাগগেয়কারের বা নায়কের নাম থাকে। গান আরম্ভ করা হয় ইষ্ট বা অভিলষিত স্বরে এবং শেষ করা হয় অংশ স্বরে। তাল—রাস; লয়—দ্রুত।

স্বরস্থানের প্রভেদ ছাড়া আকৃতির দিক থেকে অন্য করণগুলি স্বকরণের অনুরূপ। প্রকারভেদে করণগুলি তিন রকমের হয়—মঙ্গলারম্ভ, আনন্দবর্ধন এবং কীর্তিলহরী।

মঙ্গলারম্ভ করণে আগে উদ্‌গ্রাহ অংশটি গাওয়া হয় দু'বার। এর পর ধ্রুব একবার গাওয়া হয় এবং শেষে আবার একবার আভোগ, ধ্রুব এবং উদগ্রাহ গাওয়া হয়।

কীর্তিলহরী করণে ধ্রুব অর্ধেক গাওয়ার পর উদ্‌গ্রাহের দ্বিতীয়ার্ধ গাওয়া হয় এবং অন্যান্য বিষয় আনন্দবর্ধনের অনুরূপ।

করণে মেলাপক পাওয়া যায় না। এটি ত্রিধাতুক। মোট সাতাশ প্রকার করণ প্রবন্ধ আছে।

ঢেঙ্কি প্রবন্ধে প্রথমে উদ্‌গ্রাহের পূর্বভাগ দু'বার গাওয়া হয় এবং তারপর একবার গাওয়া হয় উত্তরার্ধ। এরপর মেলাপক গাওয়া যেতেও পারে আবার নাও যেতে পারে। এই মেলাপকটি গমকযুক্ত আলাপের মত। উদ্‌গ্রাহ এবং মেলাপক—এই দু'টি অঙ্গই তাল ছাড়া গাওয়া যেতে পারে। যদি তালে গাওয়া হয় তবে বিলম্বিত ঢেঙ্কি বা কঙ্কাল তাল ব্যবহার করা হয়। তারপর অন্য তালে এবং অন্য লয়ে গাওয়া হয় ধ্রুব এবং আভোগ। ধ্রুব অংশ তিনটী খণ্ডে বিভক্ত। ধ্রুব গাওয়া হয় দু'বার। এর পর আভোগ গাওয়া হয় এবং আর একবার ধ্রুবের অনুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়।

ঢেঙ্কি প্রবন্ধ চার প্রকার—(১) মুক্তাবলী, (২) বৃত্তবন্দিণী, (৩) যুগ্মিণী, (৪) বৃত্তমালা। ছন্দহীন গানের নাম মুক্তাবলী। যে গানে একটি ছন্দ অবলম্বন করা হয় তার নাম বৃত্তবন্দিনী। যুগ্মিনী প্রবন্ধে দু'টি বৃত্ত বা ছন্দ থাকে। বহু বৃত্ত বা ছন্দসম্পন্ন প্রবন্ধের নাম বৃত্তমালা।

বর্তনী নামক শুদ্ধসূড় প্রবন্ধের লক্ষণ পূর্ববর্ণিত স্বকরণের অনুরূপ। তবে এই

গানে রাস তাল এবং দ্রুত লয়ের পরিবর্তে অন্য কোন বিলম্বিত তাল ব্যবহার করা হয়। দু'বার উদ্‌গ্রাহ অংশটি গেয়ে ধ্রুব এবং আভোগ একবার গাওয়া হয়। পরে আর একবার ধ্রুব অংশটি গেয়ে গান শেষ করা হয়। কঙ্কাল, প্রতিতাল, কুড়ুক্ক, দ্রুতমঠ্ঠক—এই চারটি তালের কোনও একটিতে যদি বর্তনী প্রবন্ধ গাওয়া হয় তবে সেটির নাম হয় বিবর্তনী প্রবন্ধ।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহের প্রথমার্ধটি দু'বার এবং উত্তরার্ধটি একবার গেয়ে গমকযুক্ত মেলাপক গাওয়া হয়। তবে এটি যে গাইতেই হ'বে এমন কোন নিয়ম নেই। এরপর ধ্রুব অংশটি দু'বার গেয়ে একবার আভোগ অনুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে দশটি তালের ব্যবহার দেখা যায়। কল্লিনাথের মতে এই দশটির যে কোন একটি তালে গাওয়া নিয়ম। দশটি তাল হ'ল—নিঃসারুক, কুড়ুক্ক, ত্রিপুট, প্রতিমঠ, দ্বিতীয়, গারুগী, রাস, যতি, লগ্ন, অড্ড এবং একতালী।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধ দু'প্রকার—তারজ এবং অতারজ। গদ্যজ, পদ্যজ এবং গদ্যপদ্যজ—এই তিন শ্রেণীর ঝোম্বড়া প্রবন্ধ হওয়াতে এটি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হত। ঝোম্বড়া প্রবন্ধের মোট সংখ্যা ৩৫১০।

লম্ভক প্রবন্ধে সমস্ত উদ্‌গ্রাহটি একখণ্ডে অথবা দুটি খণ্ডে ভাগ ক'রে গাওয়া যেতে পারে। ধ্রুব এবং আভোগও একটি অথবা দুটি খণ্ডে বিভক্ত ক'রে গাওয়া যেতে পারে। দুটি খণ্ডে বিভক্ত ধ্রুব ঝোম্বড়ার মত প্রথমার্ধ এবং উত্তরার্ধ ভাগে বিভক্ত হয়। এর পর আভোগ গেয়ে আবার ধ্রুবের অনুষ্ঠান ক'রে লম্ভক প্রবন্ধ সমাপ্ত করা হয়। ছয় প্রকার লম্ভক প্রবন্ধ বর্তমান—প্রলম্ভ, ভাগলম্ভ, লম্ভপদ, অনুলম্ভ, উপলম্ভ, বিলম্ভ।

রাসক প্রবন্ধের লক্ষণ ঝোম্বড়া প্রবন্ধের মত, কিন্তু এটি গমকস্থানবর্জিত। ঝোম্বড়া প্রবন্ধের মেলাপক অংশটি গমকযুক্ত। সুতরাং গমকস্থানবর্জিত অর্থে এ কথাই অনুমান করা যেতে পারে যে রাসক প্রবন্ধ মেলাপক বর্জিত। কল্লিনাথও একথা সমর্থন করেছেন। রাসক প্রবন্ধ রাসতালে গাওয়া হতো। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে রাসক প্রবন্ধ গণ, বর্ণ, এবং মাত্রা ভেদে তিন প্রকারে নিবদ্ধ হতে পারে।

শুদ্ধসূড় প্রবন্ধের শেষ প্রবন্ধ একতালিকা। এই প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব গাওয়া হয় দু'বার। আভোগ অংশটিও দু'বার গাওয়ার পর আবার ধ্রুব অংশটি গেয়ে গান শেষ করার নিয়ম। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই প্রবন্ধের উদ্‌গ্রাহ

অংশটি শুধুমাত্র আলাপ এবং তা যদি না হ'ত তবে উদ্‌গ্রাহে পদের অস্তিত্ব থাকত। এটি তারাবলীজাতীয় এবং পদতালবদ্ধ মেলাপকবর্জিত প্রবন্ধ।

আলিজাতীয় প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রথমে আলোচ্য 'বর্ণ' প্রবন্ধ। বেশীরভাগ বর্ণ প্রবন্ধই কর্ণাটভাষায় লেখা। এই প্রবন্ধে বর্ণতালের প্রয়োগ হতো। বর্ণ প্রবন্ধে কলির উল্লেখ নেই। তবে সব প্রবন্ধেই যখন এগুলির অস্তিত্ব থাকে তখন ঠিক ঐ ভাবে বর্ণ প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও পদগুলিকে কলি অনুসারে সাজিয়ে নেওয়া হতো। কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধটি ত্রিধাতুক এবং বিরুদ-পদ-তালবদ্ধ হওয়াতে বর্ণপ্রবন্ধ ভাবনীজাতীয়।

বর্ণপ্রবন্ধের পর গদ্য প্রবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছন্দ নেই এরূপ পদ-সমষ্টিকে গদ্য বলা হয়। গদ্য প্রবন্ধে এলোমেলো গদ্য ব্যবহৃত হয় না। এই গদ্যের একটা সুসম্বন্ধ রূপ থাকা প্রয়োজন। ছন্দশাস্ত্রেও গদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গদ্যপ্রবন্ধ ছ' প্রকার—উৎকলিকা, চূর্ণ, ললিত, বৃত্তগন্ধি, খণ্ড এবং চিত্র শার্ঙ্গদেবের মতে গদ্যগুলি সৃষ্টি হয়েছে সামবেদ থেকে।

গদ্য প্রবন্ধের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে তাল ব্যবহৃত হয় না। আদিতে গমক, বর্ণ এবং স্বর সহকারে প্রণব বা ওঙ্কার বন্দনা করা হয়। বর্ণ অর্থে স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগ বুঝিয়েছেন কল্লিনাথ। কিন্তু সিংহভূপালের মতে বর্ণ হ'ল পদ এবং অর্থের সংযোগ। এই বাক্যাংশের মাঝে মাঝে বা শেষে স্বর অর্থাৎ সরগমের ব্যবহার দেখা যায়। তালবর্জিত অনুষ্ঠানের পর সতাল অনুষ্ঠানের নির্দেশ পাওয়া যায়। পরের দু'টি পদ তাল সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে। কল্লিনাথের মতে প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুটি পদই তালের পার্থক্য না ঘটিয়ে দু'বার ক'রে গাওয়া উচিত। এই দুটি পদের নাম প্রবন্ধাঙ্ক। এর পর একবার বিলম্বিত লয়ে প্রয়োগের (অর্থাৎ অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি) আচরণ হবে। প্রয়োগের অনুষ্ঠানের পর আবার সতাল অনুষ্ঠান হ'বে। এই অংশে বাগ্‌গেয়কার এবং নায়কের নাম থাকবে। সতাল অনুষ্ঠানের সময়ে লয়ের পরিবর্তন দেখা যায়।

কল্লিনাথের মতে এই গদ্য প্রবন্ধের তালবর্জিত ভাগটি উদ্‌গ্রাহ। পরবর্তী তালবদ্ধ পদদ্বয় ধ্রুবা হিসাবে গণ্য করা হয়। এর পরের প্রয়োগ এবং সতাল অনুষ্ঠানকে আভোগরূপে কল্পনা ক'রে নেওয়া হয়। গদ্যপ্রবন্ধ ত্রিধাতুক এবং যেহেতু এই প্রবন্ধের পদ-স্বর তালবদ্ধ সেই হেতু এটি ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধ।

গদ্যপ্রবন্ধের পর কৈবাড় নামক প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে

পাটাক্ষর দ্বারা উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের আচরণ করা হয় এবং শেষ করার সময়ে উদ্‌গ্রাহ অংশটি আবার গাওয়া হয়। কৈবাড় প্রবন্ধ দু'প্রকার—সার্থক এবং অনর্থক।

এরপর পাওয়া যাচ্ছে অংকচারিণী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বীর এবং রৌদ্র রস পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ শুধুমাত্র বিরুদ দ্বারা বদ্ধ। অংকচারিণী প্রবন্ধের আভোগে নায়কের নাম থাকে। কল্লিনাথ এখানে বীর বলতে দানবীর, দয়াবীর যুদ্ধবীরকে বুঝিয়েছেন। সিংহভূপাল বিরুদ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—"গুণো নাম ভূজবলভীমাদি বিরুদশব্দে নোচ্যতে।" বীররসের সঙ্গেই বিরুদ অঙ্গটির প্রাধান্য দেখা যায়। এই প্রবন্ধ ছ'প্রকার -বাসবী, কলিকা, বৃত্তা, বীরবতী, বেদোত্তরা এবং জাতিমতী।

এরপর কর্ণাটদেশীয় ভাষায় প্রচলিত কন্দ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ পাট এবং বিরুদ দ্বারা আবদ্ধ। শার্ঙ্গদেবের মতে কন্দ প্রবন্ধে তাল ব্যবহৃত হয় না। সিংভূপাল এ বিষয়ে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গে এক মত। কল্লিনাথের মতে -"তালরূপেণ শূন্যো গেয় ইত্যর্থঃ ন তাল নিয়মশূন্য ইতি বিবক্ষিতঃ।" এই মতটি স্বাভাবিক; কারণ আর্যাগীতি নামে যে ছন্দ আছে তা কন্দ প্রবন্ধের জন্য নির্দিষ্ট।

কন্দ প্রবন্ধের পরে হয়লীলা প্রবন্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ হয়লীল তালে গাওয়া হয়। হয়লীলা প্রবন্ধ দু'প্রকার—গদ্যজ এবং পদ্যজ।

গজলীলা নামক প্রবন্ধ গজলীল নামক তালে গাওয়া হয়। এই প্রবন্ধও গদ্যজ, পদ্যজ ভেদে দু'প্রকার। গজলীল নামে কোন ছন্দ পাওয়া যায় না তবে 'ঋষভগজবিলসিত' নামে একটি ষোড়শাক্ষরা বৃত্তির ছন্দ আছে। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এটির পরিচয় দিয়েছেন গজবিলসিত নাম দিয়ে। কিন্তু এই ছন্দের সঙ্গে গজলীলা প্রবন্ধের কোন যোগ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে কল্লিনাথ কিছু বলেননি।

দ্বিপদী প্রবন্ধ চার প্রকার -শুদ্ধা, খণ্ডা, মাত্রা এবং সম্পূর্ণা। এই প্রবন্ধ গাওয়া হয় করুণ তালে। দ্বিপদী প্রবন্ধ ত্রিধাতুক। তাল এবং নিয়ম নির্দিষ্ট থাকাতে এটি দুই অঙ্গযুক্ত তারাবলীজাতীয় প্রবন্ধ।

এরপর পাওয়া যাচ্ছে চক্রবাল প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ দু'প্রকার—গদ্যজ এবং পদ্যজ। কল্লিনাথের মতে এই গানে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব গাওয়া অবশ্য কর্তব্য। আভোগ আচরণের কোন বাঁধা নিয়ম নেই। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক। এই প্রবন্ধে তালাদি নিয়ম রক্ষিত হয় তাই এটি নির্যুক্ত প্রবন্ধ এবং পদ-তাল বদ্ধ হওয়াতে তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ।

ক্রৌঞ্চপদ প্রবন্ধ প্রতিতালে গাওয়া হয়। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধের উদ্গ্রাহ হবে স্বর এবং পদ হবে ধ্রুব। স্বর গেয়ে এই গানের শেষ হয়। অর্থাৎ প্রথমে স্বর, পরে ধ্রুব এবং শেষে আবার স্বর আচরণের নিয়ম।

স্বরার্থ প্রবন্ধে কেবলমাত্র 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—এই স্বরাক্ষর-এর মধ্য দিয়ে বাগ্‌গেয়কারের অভিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধ দু'প্রকার—শুদ্ধ এবং মিশ্রিত। এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটে গ্রহ স্বরে এবং এই গ্রহই এর ন্যাস স্বর।

ধ্বনীকুট্টনী প্রবন্ধে উদ্গ্রাহ এবং ধ্রুব অংশ ভিন্ন তালে গাওয়া হয়। এই প্রবন্ধে মণ্ঠ এবং কঙ্কাল তালের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই গানে প্রত্যেক পদবিরতির মধ্যে মাত্রাসংখ্যা সমান থাকে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে ধ্বনীকুট্টনী প্রবন্ধ মেলাপক বর্জিত। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধে মেলাপকের ব্যবহার বৈকল্পিক। সিংহভূপালের মতে ধ্বনিকুট্টনী প্রবন্ধে মেলাপক অংশটি অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক, পদ-তাল বদ্ধ তারাবলী-জাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

আর্যা প্রবন্ধ আর্যাছন্দে গাওয়া হয়। চরণান্তে অথবা প্রথমার্ধের শেষে সা-রে-গা-মা ইত্যাদি স্বর উচ্চারণ করা হয় এবং এই অংশটি দু'বার গাওয়া হয়। দ্বিতীয় অর্ধ গাওয়া হয় একবার। প্রথমার্ধটি হ'ল উদ্গ্রাহ এবং দ্বিতীয়ার্ধটি হ'ল ধ্রুব। আভোগ, অংশে থাকে গাতা বা নেতার নাম। উদ্গ্রাহ অংশের পুনরাবৃত্তির পর গান শেষ হয়।

গাথাপ্রবন্ধ প্রাকৃতপদ অবলম্বনে গাওয়া হয়ে থাকে। এই প্রবন্ধের অন্যান্য নিয়মগুলি আর্যা প্রবন্ধের মতই।

দ্বিপথ প্রবন্ধ গাওয়া হয় দ্বিপথ ছন্দ অবলম্বনে। এই প্রবন্ধের শেষে স্বরাচরণ বিধেয়। শার্ঙ্গদেব একে "স্বরমুক্তিক:" বলেছেন। দ্বিপথ প্রবন্ধ তালহীন এবং সতাল দু'রকমই হয়। এটী তিন ধাতু বিশিষ্ট ; কারণ এতে মেলাপক নেই। এই প্রবন্ধ চার প্রকার।

কলহংস প্রবন্ধ কলহংস ছন্দে রচিত হয়। কল্লিনাথ দ্বাদশাক্ষর পর্যায়ের হংস নামক ছন্দকে কলহংস ছন্দ নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধে প্রতি-পাদের শেষে স্বরানুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়। এই গানে ঝম্পাতাল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এরও ধাতুর সংখ্যা তিন। কলহংস প্রবন্ধ দু'প্রকার— কর্ণজ এবং মাত্রিক।

তোটক প্রবন্ধ তোটক ছন্দে বাঁধা থাকে। এই গানে প্রতিপাদের শেষে

স্বরানুষ্ঠান হয়। এতে উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগ বর্তমান। তোটক প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং ভাবনীজাতীয়।

এরপর ঘট প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বোল্লিখিত দ্বিপদী প্রবন্ধের অর্ধেক অংশ নিয়ে ঘট প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়। তেনক অঙ্গের অনুষ্ঠানের পর এই গান শেষ হয়।

বৃত্ত-প্রবন্ধ যে কোন ছন্দে, ইচ্ছামত তালে গাওয়া চলত। এই প্রবন্ধের শেষে স্বরানুষ্ঠান হয়। মতান্তরে স্বরানুষ্ঠান বর্জিত বৃত্ত প্রবন্ধের কথা বলা হয়।

এর পর মাতৃকা প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃকা শব্দের অর্থ বর্ণমালা। প্রথম পদ অ-কার, দ্বিতীয় পদ আ-কার এইভাবে ক্রমান্বয়ে ক্ষ-কার পর্যন্ত পদ এই প্রবন্ধে রচনা করা হয়। এই প্রবন্ধে মার্গতাল এবং দেশী তাল ব্যবহৃত হতো। এই প্রবন্ধ দু'প্রকার গদ্যজ এবং পদ্যজ। মাতৃকা প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং তারাবলী জাতীয়।

রাগকদম্বক প্রবন্ধ দু'প্রকার—নন্দাবর্ত এবং স্বস্তিক। কল্লিনাথের মতে রাগ-কদম্বক কেবলমাত্র উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব সহযোগে গাওয়া হয়। এটি দ্বিধাতুক।

পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধে প্রথমে রাগালাপ করা হয়। এর পর পাঁচটি পদ দু'বার করে গাওয়া হয়। এই প্রবন্ধে আরম্ভে যে আলাপ শেষেও সেই আলাপ করা কর্তব্য।

তালার্ণব হ'ল আলিক্রম পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বহু তাল প্রয়োগ করা হয়। তালার্ণব প্রবন্ধ দু'প্রকার—গদ্যজ এবং পদ্যজ। কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধ উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, আভোগযুক্ত ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং মেদিনীজাতীয়।

বিপ্রকীর্ণ পর্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধ

বিপ্রকীর্ণ পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'শ্রীরঙ্গ'। রাগকদম্ব প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের মিল পাওয়া যায়। বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধে চারটি রাগ এবং চারটি তাল ব্যবহৃত হয়। শেষে পদবিন্যাস বর্তমান। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক নির্যুক্ত এবং মেদিনীজাতীয়।

শ্রীবিলাস প্রবন্ধে পাঁচটি তাল এবং পাঁচটি রাগের ব্যবহার পাওয়া যায়। শেষে স্বরানুষ্ঠান হয়।

পঞ্চভঙ্গি প্রবন্ধের শেষে তেনক যোজিত হয়—এই একটিমাত্র লক্ষণের কথাই

শার্ঙ্গদেব বলেছেন। সিংহভূপালের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে এই প্রবন্ধ দুটি রাগ এবং দু'টি তালে নিবদ্ধ থাকে।

পঞ্চানন প্রবন্ধে শেষে পাঠ-এর আচরণ হয়। অন্যান্য লক্ষণ পঞ্চভঙ্গি প্রবন্ধের মত।

উমাতিলক প্রবন্ধে তিন প্রকার রাগ এবং তিন প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়। শেষে বিরুদ সংযুক্ত হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি প্রবন্ধ সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে এগুলি ছয়টি অঙ্গ যুক্ত।

ত্রিপদী প্রবন্ধে চারটি পদ বর্তমান। এই প্রবন্ধ তালহীন এবং কর্ণাট ভাষায় রচিত। চারটি পদ থাকা সত্ত্বেও এই প্রবন্ধের নাম ত্রিপদী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধে প্রথম দু'টি পদ একই রকম হওয়াতে এদের একটি পদ বলে মনে হয়। ত্রিপদী প্রবন্ধের প্রথম পদ দুটি উদ্‌গ্রাহ এবং বাকী পদ দু'টি ধ্রুব। ইচ্ছানুসারে এতে আভোগের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কল্লিনাথের মতে এটি তারাবলী জাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

চতুষ্পদী প্রবন্ধের চারটি পাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রত্যেকটিতে ষোলটি ক'রে মাত্রা থাকে এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটিতে পনেরটি ক'রে মাত্রা থাকে। কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধের পূর্বার্ধ স্বরসংযুক্ত এবং উত্তরার্ধ তেনক সংযুক্ত। তেনক-এর অনুষ্ঠান দ্বারা এই গান শেষ হয়। এই প্রবন্ধে আভোগের পরিকল্পনাও দেখা যায়। এটি ভাবনী জাতীয়।

ছ'টি পাদ নিয়ে গঠিত হয় ষট্‌পদী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ কর্ণাট ভাষায় রচিত হয়। এতে তাল ব্যবহৃত হয় না। এই প্রবন্ধের প্রথম তিনটি পাদ হ'ল উদ্‌গ্রাহ এবং শেষের তিনটি পাদ ধ্রুব। আভোগের অস্তিত্বও কল্পনা করা হয়ে থাকে। এটি তারাবলী জাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

বস্তু প্রবন্ধে থাকে পাঁচটি পাদ। এটি ত্রিধাতুক। কল্লিনাথ বলেছেন যে এটি পঞ্চাঙ্গযুক্ত, বিরুদহীন, আনন্দিনীজাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

বিজয় প্রবন্ধ গাওয়া হত রাজাদের বিজয় উৎসব উপলক্ষে। তেন, স্বর, পাট, পদ সহযোগে এই গান গাওয়া হত। এই গানে বিজয়তাল ব্যবহৃত হত। স্বরযুক্ত অংশটি উদ্‌গ্রাহ এবং পাট ও পদযুক্ত অংশটি ধ্রুব। এটি আনন্দিনীজাতীয়।

ত্রিপথক প্রবন্ধে থাকে তিনটি পাদ। কল্লিনাথ বলেছেন যে, এই প্রবন্ধের প্রথম দুটি পাদ উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। এতে আভোগও পাওয়া যায়। ত্রিপথক হ'ল আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

চারটি চরণ এবং চারটি বর্ণ (স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী) ব্যবহৃত হয় চতুর্মুখ প্রবন্ধে। প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ, দ্বিতীয় পাদদ্বয় ধ্রুব। আভোগ রচিত হয় পদান্তর দ্বারা। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক. নির্যুক্ত, বিরুদ-বর্জিত হওয়ায় পঞ্চাঙ্গযুক্ত আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

এর পর সিংহলীল প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ গাওয়া হয় সিংহলীল তালে। এতে স্বর, পাট, বিরুদ, তেনক বর্তমান। কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধের স্বর, পাট দ্বারা গঠিত অংশ উদ্‌গ্রাহ এবং বিরুদ, তেনক দ্বারা গঠিত অংশ ধ্রুব। পদের সাহায্যে আভোগ সৃষ্টি হয়। এটি ত্রিধাতুক মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

হংসলীল তালে গাওয়া হয় হংসলীল প্রবন্ধ; প্রথম পাদটি উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয় পাদটি ধ্রুব। পদান্তব ক'রে আভোগ রচনা করা হয়। সুতরাং এটি ত্রিধাতুক। পদ, পাট, তাল এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এটি ভাবনী জাতীয় প্রবন্ধ।

দণ্ডক প্রবন্ধ গাওয়া হয় দণ্ডক ছন্দে, পদ এবং স্বব সহযোগে। পদ দ্বারা গঠিত দণ্ডকের পূর্বার্ধ উদ্‌গ্রাহ। স্বর দ্বারা গঠিত দণ্ডকেব উত্তরার্ধ ধ্রুব। পদান্তর ক'রে আভোগ রচনা করতে দেখা যায়। সেই হিসাবে দণ্ডক প্রবন্ধ ত্রিধাতুক। এই প্রবন্ধে স্বর, পদ, তাল ব্যবহৃত হওয়ায় এটি ভাবনীজাতীয়।

ঝম্পট প্রবন্ধ গাওয়া হত ঝম্পট ছন্দে, ক্রীড়াতালে। কল্লিনাথ বলেছেন, এই প্রবন্ধের প্রথম দুটি পাদ উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। যদি আভোগ কল্পনা করা হয় তবে এই প্রবন্ধ হবে ত্রিধাতুক। এই প্রবন্ধ নির্যুক্ত এবং তারাবলী-জাতীয়।

কন্দুক প্রবন্ধের প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। এটি নির্যুক্ত এবং দীপনীজাতীয় প্রবন্ধ।

ত্রিভঙ্গি প্রবন্ধে স্বর, পাট, পদ বর্তমান। এই প্রবন্ধ পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রকার ত্রিভঙ্গী তালে গাওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারে ত্রিভঙ্গী ছন্দ ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় প্রকার ত্রিভঙ্গ প্রবন্ধে তিন রকম রাগ ও তিন রকম তাল ব্যবহৃত হয়। চতুর্থ প্রকার গাওয়া হয় তিন রকম ছন্দে। পঞ্চম প্রকারে তিনটি দেবতার স্তুতি সংযোজিত হয়।

হরিবিলাসক প্রবন্ধে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে যথাক্রমে বিরুদ, পাট এবং তেনকের অনুষ্ঠান হয়।

প্রথম খণ্ড হ'ল উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হ'ল ধ্রুব। পদান্তর দ্বারা আভোগ সৃষ্ট হয়। কল্লিনাথ বলেছেন এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

সুদর্শন প্রবন্ধ হরিবিলাসক প্রবন্ধের মত। এতে পদ, বিরুদ এবং তেনকের ব্যবহার দেখা যায় এবং এতে স্বর ও পাটের ব্যবহার না থাকায় কল্লিনাথ এই প্রবন্ধকে দীপনীজাতীয় বলেছেন।

স্বরাঙ্ক প্রবন্ধে পদ, স্বর এবং বিরুদ ও তিনটি ধাতু বর্তমান। এতে ক্রমান্বয়ে তিনটি তালের ব্যবহার হয়। তবে শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে এটিকে মেলাপক বর্জিত ব'লে মনে হতে পারে। সিংহভূপালও এই প্রবন্ধে মেলাপক আছে ব'লে মনে করেন না। তবে কল্লিনাথ এই প্রবন্ধের পদকে উদ্‌গ্রাহ, স্বরকে মেলাপক এবং বিরুদকে ধ্রুব বলে বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে এই প্রবন্ধ গাইতে হ'বে মালবশ্রী রাগে। এই প্রবন্ধে মেলাপক এবং আভোগ আছে ব'লে মেনে নিলে এটিকে চতুর্ধাতুক প্রবন্ধ বলতে হ'বে—এই মত প্রকাশ করেছেন কল্লিনাথ। এটি নির্যুক্ত এবং দীপনীজাতীয়।

শ্রীবর্ধন প্রবন্ধে বিরুদ, পাট, পদ ও স্বর বর্তমান এবং এর বিরুদ ও পাট নিয়ে উদ্‌গ্রাহ এবং পদ ও স্বর নিয়ে ধ্রুব অংশটী সংগঠিত।

হর্ষবর্ধন প্রবন্ধেও পদ, বিরুদ, স্বর, পাট বর্তমান। অবশ্য সিংহভূপাল বলেছেন যে এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র পদ ও বিরুদ থাকে।

বদন প্রবন্ধে ছ-গণ (s s s I), প-গণ (s s) এবং দ-গণ (s)—এর ব্যবহার হয়। এই মাত্রা গণ তিনটি হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ। স্বর ও পাট দ্বারা রচিত পরের পদটি ধ্রুব। এই মতটি কল্লিনাথের।

উপবদন এবং বস্তু-বর্ণনি প্রবন্ধেও স্বর এবং পাট যুক্ত পদ থাকে। পদান্তরের সাহায্যে আভোগের পরিকল্পনাও করা হয়। এটি দীপনী জাতীয়।

চচ্চরী তালে হিন্দোল রাগে গাওয়া হয় চচ্চরী প্রবন্ধ। এই গান বসন্তোৎসবে গাওয়া হয়। ক্রীড়াতালেও কেউ কেউ এই গান গেয়ে থাকেন। কল্লিনাথ বলেছেন, এতে উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগ বর্তমান। এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত, তারাবলী জাতীয়।

চর্যা প্রবন্ধ পদ্ধড়ী ছন্দে এবং আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বনে রচিত। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। চর্যাগীতি দু'প্রকার—পূর্ণা ও অপূর্ণা।

পদ্ধড়ী প্রবন্ধ পদ্ধড়ী ছন্দে রচিত হয়, এতে বিরুদ, স্বর এবং পাট বর্তমান। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং আনন্দিনী জাতীয়।

সংগ্রাম উপলক্ষে স্তুতিবাচক প্রবন্ধ হ'ল রাহড়ী। এই প্রবন্ধ বীররসাত্মক ও বহু পাদ সম্পন্ন। এটি ত্রিধাতুক এবং তারাবলী জাতীয়।

বীরশ্রী প্রবন্ধে পদ, বিরুদ যথাক্রমে উদ্গ্রাহ ও মেলাপক। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক এবং ভাবনী জাতীয়।

মঙ্গলাচার প্রবন্ধ কৈশিকী রাগে, নিঃসারু তালে, স্বরাচরণ সহযোগে গাওয়া হয়। তিন প্রকার মঙ্গলাচার প্রবন্ধ বর্তমান—গদ্যজ, পদ্যজ এবং গদ্যজ-পদ্যজ। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং ভাবনী জাতীয়।

ধবল প্রবন্ধে থাকে আশীর্বাণী। এই প্রবন্ধের পূর্বার্ধ উদ্গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। পৃথকভাবে আভোগ রচিত হয়। এটি তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ তিন প্রকার— কীর্তি, বিজয় এবং বিক্রম।

কল্যাণবাচক মঙ্গল প্রবন্ধ গাওয়া হতো বোট্টরাগে বা কৈশিকী রাগে এবং বিলম্বিত লয়ে।

দেশভাষায় রচিত, অনুপ্রাসযুক্ত তিনটি খণ্ড সমন্বিত ওবীপদ প্রবন্ধ খুব সম্ভব শার্ঙ্গদেবের সময় দৌলতাবাদ অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই গানের শেষে 'ওবী' পদটি গাওয়া হয়।

লোলীপদ প্রবন্ধ প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ অনেকটা ওবীপদ প্রবন্ধের মত, শুধুমাত্র 'ওবী'-র স্থানে 'লোলী' পদ গাওয়া হয়।

লাটভাষায় রচিত ঢোল্লরীপদ প্রবন্ধের শেষে 'ঢোল্লরী' পদ যুক্ত হয়। এ সম্পর্কে এর বেশী কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

অধিক অনুপ্রাসযুক্ত, তিনটি খণ্ড সমন্বিত দণ্ডী প্রবন্ধের শেষে "দণ্ডী" পদের যোগ হয়। এই দণ্ডী শব্দের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ওবীপদ, লোলীপদ, ঢোল্লরীপদ এবং দণ্ডী এই চারটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কল্লিনাথের অভিমত হ'ল এই যে, পদ এবং তাল বদ্ধ হওয়ায় এরা তারাবলী জাতীয়।

প্রবন্ধ ভেদে উদগ্রাহ অংশ তিন খণ্ডে, দুই খণ্ডে বা এক খণ্ডে গাওয়া হতে পারে; ধ্রুব এবং আভোগ অংশও সেইরূপ। আভোগের শেষে ধ্রুবা অংশটী আর একবার গেয়ে গান শেষ করার রীতি। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে 'ধ্রুব' প্রবন্ধ সংগীতের নিত্য অংশ হওয়া সত্বেও কোনও কোনও প্রবন্ধে ধ্রুব বা আভোগ বর্জন

করা হয়েছে।'[১] কিন্তু কল্লিনাথ বলেছেন যে, ধ্রুব এবং আভোগ যখন থাকে না তখন অনেকগুলি উদ্‌গ্রাহের আচরণ হয়। সেক্ষেত্রে উদ্‌গ্রাহই ধ্রুবের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যে কোনও অবস্থাতেই হোক ধ্রুব অংশ প্রকৃত পক্ষে বর্জিত হয় না। আবার কোনও কোনও প্রবন্ধ কেবলমাত্র উদ্‌গ্রাহ্ এবং ধ্রুব সহযোগে গঠিত [২] বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে আবার এমন প্রবন্ধ রয়েছে যার পূর্বভাগের তিনটী পাদ উদ্‌গ্রাহ্ এবং শেষের তিনটী চরণ ধ্রুব।

সালগ সূড় প্রবন্ধ

সূড় (যাকে বলা হয়েছে শুদ্ধ সূড়), আলি, বিপ্রকীর্ণ—প্রবন্ধ সংগীত এই তিন ভাগে মোটামুটি ভাবে বিভক্ত থাকলেও বহুক্ষেত্রে এদেব মিশ্রণ ঘটেছে এবং পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন এবং মিশ্রণের মধ্য দিয়ে নূতন শ্রেণীবিভাগ পরবর্তীকালে সূচিত হয়েছে। শার্ঙ্গদেব 'সালগ-সূড়' শ্রেণীর যে প্রবন্ধ-এর কথা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে সাত প্রকার প্রবন্ধ—ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ডতাল, রাসক ও একতালী। এই একতালী-র সঙ্গে শুদ্ধসূড়স্থ একতালীর সম্পর্ক নেই।

'সালগ' শব্দটি 'ছায়ালগ' শব্দ থেকে এসেছে। 'ছায়ালগ' সম্পর্কে কল্লিনাথের ব্যাখ্যা এইরূপ—

"ছায়ালগঃ ছায়াং শুদ্ধসাদৃশ্যং লগতি গচ্ছতি ইতি তথোক্তঃ।"—অর্থাৎ যে সব গানে শুদ্ধ সংগীতের ছায়াপাত ঘটেছে সেইগুলিকে 'ছায়ালগ' বলা যায়। শুদ্ধ গীতের মধ্যে পড়ে জাতি, কপাল, কম্বল, গ্রামরাগ উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর ভাষা। শার্ঙ্গদেবের মতে যেহেতু এলা প্রভৃতি প্রবন্ধে শুদ্ধগীতের অনুসরণ পরিলক্ষিত হয় সেইহেতু এলা থেকে একতালী পর্যন্ত গীতগুলি শুদ্ধসূড়। এইসব গানের ক্ষেত্রে অতিলঙ্ঘন হয়নি বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু ধ্রুবা প্রভৃতি গানের ক্ষেত্রে অতিলঙ্ঘন ঘটেছে বলে' সেগুলি ছায়ালগ বা সালগ-এর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। শার্ঙ্গদেবের মতে এলা প্রভৃতি গীতের ছায়ালগত্ব আচার্যসম্মত ; কিন্তু তবুও শ্রোতার কাছে এগুলি শুদ্ধগীতের মত বলে প্রচলিত থাকায় এগুলিকে শুদ্ধ গীতরূপেই গ্রহণ করা হয়। তাঁর উক্তি—

"ছায়ালগত্ব মেলাদের্যদ্যপ্যাচার্য সম্মতং।
লোকে তথাপি শুদ্ধোঽসৌ শুদ্ধসাদৃশ্যতো মতঃ॥"

১। যেমন 'লম্ভক' প্রবন্ধ (শুদ্ধ সূড়)।

২। যেমন 'রাগ কদম্বক' প্রবন্ধ (আলি প্রবন্ধ)।

—এ থেকে প্রমাণিত হয় যে শার্ঙ্গদেব এলা প্রভৃতি গীতগুলিকে শুদ্ধসূড় বলে' মেনে নিয়েছিলেন।

সালগ প্রবন্ধের অন্তর্গত সাতটি প্রবন্ধের তিনটি সংগীত অংশ (ধাতু) থাকতো, যেমন—উদ্‌গ্রাহ, অন্তর এবং আভোগ; মেলাপক এখানে বর্জিত। তবে মঠ, প্রতিমঠ প্রভৃতির ছ'টি করে' অঙ্গ থাকতো।

ধ্রুব প্রবন্ধ গান সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

"এক ধাতুর্দ্বিখণ্ড স্যাদ্‌যত্রোদগ্রাহস্ততঃপরম্।।
কিঞ্চিদুচ্চং ভবেৎ খণ্ডম দ্বিরভ্যস্মিদম্ ত্রয়ম।
ততো দ্বিখণ্ড আভোগস্তস্য স্যাৎ খণ্ডমাদিমম্।।
এক-ধাতুর্দ্বিখণ্ডম্ চ খণ্ড মুচ্চতরম্ পরম্।
স্তত্যনামাঙ্কিতশ্চাসৌ ক্বচিত্বৈচ্ছেকখণ্ডকঃ।।
উদ্‌গ্রাহস্যাদ্যখণ্ডে চ ন্যাসঃ স·ধ্রুবকোভবেৎ।
একাদশাক্ষরাৎ খণ্ডেদৈকৈকাক্ষর বর্ধিতৈঃ।।
খণ্ডেধ্রুবাঃ ষোড়শ স্যুঃ ষড়বিংশত্যক্ষরাবধি।"

সিংহভূপালে এই শ্লোক ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন—

"ধ্রুবাদিভিঃ সপ্তভির্গীতৈঃ সালগ সূড় প্রবন্ধাঃ
তেষু ধ্রুবম্ লক্ষয়তি একধাত্বিতি
পূর্ব্বম্ সাদৃশগেয় খণ্ডাদ্বযুক্ত উদ্‌গ্রাহঃ কর্ত্তব্যঃ
ততোনন্তরম্ কিঞ্চিদুচ্চম্ খণ্ডমন্তরাখাম্ কর্ত্তব্যম্;
এতৎ ত্রয়োমপি দ্বিরাভস্তম্ দ্বির্গেয়ম্।
ততোনন্তরম্ খণ্ডদ্বয়মযুক্ত আভোগ, তস্য প্রথমং
খণ্ডদ্বয়-মেকধাতু সাদৃশগেয় খণ্ডদ্বয়যুক্তম্,
দ্বিতীয়-খণ্ডম্ ততোপ্যুচ্চম্ গাতোব্যম্
অসাবাভোগস্তত্যস্য নায়কস্য নাম্না যুক্তঃ কার্য্যঃ
ক্বচিৎকেষাচিন্মতে' যমুচ্ছৈকখণ্ডো গাতব্যঃ
উদ্‌গ্রাহস্য আদ্যখণ্ডে চ সমাপ্তি,
সা ধ্রুব ইতি জ্ঞেয়ঃ।"

সালগ সূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবাগীতির যে বিবরণ সংগীত-রত্নাকরে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, এই প্রবন্ধ-এর উদ্‌গ্রাহ অংশটীর দুই ভাগ। উদ্‌গ্রাহের পরেই যে অংশ তার নাম "অন্তর"। শার্ঙ্গদেবের ভাষায়—

"ধ্রুবা ভোগান্তরে জাতো ধাতুরণ্যোহন্তরাভিধঃ।
স তু সালগ সূড়স্থরূপকেষু এব দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ শুধুমাত্র সালগসূড়স্থ গীতিগুলিতেই ধ্রুব এবং আভোগ এই দুই ধাতুর মধ্যবর্তীস্থলে আর একটী ধাতু দেখা যায়, তার নাম "অন্তর"। এই 'অন্তর' অংশ কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে গাইবার নিয়ম—"কিঞ্চিদুচ্চং খণ্ডং অন্তরাখ্যাং কর্ত্তব্যম্"—সিংহভূপাল।

উদ্‌গ্রাহের দুই খণ্ড এবং অন্তর—এই তিনভাগই দু'বার করে গাইবার রীতি ছিল। ধ্রুব প্রবন্ধের আভোগ অংশও দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ড কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে গাইবার রীতি ছিল। সিংহভূপালের মত অনুসারে আভোগের শেষ খণ্ডটী অন্তরার চেয়েও উচ্চস্বরে গাইতে হবে এবং এই অংশে নায়কের নাম যুক্ত থাকবে। সমগ্র গানটীর পর উদ্‌গ্রাহের প্রথম খণ্ডটী গেয়ে গান শেষ করবার রীতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধে যেখানে রয়েছে উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপক এবং আভোগ - এই চারটী ধাতু সেখানে আমরা ধ্রুব প্রবন্ধে পাচ্ছি উদ্‌গ্রাহ (দুইখণ্ড), অন্তর এবং আভোগ (দুই খণ্ড)। কল্লিনাথ অবশ্য বলেছেন যে, সালগ সূড় প্রবন্ধ-এর "অন্তর" নামক অংশ প্রকৃতপক্ষে কোন বিশিষ্ট ধাতু নয়—লৌকিক রূপান্তর মাত্র—

"অয়মন্তরো লৌকিকরূপান্তর ইত্যুচ্যতে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কি ভাবে প্রবন্ধ সংগীত কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে বর্ত্তমানের ধ্রুপদ-এ রূপান্তরিত হয়েছে? এ সম্পর্কে একটী অভিমত এইরূপ—

"যে কোন কারণেই হৌক, উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপক এই দুই অংশ বাহুল্য মনে হওয়ায় এই দুই অংশ একেবারে বাদ দিয়ে ধ্রুব বা ধ্রুকলি থেকে গান আরম্ভ ক'রে আভোগে শেষ করবার রীতি পরিকল্পিত হয়। ধ্রুবকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত সংগীত পদ্ধতিকে স্বভাবতই ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ নামকরণ করা হয়। পরবর্ত্তীকালে "অন্তরা" ধ্রুপদে স্থান পায়। তা ছাড়া অন্তরা ধ্রুব ও আভোগের মধবর্ত্তী স্থানে ব্যবহার করার রীতি ছিলই। আভোগও দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে এবং এই আভোগের প্রথম অংশের নাম হয় 'সঞ্চারী'। এখনও সঞ্চারীর পর ধ্রুকলিতে ফিরে যেতে হয় না। এতেই মনে হয় যে সঞ্চারী ও আভোগ আভোগেরই দু'টী অংশ।" ('বাংলায় সংগীতের ইতিহাস'—মণিলাল সেন)।

আর একটি অভিমত হচ্ছে—"প্রাক্তন ধ্রুবস্থ উদ্‌গ্রাহটা আমাদের বর্তমান স্থায়ী, 'অন্তর' অংশটা বর্তমানে 'অন্তরা' নাম ধারণ করেছে। আভোগের প্রথম খণ্ডটা বর্তমান সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় আভোগ নামেই পরিচিত আছে।" ('সংগীত সমীক্ষা', পৃঃ ২১৩—রাজ্যেশ্বর মিত্র।)

প্রবন্ধ সংগীত ভালভাবে পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে, ধ্রুব হচ্ছে নিত্য অংশ এবং আভোগ অংশও সেইরূপ। কল্লিনাথের যে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, যে প্রবন্ধে ধ্রুব ও আভোগ থাকে না সেখানে একাধিক উদ্‌গ্রাহের আচরণ হয় এবং উদ্‌গ্রাহই সেক্ষেত্রে ধ্রুবের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ গানে প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাবনাও যেমন থাকতে হবে তেমনি থাকতে হবে তার পরিসমাপ্তি। "প্রস্তাবনার পরে স্বভাবতই আকাঙ্খার একটা রেশ থাকে এবং এই রেশটুকু আভোগে ক্ষয় করা হয়" ('প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা'—অমিয়নাথ সান্যাল)।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সালগ-সূড় প্রবন্ধের অন্তর্গত ধ্রুব শ্রেণীর প্রবন্ধে ধ্রুব অংশের উল্লেখ না থাকতে পারে; সে ক্ষেত্রে উদ্‌গ্রাহের দুই অংশের এক অংশই 'ধ্রুব'-এর প্রতিনিধিত্ব করতো এবং পরবর্তীকালে উদ্‌গ্রাহের এই দ্বিতীয় অংশই "স্থায়ী"[১] নামে অভিহিত হয়েছে এবং প্রথম অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। এর পরের অংশ—'অন্তর' পরবর্তীকালে "অন্তরা" নামে অভিহিত এবং আভোগের (ধ্রুব প্রবন্ধে আভোগের দুই খণ্ড) প্রথম খণ্ড সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় খণ্ড আভোগ নামে পরিচিত হয়েছে। সাহিত্য রসের ক্ষেত্রে যেমন সঞ্চারী (বা ব্যভিচারী) ভাব স্থায়ী ভাবের পরিণতি রসকে পরিপুষ্টি দান করে তেমনি প্রবন্ধ সংগীতের সঞ্চারী অংশ "স্থায়ী"-তে প্রস্তাবিত আকাঙ্খার পরিপুষ্টি সাধনে সাহায্য করে।

সুতরাং বর্তমানের ধ্রুপদ সালগসূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবাগীতির[২] পরিবর্তিত রূপ। 'পদ' বলতে সমগ্র গানটীকেই বুঝাতো, তাই ধ্রুবপদ কথাটা প্রথমে আসে এবং পরবর্তী কালে সংক্ষেপিত হয়ে 'ধ্রুপদ' নামকরণ হয়।

১। ধ্রুব=ধ্রু (স্থির হওয়া)+অ। সুতরাং এই স্থির থাকা অংশই স্থায়ী।

২। 'সঙ্গীতরত্নাকর'-এ ষোল প্রকার ধ্রুবাগীতির উল্লেখ আছে: জয়ন্ত, শেখর, উৎসাহ, মধুর, নির্মল, কুন্তল, কামল, চার, নন্দন, চন্দ্রশেখর, কামোদ, বিজয়, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক, ললিত। শার্ঙ্গদেব ছাড়া তানজোরের রাজা রঘুনাথ নায়ক (১৭শ শতাব্দী) ধ্রুবা শ্রেণীর ষোল প্রকার সালগসূড় প্রবন্ধের সঙ্গে ধ্রুব প্রবন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন ('সঙ্গীতশুদ্ধ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ধ্রুবগান এবং ধ্রুবাগান

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধ্রুব এবং ধ্রুবা এক জিনিস নয়। এদের রকম, গঠন এবং প্রয়োগ সবই বিভিন্ন। ধ্রুব নিবদ্ধ প্রবন্ধ শ্রেণীর গান এবং এটি সালগসূড় প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যদিকে ধ্রুবা নিবদ্ধ গান এবং এটি নাটকে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রচিত। মতঙ্গ, পার্শ্বদেব এবং শার্ঙ্গদেব—এঁরা ধ্রুব গানের বর্ণনা দিয়েছেন। আর ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে ধ্রুবা গানের আলোচনা করেছেন।

ধ্রুবাগান প্রাচীন নিবদ্ধ শ্রেণীর গান। নাট্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিবেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতের অনুষ্ঠান হত। এই গীতগুলিকে বলা হ'ত ধ্রুবা। এই গানের প্রয়োগ ছিল আবশ্যিক। ধ্রুবাগীতির অনুষ্ঠান হ'ত পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগে। এই "ধ্রুবাগীতি বৈদিক সামগানেরই পরবর্তী রূপ।"[১] নাট্যানুষ্ঠানে এগুলি ব্যবহৃত হলেও নাট্যকার এগুলি রচনা করতেন না। প্রচলিত কয়েক প্রকারের বাঁধা গানই ধ্রুবাগীতি রূপে প্রয়োগ করা হ'ত।

একক বা সম্মিলিত উভয় ভাবেই ধ্রুবা গাওয়া হ'ত। প্রধানত চচ্চৎপুট বা চাচপুট তালে এই গান গাওয়া হ'ত। গীতের সব লক্ষণ এতে থাকতো। যদিও ধ্রুবাকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর গীত হিসাবে গণ্য করা হয়, তথাপি মূলতঃ এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীত নয়—প্রচলিত পূর্বাংগগীতের অংশমাত্র। নাট্যানুষ্ঠান ছাড়া ধ্রুবাগীতি অনুষ্ঠানের রীতি ছিল না। সংগীতের আসরে ধ্রুবা যে মূল গানের অংশবিশেষ সেটা সম্পূর্ণ গাইবার রীতি ছিল।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে ধ্রুবার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এই ভাবে—

ধ্রুবাসংজ্ঞানি তানি স্যুর্নারদ প্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
গীতাঙ্গহীন সর্বানি বিনিযুক্তান্যনেকশঃ॥
যা ঋচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ।
সপ্তরূপপ্রমাণং চ সা তদ্ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতম্॥

—নাট্যশাস্ত্র ৩২।১-২

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, ভরত তাঁর পূর্ববর্তী নারদ প্রমুখ শাস্ত্রকারদের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলেছেন যে, ঋক্, পাণিকা, গাথা—এই তিন প্রকার

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, উত্তরভাগ কলিকাতা (১৩৬৩), পৃঃ ২৩২

গীতি এবং মদ্রক, উল্লোপ্যক, অপরান্তক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর—এই সপ্তগীতকে ধ্রুবা বলে। এই সপ্তগীতির বহু অঙ্গ ছিল। সব ক'টী অঙ্গের প্রয়োগ ধ্রুবায় হ'ত না। শুধু যে বিশেষ অঙ্গগুলি উদ্ধৃত ক'রে নানা ছন্দে গাওয়া হ'ত সেইগুলিকেই বলা হ'ত ধ্রুবা।

এভ্যস্তঙ্গেভ্য উদ্‌ধৃত্য নানা ছন্দঃকৃতানি চ।
ধ্রুবাত্বং যানি গচ্ছন্তি তানি বক্ষ্যাম্যহং দ্বিজাঃ॥

[নাট্যশাস্ত্র ৩২ অধ্যায়]

এই অঙ্গগুলির উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রে আছে। সেগুলি হ'ল মুখ, প্রতিমুখ, বৈহায়স, স্থির বা স্থিত, প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্ত, বজ্র, সন্ধি, সংহরণ, প্রস্তার, উপবর্ত, মাষঘাত, চতুরস্র, অবপাতন বা উপপাত, প্রবেশ্য বা প্রবেণী, শীর্ষক, সংপিস্টক বা সংবিস্টতা, অন্তাহরণ, মহাজনিক। এই অঙ্গগুলি ধ্রুবার কাব্যরূপকে গড়ে তোলে। ভরতের মতে পরিগীতিকা, মদ্রক, চতুষ্পদা প্রভৃতি ধ্রুবার কলেবরকে পরিপুষ্ট করে।

বিচিত্র বৃত্ত থেকে সৃষ্ট ধ্রুবা পাঁচটী শ্রেণীতে বিকশিত—প্রাবেশিকী, নৈষ্ক্রামিকী আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, এবং অন্তরা [১] [ধ্রুবাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া নানাবৃত্তসমুদ্ভবাঃ"]

(১) নাটকের প্রস্তাবনায় বিচিত্র রস এবং ভাবের ব্যঞ্জনা দান ক'রে যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তার নাম প্রাবেশিকী।

(২) নাটকের কোনও অঙ্কের শেষে পাত্রগণের নিক্রমণ উপলক্ষে যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তার নাম আক্ষেপিকী।

(৩) নির্দিষ্ট রসের বদলে অন্য রসের অবতারণা ক'রে সেই বিজাতীয় রসের মধ্যে সাম্যসৃষ্টির প্রয়োজনে যে ধ্রুবা গান গাওয়া হ'ত তার নাম প্রাসাদিকী॥

১। (ক) নানারসার্থযোগং নৃণাং যো গীয়তে প্রবেশেষু।
প্রাবেশিকী তু নাম্না বিজ্ঞেয়া সা ধ্রুবা তজ্‌জ্ঞৈঃ॥

(খ) অঙ্কান্তে নিষ্ক্রান্তে যা তু ভবেৎ প্রস্তুত স্তুতিযোগে।
নিষ্ক্রামোপগতগুণা বিদ্যান্নৈষ্ক্রামিকীং তাং তু॥

(গ) ক্রমমুল্লঙ্‌ঘ্য বিধিজ্ঞৈঃ ক্রিয়ন্তে যা দ্রুতলয়েন নাট্যবিধৌ।
আক্ষেপিকী ধ্রুবাসৌ দ্রুতা স্থিতা বাপি বিজ্ঞেয়া॥

(ঘ) যা চ রসান্তরমুপগতমাক্ষেপবশাৎ প্রসাদয়তি।
রঙ্গরাগপ্রসাদ জননীজ্ঞেয়া প্রসাদিকী সা তু॥

(ঙ) বিষন্নে বিস্মৃতে ক্রুদ্ধে সুপ্তে মত্তেহথ সঙ্গতে।
গুরুভারাবসন্নে চ মূর্ছিতে পতিতে তথা॥
দোষ প্রচ্ছাদনে যা চ গীয়তে সান্তরা ধ্রুবা॥ [নাট্যশাস্ত্র ৩২ অধ্যায়]

(৫) বিষণ্ণতা, বিস্মৃতি, ক্রোধ, সুপ্তি, মত্ততা, সঙ্গতা, গুরুভারে অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, পতন, দোষ ঢাকা প্রভৃতি ব্যাপারে যে গান করা হ'ত তাকে বলা হ'ত অন্তরা।

এই পাঁচ প্রকার মূল ধ্রুবা। এছাড়া ছন্দ, বৃত্ত ও জাতিভেদ ধ্রুবার বিচিত্ররূপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—তটি, ধৃতি, রজনী, ভ্রমরী, জয়া, বিদ্যুৎভ্রান্তা, ভূতলতন্বী, কমলমুখী, শিখা, ঘনপঙ্‌ক্তি, মালিনী, বিমলা, ডালা, রম্যা, ভীমা, নলিনী, নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা, সমুদ্রা প্রভৃতি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্রুবার পদ শঙ্করস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতো। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ধ্রুবার পদ রচিত হ'ত।

নাটকের বিভিন্ন পরিবেশে গাইবার জন্য আরও কয়েক প্রকার ধ্রুবা নির্দিষ্ট ছিল।

অপকৃষ্ট—বদ্ধ, নিরুদ্ধ, পতিত, ব্যথিত, মূর্ছিত, মৃত, প্রভৃতি করুণ পরিবেশে এই শ্রেণীর ধ্রুবা প্রয়োগ করা হ'ত।

স্থিতা—ঔৎসুক্য, অবহিত, চিন্তিত, পরিবেদিত, শ্রম, দৈন্য, বিষাদ প্রভৃতি পরিবেশে এই ধ্রুবা গাওয়া হ'ত।

দ্রুতা—আবেগযুক্ত এই ধ্রুবা অপকৃষ্ট ধ্রুবার মত করুণ পরিবেশে গাইবার রীতি ছিল। মৃত্যু ও আহত হবার প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটলে স্থিতা ধ্রুবা গাওয়া হ'ত। বিষাদ, প্রমাদ, ক্রোধ, রৌদ্র, ভয়, বীরত্ব প্রকাশের ঘটনা ঘটলে দ্রুত ধ্রুবার অনুষ্ঠান হ'ত। শরসন্ধান, রোষ, প্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে গাওয়া হ'ত অন্তরা ধ্রুবা।

শীর্ষক—এই ধ্রুবা দেবতা ও রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উদ্ধতা—এটীও দেবতা ও রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে এটী প্রয়োগ করা হ'ত রৌদ্র বা বীর রসাত্মক পরিবেশে।

অনুবদ্ধ—যতি, লয়, বাদ্যের গতি, পদ, বর্ণ, স্বর, অক্ষর—এইগুলি যে ধ্রুবার সম্বন্ধযুক্ত তার নাম অনুবদ্ধ ধ্রুবা। নাট্যানুষ্ঠানের সময় নানা কারণে সাধারণভাবে এটী প্রয়োগ করা হ'ত।

দ্রুতবিলম্বিতা—নাটকের গতি অব্যাহত রাখার জন্যে যা দ্রুত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত কিন্তু নাট্যধর্মের প্রয়োজনে সেটী বিলম্বিত হত। এই জাতীয় ধ্রুবাকে দ্রুতবিলম্বিত বলা হ'ত।

অড্ডিতা—শৃঙ্গার রসাত্মক পরিবেশে এই শ্রেণীর ধ্রুবার প্রয়োগ করা হ'ত। এটী দিব্যা, রাজকীয় এবং গণিকা সকল প্রকার নারীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হ'ত।

খঞ্জক এবং নৎকুট—এই দু'প্রকার শৃঙ্গাররসাত্মক ধ্রুবা গাওয়া হ'ত। তবে এগুলি বিশেষত হাস্যরসাত্মক পরিবেশে এবং নীচ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'ত।

যে সব ক্ষেত্রে ধ্রুবা-র ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলির উল্লেখ ভরত করেছেন। গান গাইতে গাইতে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, সম্ভ্রমাত্মক পরিস্থিতিতে, ঘোষণার সময়, গোলযোগের সময় এবং বিস্ময়কর পরিস্থিতে ধ্রুবার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

ধ্রুবা গীতির প্রয়োগ কোথায় কিভাবে হ'বে তার বিচার করতেন সংগীতাচার্য। ধ্রুবা প্রয়োগ করা হ'ত অর্থবিধি, দেশ, কাল, ঋতু, প্রকৃতি, ভাবলিঙ্গ—এই সবের বিচার করে।

এই ধ্রুবাগীতির ভাষা ছিল শূরসেনী ("ভাষা তু শূরসেনী স্যাৎ ধ্রুবাণাং সম্প্রয়োজয়েৎ।"—নাট্যশাস্ত্র, ৩২ অধ্যায়)। সংস্কৃত গান দিব্যব্যাপারে নির্ধারিত ছিল। আর মানুষের ব্যাপারে নির্ধারিত ছিল অর্ধসংস্কৃত (অর্থাৎ দেশীয় ভাষা—মিশ্রিত সংস্কৃত)। অধম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আচরিত হতো মাগধী ভাষা।

ধ্রুবাগীতি যেমন পরিস্থিতি এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থার পরিচয় দিত, তেমনি এই গীতগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ নাট্য সময়েরও সঙ্কেত দেওয়া হত গতি অর্থে প্রাবেশিকী এবং নৈষ্ক্রামিকী—এই দু'প্রকার ধ্রুবাই প্রযোজ্য ছিল। প্রাবেশিকী পূর্বাহ্ণ এবং নৈষ্ক্রামিকী দিন ও রাত্রি উভয় প্রকার কালই নির্দেশ করতো। অবশ্য পূর্বাহ্ণ নির্দেশের ব্যাপারে শান্ত বিষয় এবং মধ্যাহ্ণ নির্দেশের ব্যাপারে উদ্দীপনাযুক্ত বিষয় প্রয়োগ করার নিয়ম ছিল। অপরাহ্ণ নির্দেশের জন্য গাওয়া হ'ত করুণরসাশ্রিত ধ্রুবা। চলনার্থে অর্থাৎ অক্ষক্রীড়া বা জলক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে আক্ষেপিকী গাইবার রীতি ছিল।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ৬৪টি রকমের ধ্রুবাগানের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি জাতি, স্থান, প্রমাণ, প্রকার ও নামভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

সংগীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ নাটকে পঞ্চসন্ধির কথা উল্লেখ করেছেন—যেমন, মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহার। ভরতও অসারিত গীতি

প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ করেছেন এবং এই পাঁচটি সন্ধিতে প্রযুক্ত নাট্যগীতির পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মতঙ্গ রচিত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে এই পাঁচটীর মধ্যে কোন সন্ধিতে কি রাগে গান করা হ'ত তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পূর্বরঙ্গে যে রাগে গান করা হ'ত তারও নাম পাওয়া যায়। এই রীতিও আদি নাট্যগ্রন্থ "ব্রহ্মভরতম্" —এর অনুসরণেই লিখিত।

'মুখ' অর্থ, নাটকের প্রস্তাবনা—এতে মধ্যম-গ্রামরাগ গান করা হ'ত। গর্ভে সাধারিত গ্রামরাগ, বিমর্শে পঞ্চমগ্রামরাগ এবং উপসংহার (নির্গ্রহণ)-এ কৈশিক গ্রামরাগ গান করার রীতি ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতানী আমল এবং ধ্রুপদের সৃষ্টি

সম্পূর্ণ একটা নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির পরিবর্তন সুরু হয়। এই সভ্যতা—মুসলমান সভ্যতা, প্রাক্ ইসলাম যুগ থেকে আরব ও ভারতের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল। দেশ বিজয়ের বাসনা জাগবার অনেক আগেই ইসলামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েও ফিরে যান। তার কারণ ইসলামের উদ্ভবের ফলে আরব জগতে যে নূতন সভ্যতার সূচনা হয় তার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখা দেয়। প্রায় তিনশো বছর ধ'রে ভারতের সংস্কৃতি মুসলমানদের নিকট উপেক্ষিত ছিল। এর পর একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পরে ভারতের সঙ্গে মুসলিম জগতের আবার নূতন ক'রে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইন-এর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ক'রে মহম্মদ ঘুরী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের পত্তন হয়। প্রথমে ঘুর, তার পর দাস রাজবংশ, খিলজী, তুঘলক, লোদী প্রভৃতি রাজবংশ এবং সর্বশেষে মুঘলরাজবংশ ভারতবর্ষ শাসন করেন।

এই মুসলমান যুগে ভারতীয় সংগীতের নানা পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন সূচিত হয় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল (১২৯৬—১৩১৬ খৃষ্টাব্দ) থেকে। হিন্দু যুগেই প্রাচীন ভারতীয় সংগীত অত্যাধিক বন্ধনের মধ্য থেকে তার প্রবহমানতা হারাতে সুরু করেছিল। সুলতানী আমলের প্রথম দিকে জনক রাগ গ্রামরাগ নামে পরিচিত ছিল। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন ভাষা, বিভাষা, রাগ। এইগুলি আবার রাগ, উপরাগ ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল। শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সংগীত রত্নাকর'-এ ২৬৪ রকম রাগের কথা বলেছেন। এগুলি সবই মার্গ সংগীতাশ্রয়ী ছিল। সারা ভারতবর্ষে যে গীতি-গান (lyric song) প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে প্রবন্ধ গান। এর পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে চিত্রবীণা এবং বিপঞ্চী বীণা খুব জনপ্রিয় ছিল না। তবে স্বরমণ্ডল রীতিমত জনপ্রিয় ছিল। কিন্নরী এবং আলাপিনী—এই দুই শ্রেণীর বীণার মধ্যে কিন্নরী সুলতান আমলে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিল। বাঁশী এবং আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রগুলির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি।

আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল

সুলতানী আমল সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। রাজ্য লাভ এবং সিংহাসন অধিকারের জন্য মারামারি কাটাকাটি লেগেই ছিল। মরক্কোবাসী পর্যটক ইবন বতুতা যে আলাউদ্দীন খিলজীকে শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন তাঁর রাজত্বকাল বিশ্বাসঘাতকতা, নরনারী হত্যা, অত্যাচার, জুলুম ও জবরদস্তির বিভীষিকার দ্বারা কলঙ্কিত। তথাপি এই আমলের একটি উজ্জ্বল দিক হচ্ছে এই যে মুঘল-আমলে শিল্প ও সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটে তার ভিত্তিই রচিত হয়েছিল এই সুলতানী আমলে। এই আমলে সংগীতের যে বিকাশ ঘটে তার বিবরণ আমরা পাই জীয়াউদ্দীন বর্ণি রচিত 'তারিখ-ই-ফীরুজশাহী' গ্রন্থে। জীয়াউদ্দীন ১৩৫৯ সালে তাঁর গ্রন্থ সমাপন করেন। তিনি সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আমীর খসরুর বন্ধু। তিনি কায়কোবাদ-এর রাজত্বকাল (১২৮৬-১২৮৮ খৃষ্টাব্দ), জালালউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল (১২৮৮-১২৯৫ খৃষ্টাব্দ) এবং আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্ব কালের সংগীত সম্পর্কে বিবরণ তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বই থেকে জানা যায়, কিভাবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাদ্যযন্ত্রগুলি ভারতবর্ষে পরিচিতি লাভ করে এবং এই সব যন্ত্রের ভারতীয়-করণ করা হয়। তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে কায়কোবাদের রাজত্বকালে গজ্‌ল্ গানের সঙ্গে রবাব যন্ত্রের সঙ্গত চলতো। এই কায়কোবাদের রাজত্বকালেই যে কাওয়াল গান প্রচলিত ছিল তাও আমরা বর্ণির লেখা থেকে জানতে পারি।

আমীর খসরু

মধ্যযুগে সংগীতের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল। তাঁর দরবারের অন্যতম সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু। এই আমীর খসরু-র নাম ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। তাঁকে ভারতীয় সংগীতের অন্যতম ধারা খেয়ালের স্রষ্টা পর্যন্ত বলা হয়েছে। খসরু ভারতে আগমণকারী একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। চেঙ্গিজ খাঁ-র মধ্য এশিয়া আক্রমণের সময় অনেকে বাস্তুহারা হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। এঁদের মধ্যে লাচিন তুর্কী নামে একটি গোষ্ঠী মধ্য-এশিয়া থেকে সুলতান সামসুদ্দীন ইলতুৎমিস-এর সময় (১২১১-১২৩৬ খৃষ্টাব্দ) ভারতবর্ষে আসে। খসরু-র পিতা সৈফুদ্দীন লাচিন তুর্কীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সৈফুদ্দীন ইলতুৎমিস-এর

দিল্লীর দরবারে আশ্রয়লাভ করেন। এই ইলতুৎমিস শিল্প, সংগীত, ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমীর খসরু ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বল্‌বনের যুদ্ধ-মন্ত্রী ইম্‌তুল মুল্‌ক্‌-এর কন্যা। সাত বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তাঁর লেখাপড়ায় অসুবিধা হয়নি। তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন পাঠ করেন। তবে, কাব্যের দিকে তাঁর বেশী ঝোঁক দেখা যায়। বিশ বছর বয়সেই তাঁর বৃত্তি স্থির হয়ে যায়। তিনি একই সঙ্গে অস্ত্র এবং লেখনী ধারণ করেন। এই সময় রাজধানী দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিত, রাজনীতিক, জ্যোতিষী, গায়ক এবং ঘাতক— সবাই এসে জমা হ'ত। খসরু সভাসদ হলেন। কিন্তু রাজনীতিক না হলে সভাসদ হওয়া যেত না। সুতরাং সেদিকেও তাঁকে মন দিতে হ'ল। তবে তাঁর কাব্য রচনা চলতে থাকলো। তিনি দৈনিক সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় রচনার মতই কবিতা রচনা করতে পারতেন।

আমীর[১] খসরুর প্রথম পৃষ্ঠপোষক আলাউদ্দীন মহম্মদ কুশীল খাঁ (ইনি 'মালিক ছজ্জু নামে পরিচিত)। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে খসরু মালিক ছজ্জুর নিকট কাজ গ্রহণ করেন। ছজ্জু ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বল্‌বনের ভ্রাতুষ্পুত্র। জীয়াউদ্দীন বর্ণির তারিখ-ই-ফীরুজশাহী থেকে জানা যায় যে, ছজ্জু উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন; শিকারে, বন্দুক ছোঁড়ায় এবং বল খেলায় (মধ্যযুগীয় পোলো) তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি কবি ও গায়কদের সম্মান করতেন। তিনি যখন কারার (এলাহাবাদ) গভর্ণর তখন তিনি কবি খাজা শামস মইন-এর কণ্ঠে সুমধুর প্রশংসাসূচক গান (কাসিদা) শুনে তাঁকে আস্তাবলের সমস্ত ঘোড়া দান করেন। গায়কদের তিনি দান করেন দশ হাজার তঙ্কা।

খসরু মালিক ছজ্জুর স্তুতিবাচক গান রচনা করেন। তবে ছজ্জুর কাছে তিনি মাত্র দু'বছর ছিলেন। এর পরে তিনি বল্‌বনের দ্বিতীয় পুত্র নাসিরুদ্দীন বাঘরা খাঁ-র আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঘরা খাঁ খসরুর গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এক পাত্র রৌপ্যমুদ্রা দান করেন। বাঘরা সামানা-র গভর্ণর ছিলেন। খসরুর এস্থানও ভাল লাগলো না। তিনি দিল্লী চলে এলেন। দিল্লীতে তিনি সুলতান বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদের সভায় আশ্রয় নিলেন। সুলতান

১। মধ্যযুগে খাঁ, মালিক, আমীর—এগুলি ছিল সরকারী উপাধি। পদমর্যাদা অনুসারে এই সব উপাধি দেওয়া হ'ত। একশো জন সৈনিকের অধিনায়ককে 'আমীর', এক হাজার সৈনিকের অধিনায়ককে 'মালিক', এবং দশ হাজার সৈনিকের অধিনায়ককে 'খাঁ' বলা হ'ত।

মহম্মদ ছিলেন আদর্শ যুবরাজ। তিনি ছিলেন সাহসী, বিনয়ী। তিনি কবিতা ও গান ভালবাসতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর ত্রিশ হাজার যুগল-চরণ সমন্বিত একখানি পারস্য কবিতার সংকলন গ্রন্থ আছে। সুলতান মহম্মদের কাছে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। সভায় তাঁকে উচ্চপদ দান করা হয়েছিল। মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিহত ক'রতে গিয়ে সুলতান মহম্মদ প্রাণ হারান। আমীর খসরু শুধু সভাসদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সামরিক অফিসার। তিনি মঙ্গোল-দের হাতে বন্দী হন। কিন্তু কোনক্রমে দিল্লীতে পালিয়ে আসেন। খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় তাঁর পলায়নের কাহিনী বর্নি তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ করেন।

কিছুদিন পাতিয়ালায় অবস্থানের পর খসরু বল্‌বনের পৌত্র মইজুদ্দীন কায়কোবাদ-এর দরবারে ছিলেন। কায়কোবাদ একজন অপদার্থ নরপতি; রাজ্য শাসন করতেন তাঁর মন্ত্রী নিজামুদ্দীন। খসরু এখানে থাকতে পারলেন না। তিনি এলেন আমীর আলী সরজন্দার বা হাতীম খাঁ-র কাছে। হাতীম অযোধ্যার গভর্ণর ছিলেন। দুবছর পর খসরু আবার দিল্লীতে কায়কোবাদের কাছে ফিরে এলেন। কায়কোবাদের পরে সুলতান জালালউদ্দীন খিলজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খসরুর গুণগ্রাহী ছিলেন; বছরে তাঁকে বারো হাজার তঙ্কা বেতন দান করতেন। জালালউদ্দীনই তাঁকে 'আমীর' উপাধি দান করেন। জালালউদ্দীনের বয়স তখন সত্তর। তিনি সংস্কৃতিবানদের পছন্দ করতেন। তিনি নিজেও গান রচনা করতেন। তিনি তাঁর সভায় সে যুগের নামকরা সংগীতজ্ঞ, গায়ক এবং নর্তকীদের স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর প্রমোদ সভা ছিল স্বপ্নের মত; সাকীরা পানপাত্র হাতে মদ্য পরিবেশন ক'রত; যন্ত্রীরা তাঁদের বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত করতেন অপূর্ব সংগীত, নর্তকীরা গাইতেন খসরুর গজল—সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

১২৯৬ খৃষ্টাব্দের ১ই জুলাই জালালউদ্দীন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা আলাউদ্দীন খিলজী এলাহাবাদের গঙ্গাতীরে তাঁকে হত্যা ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য বহু হত্যাকাণ্ড ঘটান। কিন্তু এই নির্দয় শাসকও তাঁর রাজ সভায় খসরু-কে স্থান দান করেন! যদিও ইতিপূর্বেই খসরু যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তথাপি আলাউদ্দীন-এর রাজত্ব-কালেই তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। একদিকে সম্রাট আত্মনিয়োগ করলেন শাসন সংস্কারে, অন্যদিকে খসরু আত্মনিয়োগ করলেন কাব্য এবং সংগীত রচনায়। যে গতিতে তিনি সৃজন করছিলেন তা অতি বিস্ময়কর। মাত্র

তিন বছরে (১২৯৮-১৩০০ খৃষ্টাব্দে) তিনি শেষ করলেন পাঁচটি রোমাণ্টিক মসনবী[১] ; মতাউল্ আনোয়ার, শিরীণ খুস্রৌ, মজনুন লায়লা, অইনা-ই সিকান্দার এবং হাসত্ বিহিস্ত্—এই সবগুলি মস্নবী শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া-কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

মরমী সাধক সেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার প্রভাব খস্রুর ওপরে যথেষ্ট ছিল। বারো বছর বয়সে নিজামউদ্দীন অযোধ্যার সেখ ফরিদগঞ্জ শাকার-এর স্তুতিবাচক একটি গান শোনেন। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খস্রু আট বছর বয়সে নিজামউদ্দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব দৃঢ় হয় জালালউদ্দীনের সময়। খস্রু মস্নবী ছাড়া আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক মস্নবী-র মধ্যে রয়েছে কিরানুস্ সা'দাইন, মিফতাহুল ফুতু, দাওয়ালরাণী, খিজির খাঁ, নুহ্ সিপাহ্র এবং তুঘলকনামা।

খস্রুর গজল্-এর সংকলন গ্রন্থ চারখানি : তুহ্ফাতুস, সিগহার, ওয়াসতুল লায়লা এবং হসত বিহিশত। তাঁর সংগীতজ্ঞের কান ছিল। তাঁর গীতিপ্রবণ হৃদয়ে যা তিনি অনুভব করতেন, সেই অনুভূতিকে তিনি সুন্দরভাবে রূপ দিতে পারতেন। আমীর খসরু-র জনৈক জীবনীকার মহম্মদ হাবীব বলেছেন, "He is the favourite poet of the mystic singers (quawwals) who have loved to set his lives to music and advanced mystics have often fainted and yielded up the ghost of their recitation In him for the first (though not for the last) time, Persion poetry reaches its high water mark—the sustained ghazal."[২]

খস্রুর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে খাজাইনুল ফুতু (আলাউদ্দীনের যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বলিত ইতিহাস) এবং ই জাজ-ই খুসরবী (পাঁচখণ্ডের অলঙ্কার গ্রন্থ)। এছাড়াও খসরু কবিতায় আরবী পারসী অভিধান (বদি'উল আজাইব), হিন্দী-পারসী অভিধান (খালিক বারী), পারসী এবং

১। মস্নবী সরল এবং সুষমামণ্ডিত রচনা। এই গীতিধর্মী কাব্যের আবেদন অপূর্ব। রোমাণ্টিক মস্নবী শাহনামা কাব্যের স্বাভাবিক পরিণতি। খসরু-র রোমাণ্টিক মস্নবীগুলিকে একত্রে 'পঞ্চগঞ্জ' (five treasure house) বলা হয়। এগুলি নিজামীর খামশার অনুকরণে রচিত।

২। Mahammad Habib, 'Hazrat Amir Khusrau of Delhi,' Bombay (1927), P. 92.

হিন্দী প্রেম-কবিতা (মসনবী শহর অশুব) পারসী এবং হিন্দী ধাঁধার সঙ্কলন প্রভৃতির রচয়িতা। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। এঁর রাজসভায়ও খসরু ছিলেন। এঁর পরবর্তী সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তুঘলক-এর সময়ও (১৩২১-১৩২৫ খৃষ্টাব্দ) খসরু রাজসভা অলঙ্কৃত করেন।

আমীর খসরু একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, গীতরচয়িতা, সংগীত শিল্পী, দার্শনিক, মরমী সাধক (সূফী মতবাদী) এবং যোদ্ধা। তিনি বৃজ ভাষাকে সাহিত্যের শুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি উর্দু ভাষা প্রচলনে সাহায্য করেন। আমীর খসরুর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে জিয়াউদ্দীন বর্নি তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'-তে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "The incomparable Amir Khusrau stands unequalled for the volume or his writings and originality of his ideals ; for while other great masters of prose and verse have excelled in one or two branches, Amir Khusrau was conspicuous in every department of letters. A man with such mastery over all forms of poetry has never existed in the past and may perhaps not come into existence before the Day of Judment. And in addition to his wit, talent and learning, he was an advanced mystic"

মৌলানা শিবলী নোমানী তাঁর 'শিরুল আজম' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৭-১৯৫) আমীর খসরু সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন, "No person of such comprenensive abilily has been born in India during the last six hundred years, and even the fertile soil of Persia has produced only three or four persons of such varied accomplishments in a thousand years."

পারস্যের ফিরদৌসী, সাদী, আনোয়ারী, হাফিজ, উর্ফী, নাজিরী কাব্য ক্ষেত্রে নৃপতি স্বরূপ। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা এক একটী ক্ষেত্রেই আবদ্ধ। ফিরদৌসী মসনবীর ঊর্ধে উঠতে পারেননি। সাদী 'কাসিদা' রচনা করতে পারেননি। আনোয়ারী-র 'গজল' অথবা 'মসনবী' রচনার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে হাফিজ, উর্ফী এবং নাজিরী শুধু 'গজল'ই রচনা করেছেন। কিন্তু খসরু-র বহুমুখী প্রতিভা

'গজল', 'মসনবী', 'কাসিদা' 'রুবাইৎ' এবং আরও নানা ধরণের কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। রচনার পরিমাণের দিক থেকেও খসরু-র কাছাকাছি এঁরা কেউ পৌঁছতে পারবেন না।

খসরু-র মাতৃভাষা পারসী, তুর্কী; তিনি আরবী জানতেন। হিন্দী এবং সংস্কৃতেও তাঁর দখল ছিল (তার 'নুহ্ সিপাহর' গ্রন্থে তিনি নিজেও তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন)।

আমীর খসরু সম্পর্কে যাঁরাই মন্তব্য করেছেন তাঁরাই তাঁর সাংগীতিক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলমান আমলের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতীয় রাগ সংগীতে মিশ্রণের দ্বারা সৌন্দর্য সম্পাদন। আমীর খসরুকে এ ব্যাপারে পুরোধা বলা চলে। মূল ভারতীয় রাগকে পারস্য সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তিনি রাগের পারসী নামকরণের প্রথাও প্রচলিত করেন। ফকীরুল্লা-র 'রাগদর্পণ' থেকে জানা যায় পারসীয় সুর-মিশ্রণে আমীর খসরু বারটি রাগের সৃষ্টি করেন। এগুলির এই ভাবে মিশ্রণ ও নামকরণ করা হয়েছে—বীরারীতে মালশ্রী, দুগাহ এবং লুসায়নী একত্র ক'রা হয়েছে 'মুয়াফ্ফেগ্' বা 'দেওয়ালী'। টোড়ীতে পঞ্চগাহ এবং মুহাইয়ীর গোশা একত্র ক'রে 'মহীর', পূরবীকে ঘনম, ফার্সী শাহনাজকে খট্ রাগের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে 'জীলফ'; গৌরা-কে 'ফরঘানা'; ফরঘানা-র সঙ্গে পারসীয় মোকাম মিশ্রিত ক'রে সারঙ্গ-র সঙ্গে যুক্ত করে 'উশ্শাক'; গোন্দ-এ বিলাবল, গৌড়সারঙ্গ এবং পারসীয় মোকাম থেকে রাস্ত সংযুক্ত করে সর্পরদা; কানাড়া-র সঙ্গে কয়েকটি রাগ মিলিয়ে 'ফিরোদস্ত'; ইমন-এর সঙ্গে নীরীজ যুক্ত করে 'ইমনী'; দেশকার-এর সঙ্গে পারসীয় মোকামের অন্তর্গত বাখরজ মিশিয়ে 'বাখরজ'; পূরবী, বিভাস, গৌরী গুণ্কেলী-র সঙ্গে পারসীয় মোকামের ইরাক মিশ্রিত ক'রে 'সাজগিরী'— এইরূপ ভাবে নামকরণ করা হয়েছে।

ইমন এবং বসন্ত—এই দুটী রাগকে একত্রিত করে আমীর খসরু ইমন-বসন্ত রাগ রচনা করেন। 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেও বলেছেন যে খসরুই ইমনপুরিয়া, ইমন ভূপালী, ইমন বিলাওল, ইমন বিহাগ, ইমন কল্যাণ, ঝিঝোটী, যমনী প্রভৃতি নূতন রাগের সৃষ্টি করেন ('হিন্দুস্থানী সংগীত', ৩য় ভাগ, ৩৮৯ পৃঃ)। আমীর খসরু যে পথ প্রদর্শন করলেন সেই মিশ্রণের পথ গ্রহণ ক'রে অনেকেই ভারতীয় সংগীতকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তুরস্ক-তোড়ী ও তুরস্ক-গৌড় এইরূপ হিন্দু-মুসলমান রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর রাগ। এ ছাড়া বাহার, আলাইয়া, সরপরদা,

সাজগিরী, সাহানা, অড়ানা, সোহনী, সুহ, সুখরাই, রুলীক, মারু প্রভৃতি সুরও এইভাবেই উৎপন্ন। পীলু, বারওয়া, লুম প্রভৃতির উৎপত্তিও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনারই ফল।

যন্ত্রসংগীতে আমীর খসরুর অবদান উল্লেখযোগ্য। H. A. Popley বলেছেন—"The Sitar, a modification of Vina, was probably first introduced by him."[১] শুধু সেতার নয়, তবলার আকৃতি এবং বাদন পদ্ধতিরও তিনি কিছু পরিবর্তন করেছিলেন ব'লে জানা যায়।

ভারতীয় মূর্ছনার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন আমীর খসরু। সাতটী স্বরের মূর্ছনার মধ্যে তিনি শুদ্ধ এবং বিকৃত রূপের একসঙ্গে প্রয়োগ ক'রে স্বরের সংখ্যা বর্ধিত করেছেন। এর ফলে বারটী স্বরযুক্ত সপ্তক সৃষ্টি হয় এবং ঠাটেরও উদ্ভব হয়।

খসরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিশ্রণ। তাঁর সমস্ত রাগেই মিশ্র-স্বর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। আমীর খসরু এবং তাঁর শিষ্যরা যে গান গাইতেন তাকে বলা হয়েছে "কাওয়ালী"। Popley বলেছেন,—"The Quali mode of singing—a judicious mixture of Persian and Indian models was introduced by him"[২] আইন-ই-আকবরীতেও আছে, "The songs of Delhi are called Kaul and Tarana. These wore introduced by Amir Khasrau of Delhi in concert with Samit and Tatafr and by combining the several styles of Persia and India from a delightful variety."[৩]

আমীর খসরু কে কেউ কেউ 'খেয়াল' গানের উদ্ভাবক বলেছেন। কিন্তু খেয়াল তো দূরের কথা, আমীর খসরু যে যুগে বর্তমান ছিলেন সে যুগে ধ্রুপদও তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে সৃষ্টি হয়নি।

গোপাল নায়ক

আমীর খসরুর সঙ্গে যে নামটী জড়িয়ে আছে তিনি হচ্ছেন গোপাল নায়ক। এই গোপাল নায়কের উল্লেখ করেছেন সংগীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ, চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকার লেখক বেঙ্কটমখী এবং রাগদর্পণের লেখক ফকিরুল্লা। ক্যাপ্টেন উইলার্ড এবং পপ্‌লে কেমন করে আমীর খসরু আলাউদ্দীন খিলজীর

১। H A. Popley, 'The Music of India, Calcutta (1950), p 16
২। H. A. Popley, 'The Music of India', Calcutta (1950), p. 16
৩। Ain-i-Akbari—N. Jarret, ed. J. N. Sarkar

সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে থেকে গোপালের গান হুবহু নকল করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন—এই কাহিনী বিবৃত করেছেন। অবশ্য ফকিরুল্লাই এই কাহিনীর স্রষ্টা। এদিকে বৈজু বাওরা এবং গোপাল নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সূচক গানও কয়েকটা পাওয়া গিয়েছে।

এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক কয়েকটা গান উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

(ক) বিদ্যা তেরী. রে নায়ক গোপাল।
গুণী অব মুনী তে হু জপত নাদ বেদ
ব্রহ্মা উচার করত, নায়ক বৈজু
পিঘলায়ে পাথর উমগায়ে তাল॥

(খ) তেরে মন মে কেতো গুণ রে,
জেতো হোয় তেতো প্রকাশ কর রে।…
পাহন পিঘলায়ে, হিরণ বুলায়ে
জ্যো বরসেমেহা সরস্বতী বর রে।
কহৈ বৈজু বাওরে সুনো হো গোপাল লাল।

(গ) খরজ কহাঁসে রিখাভ কহাঁসে
কহাঁসে উপজ্যো স্বর গন্ধার।
কহে গোপাললাল শুনিয়ে বৈজুবাওরে
নাদ অথাহ, জাকী গতি অগম অপার॥

(ঘ) ধারু গাওত নায়ক গোপাল
ছত্রপতি সংগ্রাম ঝঝরোরে।

এই গানগুলি থেকে অন্ততঃ এইটে বুঝতে পারা যায় যে, বৈজু, গোপাল এবং আমীর খসরু সমসাময়িক। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'চণ্ডীদাস' নামটী[১] যেমন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সংগীত জগতে তেমনি সমস্যার সৃষ্টি করেছে 'গোপাল' ও 'বৈজু' এই দুটী নাম। আমরা 'বৈজু' নামের উল্লেখ পাচ্ছি চার রকম ভাবে: বৈজু, বৈজুনাথ, নায়ক বৈজু, বৈজু বাওরা। তেমনি গোপাল নামটীও পাচ্ছি চার রকমে: গোপাল, নায়ক গেপোল, গোপাল নায়ক, গোপাল লাল।

'নায়ক' বংশানুক্রমিক উপাধি এবং এই উপাধি আজও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু

১। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বাশুলীসেবক চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাস—পদাবলীতে এই সব নামই যুক্ত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কয়জন চণ্ডীদাস—এই সমস্যা দাঁড়িয়েছে।

প্রাচীন যুগে কবি, সংগীত রচয়িতা, এঁদের নাম এঁদের কবিতায় এবং গানের শেষে জুড়ে দিলেও উপাধি সহ নাম ব্যবহারের নজির নেই বললেই চলে। ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, প্রথম বাংলাভাষার লেখক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ, লুইপাদ প্রভৃতি তারপর জয়দেব এমন কি বিদ্যাপতি এবং ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীদাস পর্যন্ত কেউ উপাধি ব্যবহার করেননি। তাই গোপাল-এর ক্ষেত্রে নায়ক শব্দটী বংশানুক্রমিক উপাধি বলে মনে করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ বড়ু চণ্ডীদাস এবং 'পদাবলীর' চণ্ডীদাস এই দুই চণ্ডীদাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই জনের রচনার ভাষা ও ভঙ্গির রীতিমত পার্থক্য সূচিত হয়েছে; গোপাল-এর সংগীতের ক্ষেত্রে এইরূপ কিছু পার্থক্য নেই। তা ছাড়া গোপাল-এর সঙ্গে যদি 'লাল' কথাটী যুক্ত হয়ে থাকে সে নিতান্তই কাব্যের ছন্দের প্রয়োজনে। হিন্দী ভাষায় 'নায়ক' শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বা সঙ্গীতে বুৎপত্তি লাভ করেছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝায় (an eminent person, a person well versed in music —Bhargaba's Dictionary)। তাই শুধু গোপাল নন, তাঁর পরবর্তী বহু বিখ্যাত সংগীতজ্ঞকেই 'নায়ক' বলা হয়েছে। সুতরাং নায়ক গোপাল বা গোপাল নায়ক বলতে একজনকেই বুঝা উচিত।

এই গোপাল শুধু সংগীতজ্ঞ নন, তিনি ছিলেন রীতিমত পণ্ডিত ব্যক্তি। সংগীত রত্নাকর-এর টীকাকার কল্লিনাথ তাঁর পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করেছেন এবং সমসাময়িক যে কোনও সংগীতজ্ঞের তুলনায় তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। বেঙ্কটমখী প্রশংসা করেছেন গোপালের শ্রুতিবিচক্ষণতার।

গোপাল দাক্ষিণাত্যের লোক। ১৩০৭ (১৩১০ ?) খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর যখন দেবগিরি আক্রমণ করেন, তখন দেবগিরির রাজা ছিলেন রামচন্দ্র দেব। গোপাল এই রামচন্দ্রের সভাতেই ছিলেন। দেবগিরি বাহিনী কাফুরের কাছে পরাজিত হলে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে গোপালও দিল্লীতে আসেন।

বেঙ্কটমখী তাঁর 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায়' প্রবন্ধ প্রকরণে 'গীত' ও 'প্রবন্ধ' এই দুই-এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, গোপাল গীত এবং প্রবন্ধ-এর পার্থক্য সহজভাবে বোঝাতে পারতেন। ক্যাপ্টেন উইলার্ড লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের দরবারে গোপাল নায়ক এসে তাঁর "গীত" ব'লে এক ধরণের রচনা গেয়েছিলেন। এ রচনা ছিল নাকি তখন নূতন সৃষ্টি। এই গান প্রাচীন প্রবন্ধ গান নয়, সালগ-সূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবগীতি।

ফকিরুল্লা তাঁর 'রাগদর্পণে' বলেছেন যে, আলাউদ্দীনের দরবারে এসে গোপাল গেয়েছিলেন তিনটী গীত : স্বরবর্তনী, মন্ ও হরগীত। এই তিনটীর মধ্যে 'স্বরবর্তনী' মার্গসংগীত। আত্মপ্রশংসা সমন্বিত 'মন্' দেশী পর্যায়ের গীত। আর 'হরগীতি' পরিবর্তিত ধ্রুবগীতি। টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন যে; বত্রিশটী রাগতালযুক্ত 'ভ্রমণ' নামীয় এক প্রকারের 'রাগকদম্বক (মার্গ সংগীত) গোপাল নায়ক গাইতেন।

নায়ক বৈজু

গোপাল নায়কের মত 'বৈজু' নামটীও নানাভাবে উল্লিখিত হয়ে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। চার রকম বৈজু নামের মধ্যে যে কারণে গোপালকে নায়ক বলা হয়েছে সেই একই কারণে বৈজুকেও নায়ক বলা স্বাভাবিক—কারণ সংগীত জগতে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ হিন্দী ভাষায় বাৱর বা বাৱরা (বাওরা) শব্দের অর্থ পাগল। বৈজু ছিলেন যোগী ভক্ত এবং সংগীত সাধক। যদিও তাঁর একটী আশ্রম ছিল তথাপি তিনি ছিলেন একজন ভবঘুরে। অধিকাংশ সময়েই তিনি ঘুরে বেড়াতেন। সত্যিই তাঁকে সংগীত পাগল বলা যায়। তাই যদি লোকে তাঁকে বৈজু বাওরা বলে অভিহিত ক'রে থাকে তবে তার মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নেই। তৃতীয়তঃ যে কারণে গোপালের সঙ্গে 'লাল' যুক্ত হয়েছে সেই কারণেই অর্থাৎ ছন্দের প্রয়োজনে 'নাথ' যুক্ত হয়ে থাকবে। সুতরাং বৈজু একজনই ছিলেন। তিনি গোপাল নায়কের শিষ্য ছিলেন অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলা কঠিন তবে তাঁরা যে সমসাময়িক উভয়ের রচিত সংগীতই সে পরিচয় বহন করছে। যেমন—

গুপ্ত সপ্ত প্রগট ছত্তীস ভাঁড়ী আয়ো গোপাল
বৈজুকে গায়েতেঁ সপ্ত সুর ভুল গয়ে ॥ (বৈজুর গান)
অথবা—
কহে গোপাললাল সুনিয়ে বৈজু বাওরে
নাদ অথাহ, জাকী গতি অগম অপার॥ (গোপালের গান)

বৈজুকে আলাউদ্দিন তাঁর দরবারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে দরবারে বাস করতেও অনুরোধ করেছিলেন। বৈজু সম্রাটের দরবারে মাঝে মাঝে আসতেন বটে কিন্তু স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি।

এই বৈজু কোন্ সংগীতে পারদর্শী ছিলেন? বৈজুকে বলা হয়েছে ধ্রুপদের

সৃষ্টিকর্তা। তিনিই যে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—এই চার তুক বিভাগ করেছিলেন, একথাও বলা হয়ে থাকে। এই মতামত সম্পূর্ণভাবে অনুমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈজুও গোপালের মত তৎকালে প্রচলিত সালগসূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবাগীতিই গাইতেন। তবে তাঁর গানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। রাজা মানসিংহের সময়ে প্রচলিত ধ্রুপদ গানের বিষয়বস্তু থেকে বৈজুর গানের বিষয়বস্তুর কিছু পার্থক্য আছে। তাঁর ওপরে বিষ্ণুর প্রভাব কম; শিব, রাম, শক্তি—এঁদের সম্বন্ধেই তিনি বেশী গান রচনা করেছেন। একটী গানের নমুনা দেওয়া হ'ল—

জাকে বৈজয়ন্তীমালা তাকে সোহে মৃগছালা
জাকে মুরলী অধর ডমরু তাকে কররে।
জাকে জটাজুট গঙ্গ ত্রিশূল তাকে সংখ-চক্র-গদা-পদম্
জাকে রুণ্ড-মুণ্ড মালা তাকে পীতাম্বর পটরে।

এঁর ভাষা শুদ্ধ বৃজভাষা। বৈজুর গানের ছন্দ একটু শিথিল হলেও বাঁধুনি দেবার প্রয়াস আছে। তাঁর গানের কাব্যিক ছন্দ তালকে অনুসরণ ক'রে চ'লে।

বৈজুর পূর্ববর্তী যুগের হিন্দুস্থানী সংগীত সংস্কৃত শুদ্ধ প্রবন্ধের অনুসরণে রচিত হতো। এই সব গান বেশ দীর্ঘ ছিল। বৈজুর গান অত দীর্ঘ নয়—কারণ পাঁচ বা চার তুকে গড়া। এই তুক্ অবশ্য বর্তমানের ধ্রুপদের তুক্ বিভাগের মত নয়। এই তুকবিভাগ হচ্ছে ধ্রুবা প্রবন্ধের তুক্ বিভাগ অর্থাৎ উদ্গ্রাহ (দুইখণ্ডে বিভক্ত) অন্তর এবং আভোগ (দুই খণ্ড)। অবশ্য শার্ঙ্গদেবের ধ্রুবাগীতির উদ্গ্রাহের দুই খণ্ডকে এক ধাতু বলেছেন। সেই অর্থে বলা যায় বৈজুর গানে চার ধাতু। বৈজুর ধ্রুবাপ্রবন্ধ চৌতাল, তেওড়া, ব্রহ্মতাল, বিষ্ণুতাল প্রভৃতি তাল নিবদ্ধ। তিনি যে রাগগুলিতে গান গাইতেন তা হচ্ছে মালকোষ, ভীমপলশ্রী, ভৈরব, টোড়ী প্রভৃতি।

ধ্রুপদের সৃষ্টিকাল

কোন্ সময়ে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—ধ্রুপদের এই বিভাগ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমরা যাকে ধ্রুপদ সংগীত বলি, তার সৃষ্টি কখন হয়?

Captain Willard, Sir William Jones, Dr. Griffith, Sir Ousley, প্রমুখ পাশ্চাত পণ্ডিতগণ এবং তাঁদের অনুসরণকারী কোন কোন ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রী বলেছেন যে, গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৬—১৫১৬ খৃঃ)

ধ্রুপদের প্রবর্তন করেন।[১] কেউ বলেছেন রাজা মানের সভাপতিত্বে ধ্রুপদ জাতীয় গানের ধাতু বিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[২] আবার কারও অভিমত এই —"ধ্রুপদ রাজা মানসিংহ তোমর-এর সংগীতচিন্তার প্রধান ফল। * * * ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠায় নায়ক বক্সু যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। বক্সু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক আমলের প্রধান নায়ক। আসলে ধ্রুপদ একটা নূতন সৃষ্টি নয়। বহু পূর্ব থেকে সালগ পর্যায়ের প্রবন্ধ সংগীত ধ্রুব ভারতে প্রচলিত ছিল। ক্রমে এর বহু রূপভেদ হতে থাকে। রাজা মান এই বিভিন্ন ধ্রুব গানকেই একটা সহজ এবং সুসম্বদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন।"[৩]

এ সম্পর্কে আর একটা মন্তব্য এইরূপ—"আবুল ফজলের মতে রাজা মানসিংহ সংগীত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন এবং বক্সু, ভন্নু প্রভৃতির সহায়তায় তিনি গোয়ালিয়রে প্রচলিত দেশী গীত ধ্রুবপদাকে অভিজাত পর্যায়ে উন্নীত করে এক নূতন সৃষ্টির পথ দেখান। ফকীরুল্লাও বলেছেন যে, মানসিংহ পণ্ডিত ছিলেন বলেই ধ্রুপদের মত এমন একটা গীতরীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[৪] উপরোক্ত আধুনিক যুগের লেখকদেব মন্তব্য যে সমস্ত প্রাচীন লেখকদের মতামতকে ভিত্তি ক'রে রচিত হয়েছে তাঁদের একজন হচ্ছেন Captain' N. Augustus Willard, তিনি ধ্রুপদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন[৫] "Most renowned of the Näyuks have been Gopāl, a native of the Dekhun i e. Deccan, who flourished during the reign of Sooltān Ulāood-deen and his contemporary Ummer Khosrow of Delhi; Sooltān Hoosan Shruque of Jaunpoor, Rājā Mān * * * of Gwālior, founder of the Dhoorpud." H A. Popley লিখেছেন—"Raja Mān Singh of Gwalior, one of the greatest of Akbar's ministers, was also a great patron of music and is said to have introduced the Dhrupad style of singing".[৬] এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, Popley ভুল

১। 'সংগীত পারিজাত', (পৃঃ ১২৪),—ভাষ্যকার শচীন্দ্রনাথ মিত্র
২। অমিয়নাথ সান্যাল, 'প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা', পৃঃ ৩০
৩। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'মুঘলযুগের সংগীত চিন্তা, কলিকাতা (১৯৬৪), পৃঃ ৪
৪। ডঃ বিমল রায়, 'ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ"—কলিকাতা (১৩৭১), পৃঃ ৪৯
৫। Willard, 'A Treatise on the Music of Hindoosthan',—P. 107
৬। H. A. Popley, "The Music of India"—Calcutta (1950) p. 17

ক'রে অম্বরাধিপতি মানসিংহ আর গোয়ালিয়রের অধিপতি মানসিংহকে এক ক'রে ফেলেছেন। অম্বরাধিপতি মানসিংহ আকবরের সেনাপতি ছিলেন। গোয়ালিয়রের অধিপতি রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৬ ১৫১৬)-এর সময় আকবর জন্মগ্রহণই করেননি।

যাই হোক দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিংহের রাজত্বকালকেই ধ্রুপদ সৃষ্টির সময় বলতে চাইছেন। কিন্তু এর বিপরীত মতেরও অভাব নেই: "১৩শ শতাব্দীতেই সংসারবিবাগী বৈজু বাওরা ও গোপাল নায়ক এই উভয়ের মধ্যে কাহারও কৃতিত্বে ধ্রুপদ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বৈজু বাওরা ও গোপাল নায়ক রচিত বহু ধ্রুপদ গীত, যাহা অদ্যাপিও সুপ্রচলিত, তাহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[১] আর একটী আধুনিক অভিমত—"বৈজু আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ের (১২৯৬—১৩১৬ খৃঃ ব্যক্তি এবং গোপাল নায়ক এঁর শিষ্য ছিলেন। বৈজু বাওরা ধ্রুপদ সৃষ্টি করেছিলেন, আর স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নামে তুক্ বিভাগও ইনিই করেছিলেন।"[২] এই মন্তব্য যাঁর তিনিই, আবার বলেছেন—"ধ্রুপদকে ধ্রুব ইত্যাদি সালগসূঢ় থেকে গড়ে উঠতে পঞ্চদশ শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল।"[৩]

ধ্রুপদ দেশী সংগীতের পরিমার্জিত রূপ বা প্রবন্ধ গীতিই লোকসংগীতের দ্বার প্রভাবিত হয়ে ধ্রুপদে রূপান্তরিত হয়েছে—এই অভিমত যাঁরা পোষণ করে তাঁদের মধ্যে ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "লোকসংগীতে প্রভাবের সংগে ধ্রুপদ প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোক সংগীতে তানের অভাব, ধ্রুপদেও তান নেই; লোক সংগীত অর্থমূলক, অর্থ আবার সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক; রূপ তার কবিতার, রস তার অনুভূতির। (কথা ও সুর, পৃঃ ৩১)

ধ্রুপদকে যাঁরা দেশী সংগীত বলতে চান আইন-ই-আকবরী রচয়িতা আবু ফজলকেই তাঁরা অনুসরণ করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে ধ্রুপদকে এক প্রকা দেশী (আঞ্চলিক) গান বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই গান আগ্রা, গোয়ালিয়র বারি এবং এই সব স্থানের সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আবুল ফজল এ গ্রন্থে আরও বলেছেন—"When Mān singh (Tānwār) ruled as Rājā o

১। সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত' কলিকাতা (১৯৬৩), পৃঃ ৫৮

২। ডঃ বিমল রায়, 'ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ', কলিকাতা (১৩৭১), পৃঃ ৫৫

৩। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৭

Gwālior, with the asistance of Nāyak Bokshu, Macchu and Bhānu who were the most diistingnished musicians of their day, he introduced a popular style of melody which was approved even by the most refined taste. On his death, Bakshu and Macchu passed into the service of Sultan Mahumud of Gujrāt, where his new style came into universal favour"

আবুল ফজল আরও বলেছেন—"দাক্ষিণাত্যে এই গানগুলিকে ঐ অঞ্চলের ভাষায় ছিন্দ (ছন্দ = ছন্দ প্রবন্ধ) বলতো। তিন বা চার লাইনের এই গানগুলি প্রশংসা সূচক গান। তেলেগু এবং কর্ণাটিক ভাষায় এগুলিকে ধ্রুব বলা হতো এবং এগু'লর বিষয়বস্তু ছিল প্রেমমূলক। বাংলা দেশে যেগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে 'বাঙ্গালা,' জৌনপুরে যেগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বলা হতো চুটকলা' এবং দিল্লীতে যেগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বলা হ'ত 'কৌল' এবং 'তারাণা'। এই শেষোক্ত গান দিল্লীর আমীর খসরু শমিত এবং তাতার-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পারসিক ভারতীয় পদ্ধতির মিশ্রণে রচনা করতেন। এই গানগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। মথুরায় যে গান প্রচলিত ছিল তার নাম 'বিষ্ণুপদ'। এই গান ছয় বা আট লাইনের এবং এই গান বিষ্ণুর স্তবগান। সিন্ধু প্রদেশে প্রচলিত গানকে বলা হতো 'লাচারী'। এইগুলি বিদ্যাপত-এর রচনা এবং গানগুলি প্রেমমূলক। লাহোর এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত গানকে বলা হতো ছান্দ এবং গুজরাটে প্রচলিত গানকে বলা হতো জাক্রি।"

আবুল ফজলের উক্তিকে প্রামাণ্য মনে করার কারণ নেই। তিনি শোনা কথার ওপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকবেন। তা ছাড়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঠিকই বলেছেন —"it is also true that he was neither a musician nor an accomplished musicologist. Moreover, it is a fact that during the time of Raja Man of Gwalior (15th Cntury A.D), the **dhruvapada** type of **prabandha** took a new shape and novel course, but it is equally certain that it was not invented but only revived and rejuvenated by Raja Man, who assisted by Hindu and Muslim musicians of outstanding merit, established a Gwalior school of music."[১]

১। Swāmi Prajanānananda, 'A historical study of Indian Music', Calcutta (1965), p. 164-65

স্বামীজীর মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ডাঃ যদুনাথ সরকারের বিবরণীতে। তিনি বলেছেন—"After Raja man the renowned **dhrupadiya Bakshu** continued his service at the court of Vikramjit, the son of Man Singh and after his death, entered the service of Rājā Kirāt of Kalinjar, whence he was invited to the court of Gujurat.

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি মান সিংহের সময় ধ্রুপদের প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, মানসিংহের সময়ই প্রথম ধ্রুপদের নাম শুনতে পাওয়া যায়। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত All India Radio Symposium-এ বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীঠাকুর জয়দেব সিংহ 'প্রবন্ধ এবং ধ্রুবপদ' সম্পর্কে যে আলোচনা করেন[১] তাতে বলা হয়—"The first historical reference that we get about *dhruvapada* is its association with Rājā Mān Singh Tomar of Gwālior. He ascended the throne in 1486 A D He did not invent *dhruvapada.* He only gave it an impetus. It must have taken about hundred years for the development of this style of musical composition before such a connoisseur of music, as Rājā Mān Singh could extend to it his patronage and take such a great interest in its development We may therefore safely say that the *dhruvapada* style of composition started some time about the middle of 14th century."

এই ধ্রুপদ হঠাৎ একদিন কেউ আবিষ্কার ক'রে বসেননি। ধ্রুপদ প্রবন্ধ সংগীতের ক্রমবিকাশের একটা পরিণতি।

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত A historical study of Indian Music গ্রন্থে এই আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে। পৃঃ ১৯৭-২০।

চতুর্থ অধ্যায়

গোয়ালিয়র ও বৃন্দাবনের অবদান

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে গোয়ালিয়র এবং বৃন্দাবনধাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। গোয়ালিয়রের সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষক তোমর রাজবংশ এবং বৃন্দাবনের সংগীত-সাধক গোস্বামীগণ এই দুই স্থানের একই সংগীত প্রবাহ দুটী পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল।

গোয়ালিয়রের তোমর বংশীয় নৃপতিরা প্রায় এক শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের অনেক নৃপতিই শুধু বাহুবলেই শক্তিশালী ছিলেন না, কলারসিকও ছিলেন। সেই জন্য তাঁরা সাহিত্য ও সংগীতকলার পৃষ্ঠপোষণ ক'রে গেছেন।

এই তোমর বংশের রাজা মান সিংহ।[১] স্বভাবতই ইনি আকবরের সেনাপতি অম্বরাধিপতি মান সিংহ নন। রাজা মান সিংহ তোমরের শাসনকাল ১৪৮৬ থেকে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই সময়ের মধ্যে ধ্রুপদ সংগীতের ব্যাপক প্রচলন হয়।

এক দিকে গোয়ালিয়রে ধ্রুবপদের প্রচলন, অন্যদিকে মথুরা-বৃন্দাবনে প্রচলিত 'বিষ্ণুপদ'। এই বিষ্ণুপদের সঙ্গে রাজা মানের ধ্রুপদের পার্থক্য ছিল। এই দুটি সংগীতধারার সঙ্গে মুসলমানদের 'কৌল' (বিচিত্র বিষয়বস্তু এবং সুরের চাঞ্চল্য-এর বৈশিষ্ট্য) এবং প্রবন্ধগানের কিছু লৌকিক রূপ (যেমন চুটকলা) প্রচলিত ছিল।

গোয়ালিয়রের অবদান

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়র যে সংগীত সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল তা আবুল ফজল প্রদত্ত বিবরণ থেকেও জানতে পারা যায়। তিনি আইন-ই-আকবরীতে আকবরের সভাগায়কদের যে বিবরণ দান করেছেন তাতে ৩৬ জনের নাম পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে তাঁদের মধ্যে ১২ জনই এসেছিলেন গোয়ালিয়র থেকে।

১। Herbert A. Popley তাঁর 'The Music of India' বইতে ভুল ক'রে লিখেছেন "Raja Man Sing of Gwalior, one of the greatest of Akbar's ministers, was also a great patron of Music." (P. 17.), যা মোটেই সমীচীন নয়।

আকবরের সিংহাসন লাভের বহু পূর্ব থেকেই গোয়ালিয়র সংগীত সাধনার অন্যতম কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়। আবুল ফজলই বলেছেন যে, 'হিন্দু-মুসলমান সাধনার যুগে সংগীতের চারটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে ভারতের বাইরে ছিল মাশাদ আর তব্রীজ; ভারতের মধ্যে ছিল কাশ্মীর ও গোয়ালিয়র।' কাশ্মীরের রাজা জয়নুল আবেদিন এবং গোয়ালিয়রের রাজা তোমর বংশীয় মানসিংহ ছিলেন গুণীদের আশ্রয়।

পাঠান সাম্রাজ্যের শেষ দিকে ভারতবর্ষে শুরু হয় নানা রকম অশান্তি, অত্যাচার, উপদ্রব। এক সাম্রাজ্যের পতন এবং আর এক সাম্রাজ্যের উত্থানের যুগে এরকম হয়। অশান্তির ফলে এদেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি বাধা পেল। তবে দিল্লী অথবা অন্যান্য রাজদরবারে আশ্রয় নিয়ে সংগীতজ্ঞরা তাঁদের সংগীত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উৎসাহে ঘাটতি পড়ল। ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে আদিলশাহের রাজত্বকালে তাঁর দরবারে শতাধিক ওস্তাদ প্রতিপালিত হতেন। এই সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের পার্শী তরজমাও হয়েছিল। এই সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ (১৪৮৬—১৫১৬) বিশেষ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন।

রাজা মানসিংহ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এর পরের বছরেই জৌনপুরের সুলতান হোসেন শার্কীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বহলোল লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে হয়। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হ'ন এবং প্রচুর অর্থ করদান ক'রে রেহাই পান। কিন্তু পরে আবার সিকন্দার লোদীর সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয় এবং এই যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৫১৬ খৃঃ)।

প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে মাত্র কয়েক বছর শান্তিতে কাটালেও রাজা মান সংগীতের উন্নতির জন্য যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। কর্ণেল কানিংহামের "Archiological Report of Gowalior" নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে, মানসিংহ মালব-গুর্জরী, মঙ্গল-গুর্জরী এবং বহুল-গুর্জরী এই তিনটী রাগ সৃষ্টি করেন। রাজা মানের রাজসভায় যে সংগীত চর্চা হ'ত তারই ফলস্বরূপ আমরা পাই বিখ্যাত "মানকুতূহল" গ্রন্থ। সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন রাজা মান স্বয়ং।

শার্ঙ্গদেব ব্যতীত তানজোরের রাজা রঘুনাথ নায়ক (সপ্তদশ সতাব্দী) ধ্রুবপ্রবন্ধের সংজ্ঞা দান করেছিলেন। সেই সঙ্গে অপর ষোলটি ধ্রুব শ্রেণীর

সালগসূড় প্রবন্ধেরও লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তাঁর 'সংগীতসুধা' গ্রন্থে।[১] পরবর্তীকালে প্রাচীনকালের তুলনায় ধ্রুবপদের গায়কীভঙ্গীর পরিবর্তন হয় এবং এটা ঘটে সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহের সময়ে। বলা হয়ে থাকে যে রাজা মানসিংহ তৎকালীন সমাজের রুচি এবং মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্রুবপদ প্রবন্ধের প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তন করেন; এর ফলে ধ্রুবপদ প্রবন্ধের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

রাজা মানসিংহের পূর্বে বৈজুবাওরা, গোপাল নায়ক এবং অন্যান্য সংগীতজ্ঞেরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন—নূতন রীতির ধ্রুপদ স্বভাবতই তা থেকে পৃথক। ধ্রুপদ গায়ক না হওয়া সত্ত্বেও আমীর খসরু পর্যন্ত ঐ প্রাচীন রীতির সংগীতের সমজদার ছিলেন।

১। সালগসূড লক্ষণম্

সূড প্রবন্ধো বিবিধোঽত্র শুদ্ধশ্ছায়ালগশ্চেত্যবধারণোযম্।
অষ্টাবিহৈলপ্রমুখাঃ প্রবন্ধাঃ প্রোক্তাঃ প্রবীণৈঃ কিল শুদ্ধসূডাঃ॥

* * *

ছাযালগশ্যঃ কিল শব্দ এষ ব্যুৎপাদিতঽসৌ বিশদং মুনীন্দ্রৈঃ।
ধ্রুবং সমারম্ভ কিলৈকতালী যাবদ্ধ্রুবেৎ সালগসূডসজ্ঞঃ॥

ধ্রুবলক্ষণম্

গেযো হি তুল্যস্বরগুম্ভযুক্তো খণ্ডাবিহোদ্গ্রাহপদাভিধেয়ো।
স্যাদন্তরাখ্যঃ কিল খণ্ড একঃ স্যাদীষদুচ্চস্বরগুম্ভযুক্তঃ॥
খণ্ডত্রয়ং হি খলু গেয়মেবং খণ্ডদ্বয়েনাথসমন্বিতস্তুঃ।
আভোগখণ্ড পুনরত্র কার্যস্তত্রাদ্যখণ্ডঃ পুনরেকধাতুঃ॥
দ্বিতীয়খণ্ডঃ পুনরত্র খণ্ডদ্বযাত্মকস্তত্র কিলাদ্যখণ্ড।
স্যাদীষদুচ্চস্বরগুম্ভযুক্তস্ত্বেতাদৃগাভোগপদাভিধেয়ঃ॥
স্যান্নেতৃনামাঙ্কিত এব কার্যো মতান্তরেষ্বেষ বিশেষ উক্তঃ।
উচ্চৈকখণ্ডাত্মক এব যোঽয়মাভোগনামাবয়বঃ কিলেতি॥
উদ্গ্রাহকস্যাদিমখণ্ড এব স্যাসো ভবেদস্য সমস্তমেতৎ।
ধ্রুবস্য সামান্যমিদং হি লক্ষ্ম বক্ষ্যামহে ষোড়শ তদ্বিশেষান্॥

—'সঙ্গীতসুধা' পৃঃ ৩৪০—৩৪১

মানকুতুহল গ্রন্থ

রাজা মানসিংহের 'মানকুতূহল' গ্রন্থের সব ক'টি খণ্ড পাওয়া যায় না। তবে ফকীরুল্লাহ্ [1]এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং সেই সঙ্গে সংগীতের কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ফকীরুল্লাহ্ ধ্রুপদের বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন এবং ভারতের কোন কোন জায়গায় এই গীত প্রচলিত ছিল তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের দশটি অধ্যায়ের মধ্যে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের তথ্যাবলী প্রধানত শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত রত্নাকর' থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা মানসিংহকে ধ্রুপদ রচয়িতা বলেছেন (প্রথম অধ্যায়ে)। 'মানকুতুহল' গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, নায়ক বকস্থু, ভান্থু, পান্দুয়ী প্রভৃতি গায়কেরা যখন রাজা মানসিংহের সভায় সমবেত হ'ন তখন তিনি সাধারণ লোকের হিতার্থে সে যুগে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা স্থির করেন। এরই পরিণতি 'মানকুতূহল' গ্রন্থ।

'মানকুতুহল' গ্রন্থের ফকীরুল্লাহ্ কৃত অনুবাদের দ্বিতীয়-অধ্যায়ে সে যুগের রাগ রাগিণী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। ছ'টি শুদ্ধরাগ বা আসল রাগের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—ভৈঁরো, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘ। রাগের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দেখানো হয়েছে—

শুধ, সংকীর, (সংকীর্ণ), সালঙ্ক, সম্পূরণ, খাড়ো (খাড়ব) এবং ওড়ো (ঔড়ুব)।

শুধ্—উপরিউক্ত রাগ ছ'টি।

সংকীর্—যে সব রাগ, রাগিণী ও পুত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

সালঙ্ক—এগুলি ছাড়া যেগুলি অতীতে ও বর্তমানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুন্দর এবং অতুলনীয়ভাবে রচনা করেছেন। তাঁরা কয়েকটি রাগ একত্র ক'রে একটি উত্তম রাগিণী সৃষ্টি করেন এবং এর নাম দিয়েছেন সালঙ্ক।

সম্পূরণ—সাতটি স্বরের সমাবেশে যে রাগ রচিত হয় তাঁকে সম্পূরণ রাগ বলে।

খাড়ো—ছটি স্বরের সমাবেশে যে রাগ উৎপন্ন হয় তাকে খাড়ো বলে।

১। ফকীরুল্লাহ্ সম্রাট সাহজাহানের সময় থেকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেও বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল বিচিত্র। তিনি একাধারে যোদ্ধা এবং শিল্পী। তিনি কাশ্মীরের সুবেদার হন, মুলতান এবং এলাহাবাদেরও সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থটি সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে উৎসর্গ করেন। ফকীরুল্লাহ ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বইটা অনুবাদ করেন—এর সঙ্গে কিছু মন্তব্যও জুড়ে দেন। তাঁর বইটির নাম 'রাগদর্পণ'।

ওড়ো—পাঁচটি স্বরে গঠিত রাগকে ওড়ো বলে।

প্রত্যেক রাগের পাঁচটি স্ত্রী (রাগিণী) এবং ছ'টি পুত্র আছে কিন্তু শ্রী রাগের ছ'টি রাগিণী এবং ন'টি পুত্র। এর সমস্ত বর্ণনা দেওয়ার পর মিশ্র রাগের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ফকীরুল্লাহ্-র গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে বিবিধ নিবদ্ধ গীতরূপের বিবরণ আছে। এগুলির বিবরণ তিনি এইভাবে দান করেছেন—

গীত—তিন প্রকার। এর বিষয়বস্তু হ'ল দেবতা ও বাদশাহদের প্রশংসা।

সূর্যপ্রকাশ এবং চন্দ্রপ্রকাশ—এই দু'প্রকার গীতের রূপ একই, পার্থক্য হ'ল, একটি সূর্যের স্তব অপরটি চন্দ্রের। সূর্যপ্রকাশ বারোটি কলায় অর্থাৎ খণ্ডে বিভক্ত এবং চন্দ্রপ্রকাশের ষোলটি কলা বর্তমান। তাল এবং রাগ আবর্তিত হয় খণ্ড অনুসারে।

সর্বতোভদ্র-তে তাল আবর্তিত হয় চারটি ক্রম অনুযায়ী। কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ রাগকদম। এর কোন কোন স্থানে রাগ ও তাল ব্যবহৃত হয়। বিষয়বস্তু হিসাবে নায়িকার সজ্জা বা যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমান কালে এটিকে মার্গপদ্ধতির অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। দেবতাগণ এর রচয়িতা। এখন এই রীতি লুপ্ত হয়ে গেছে।

দেবতাগণের স্তুতিবাচক গীত ঝোমরা চারটি কলিতে নিবদ্ধ।

স্বরবর্তনী—অর্থহীন শব্দদ্বারা নিবদ্ধ।

দেবতাদের প্রশংসাসূচক গীত প্রবন্ধ দু'টি কলিতে নিবদ্ধ। এই গীতে ধ্রুপদের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু এ থেকেই যে ধ্রুপদ এসেছে একথা ঠিক নয়।

দেশী পর্যায়ের গীত 'মন্'-এ আত্মপ্রশংসা ও অন্য বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ধ্রুপদ—গোয়ালিয়রের রাজা মান এই গীতকে গঠন করেন। এই গীত চারটি কলিতে নিবদ্ধ। এই গীত গঠনে সহায়তা করেছিলেন সম্মেলনে আগত নায়ক বক্সু, নায়ক ভানু, মাহ্মুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ। অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকলেই এই ধরণের রচনা করেছিলেন। এই অঞ্চলে এই গীতকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এক শ্রেণীর ধ্রুপদের রাগ ও গীত মার্গপদ্ধতি অবলম্বনে রচিত। অপর শ্রেণীর ধ্রুপদে রাগের প্রাধান্য কম থাকলেও রচনা সংগঠনের কৌলিন্য ঠিক আছে। এই ধরণের সংগীত দেশীয় ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্রুপদের গায়নবৈশিষ্ট্য নির্ভর করে গায়কের ওপর। সুতরাং এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছিল তা মার্গ ও দেশী উভয়ের

মিশ্রণের ফলশ্রুতি। দেশী ভাষায় সৃষ্ট ধ্রুপদ সময়ানুসারে বা স্থানানুসারে খারোয়া [১] ভাষায় গাওয়া হয়। মার্গীয় রীতির ধ্রুপদের ভাষা সংস্কৃত। দেশী প্রথায় সৃষ্ট ধ্রুপদ গোয়ালিয়র থেকে আকবরাবাদ্‌ [২] এবং বারী অঞ্চলে প্রচলিত। এর বিস্তৃতি উত্তরে মথুরা পর্যন্ত—পূর্বে এটাওয়া, দক্ষিণে উনছ্‌ এবং পশ্চিমে ভুসাও ও বয়ানা পর্যন্ত এই গীত বিস্তৃত। এই সব অঞ্চলে হিন্দুস্থানের ভাষাগুলি শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হয়।

ফকীরুল্লাহর বিবরণের মধ্যস্থিত একটী উক্তি সম্পর্কে একমত হওয়া কঠিন। তিনি ধ্রুপদ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রাজা মান 'এই গীত গঠন করেন।' রাজা মানসিংহের পূর্বেই অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে ধ্রুপদ গঠিত হয়েছিল। রাজা মানসিংহ সেকালের রুচি ও মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্রুপদের শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মানকুতূহল গ্রন্থের একটী মন্তব্য থেকে।

'মানকুতূহল' গ্রন্থে শুধু সংগীতের বিবরণ নয়, শ্রেষ্ঠ বাণীকারের কি বিশেষত্ব তাও নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—"শ্রেষ্ঠ গায়কের ব্যকরণ, অলংকার, রস, ভাব, দেশাচার, লোকাচার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার; শব্দ-জ্ঞানে তাঁকে হতে হবে প্রবীণ। তাঁর প্রবৃত্তি কলানুবর্তিনী হ'বে এবং সময়ের সঙ্গে তিনি সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম হ'বেন। তাঁর গান হ'বে বিচিত্র। প্রাচীন রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ থাকবে; তিনি গীত, নৃত্য ও বাদ্যে পারদর্শী হবেন এবং প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর উত্তম জ্ঞান থাকতে হ'বে।"

'সেকালের রুচি ও মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজা মান যে ধ্রুপদের প্রচলন করেন তাতে গোয়ালিয়রের ভাষা ব্যবহৃত হয়। তিনি গানের বিষয়বস্তু হিসাবে কল্পনাত্মক, বর্ণনাময় এবং প্রণয়মূলক ভাবকে গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর প্রচলিত একটী গানের উদাহরণ—

সা জানিয়ারে উও দিন সাল ছে।
বদন মিলায়ে মিলাবাছে বিজুনী
ইউ বিরহা জিয়া চাল ছে॥...ইত্যাদি

এটী 'পরজ' রাগ এবং ঢিমা ত্রিতাল-এ গেয়।

১। খারোয়া বলতে খড়ী-বোলী অর্থাৎ সৎ উর্দু' বোঝান হয়। এ থেকে জানা যায় যে সৎ উর্দু ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হয়।

২। আগ্রা।

মানসিংহের সভা-গায়কগণ

রাজা মানসিংহ তাঁর দরবারে কয়েকজন সংগীত নায়ককে স্থান দিয়েছিলেন। আবুল ফজলের বিবরণ অনুসারে রাজা মান সিংহের সভায় গায়ক ছিলেন তিনজন —বকসু, মচ্ছু এবং ভন্নু বা ভানু। ফকীরুল্লাহর 'রাগদর্পণে' মানসিংহের সভাগায়ক হিসাবে নাম করা হয়েছে ছ'জনের: বকসু, ভানু, পাণ্ডোয়, মামদ, কিরণ, লোহঙ্গ। আবার মীর্জা খাঁ তাঁর রচিত 'তুহফাতুল হিন্দ' বইতে রাজা মানসিংহের সভাগায়ক হিসাবে চার জনের নাম করেছেন: ভানু, পাণ্ডোয় বা পান্দুয়ী, বকসু এবং লোহঙ্গ। এ ছাড়া রাজা মানসিংহের সভাগায়ক হিসাবে ধুন্দি, চম্পূ এবং চঞ্চলশশীর নামও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটী একটী কথা জানা যায় এবং তা হচ্ছে এই যে, এঁদের মধ্যে প্রধান গায়ক ছিলেন নায়ক বকসু। তিনি শুধু গায়ক নন, গীতকার এবং নূতন রীতির উদ্ভাবক।

নায়ক বকসু

রাজা মানসিংহের সভাগায়কদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়ক বকসু। বকসুর জন্ম, শিক্ষা এবং মৃত্যু—কোনও বিষয়েই বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি যে মানসিংহের সভাগায়ক ছিলেন একথা আবুল ফজল এবং ফকীরুল্লাহ ও মীর্জা খাঁ তিন জনেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আর দু'টী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তার একটী হচ্ছে এই যে, মানসিংহের পুত্র বিক্রমসিংহ রাজ্য হারালে তিনি গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শা'র দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। এই দরবারে সদাগুণী রামদাসও ছিলেন। আবুল ফজল প্রমুখ লেখকদের মতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শা'র দরবারে স্থান পাওয়ার আগে বকসু কালীগঞ্জ রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এইখানে তিনি বাহাদুরী টোড়ী নামে একটী রাগের উদ্ভাবন করেন। রাজা মানসিংহ গুর্জরী টোড়ীর উদ্ভাবক বলে কেউ কেউ যে কথা প্রচার করছেন এই বাহাদুরী টোড়ীর সম্ভবতঃ গুর্জরী টোড়ী এবং তার উদ্ভাবক বকসু। যে বিবরণ উল্লেখ ক'রে মানসিংহকে গুর্জরী টোড়ীর উদ্ভাবক বলা হয় তা হচ্ছে এই যে, মানসিংহ গুজরাটের রাজকন্যা মৃগনয়নীকে বিবাহ করেন এবং এই জন্যই ঐরূপ নামকরণ করেন। কিন্তু মানসিংহের সময় গুজরাটে কোনও হিন্দুরাজা ছিলেন না। তাই মৃগনয়নীর পক্ষে গুজরাটের রাজকন্যা হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্বে রাজদরবারে প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত সুরেরই স্থান ছিল। এদিকে প্রাচীন শাস্ত্রের কুলীন সুরগুলির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক সুর এক কালে শঙ্কর রাগ বা মিশ্র সুরে উৎপন্ন দেশী সুর ছিল। ক্রমে ঐ সুরগুলি কৌলিন্য অর্জন করতে থাকলো। বকসুর কৃতিত্ব এই যে, তিনি শৌরসেন, অর্থাৎ আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলেব প্রাকৃত জনগণের সুরকে উন্নত ক'রে দরবারে নিয়ে এলেন। এ ব্যাপারে বাধা এসেছিল প্রচুর। মানসিংহ তোমরের দরবারে বকসু এবং মধুসূদন যখন নবনীতির সংগীত ধ্রুপদকে প্রতিষ্ঠা দান করলেন তখন প্রাচীনপন্থীদের ক্রোধের সীমা রইল না। ক্রোধেব কারণ আরও এই যে, এটা ছিল ঢাড়ী মেয়েদের গান। পথে পথে এই গান গেয়ে নারীরা জীবিকা অর্জন ক'রতো। এরা ধ্রুপদের সুরে বীরগাথাও গাইতো।

এই ঢাড়ী বংশেই বকসুব জন্ম। বকসুর পূর্বপুরুষেরা সংগীত ব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাড়ীরা আদিম অধিবাসী এবং অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের মত ঢাড়ীরাও হিন্দুসমাজের অনাদর পেয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

'রাগদর্পণ'-এর বিবরণ অনুসারে বকসু টোড়ীতে দেশকাব যুক্ত ক'রে বাহাদুরী টোড়ী[১] রাগেরই উদ্ভাবন করেননি; তিনি একটি কান্‌হারা (কানাড়া) এবং একটি কল্যাণ উদ্ভাবন করেন এবং এই দু'টী রাগ নায়কী-কল্যাণ এবং নায়কী-কান্‌হারা নামে খ্যাত।

রাজা মানের সভায় থাকাকালীন বকসু যে সমস্ত ধ্রুপদ রচনা করেন সেগুলি দুই বা তিন তুক এবং গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের দরবারে (১৫২৬—৩৬) তিনি চার তুকের ধ্রুপদ সৃষ্টি করেন। নায়ক বকসু সম্পর্কে আর একটি তথ্য প্রচলিত আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, বাদশা হুমায়ুন মাণ্ডুনগর জয় ক'রে যে ব্যাপক প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে বকসুও ছিলেন। কিন্তু সংগীতজ্ঞ ব'লে তিনি শুধু রক্ষাই পেলেন না সম্রাটের আদরও লাভ করলেন।

লাহরি তাঁর 'বাদশা নামা' গ্রন্থে বলেছেন যে ছন্দ, চাঁচী, স্তোত্র প্রভৃতি আগের যুগের সংগীতজ্ঞদের জানা ছিল, তাঁর সময়ে এই সব গান দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতের লোকেরা দক্ষিণ ভারতের সংগীত রীতির ভালোভাবে তারিফ ক'রত না। লাহরি নায়ক বকসু-র সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাঁকে উচ্চকোটীর ধ্রুপদ গায়ক ব'লে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথা থেকেই জানতে পারি যে বকসু পাখোয়াজের সঙ্গে গান

১। গুজরাট-শাসক বাহাদুর খাঁ-এর নাম অনুসারে

গাইতেন ; মূল গান-এর আগে সুন্দরভাবে আলাপ করতেন। বকসু গান গাইতে গাইতে যে গ্রামে উঠতেন সে গ্রামে সহগায়কদের কণ্ঠ উঠতো না। হিন্দুস্থানী ভাষায় এই ধরণের উচ্চ গানকে টিপ বলে।

নায়ক বকসু-কে রাজা মানসিংহের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র ছেড়ে কালীঞ্জর দুর্গে রাজা কিরাৎ-এর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কিছুদিন পরে তিনি গুজরাটে যান এবং সুলতান বাহাদুর-এর (১৫২৬-১৫৩৭) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই সুলতান বাহাদুর-এর নাম অনুসারেই তিনি বাহাদুরী-টোড়ী রাগ রচনা করেন।

নায়ক ভানু বা ভন্নু

আবুলফজল, ফকীরুল্লাহ এবং মীর্জা খাঁ তিনজনেই আর যাঁদের নাম করেছেন তাঁদের অন্যতম নায়ক ভন্নু বা ভানু। এঁর পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে সংগীতে যে তিনি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রমাণ পরবর্তীকালের গুণসেন। এই গুণসেনকে ভানুর পৌত্র বলা হয়েছে। তাঁর মৃত্যু কাশ্মীরে ঘটায় অনেকে মনে করেন যে মানসিংহের মৃত্যুর পর ভানু কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন এবং গুণসেনের আফজল খেতাব থেকে ধারণা করা হয় যে ভানুর বংশ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

নায়ক মচ্ছু বা মজরু

মচ্ছু-র পরিচয় কিছুই প্রায় না মিললেও এই নামটী নিয়ে অনেক গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই নামটীকে কেউ মজরু বা মঝরু এইভাবে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন এগুলোর কোনটাই ঠিক নয়—শুদ্ধ নাম মামুদ। আবার কেউ কেউ আরও অগ্রসর হয়ে মচ্ছু>মজরু>বৈজু বাওরায় গিয়ে পৌঁছেছেন। মচ্ছু যদি মামুদ হ'ল তবে ফকীরুল্লা কথিত মামুদ-এর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁকে বৈজু বলা নিতান্তই কষ্টকল্পনা।

পাণ্ডোয় বা পান্দুয়ী

পাণ্ডোয় বিজয় নগরের লোক। ফকীরুল্লা এবং মীর্জা খাঁ দু'জনেই এর নাম করেছেন, আবুলফজল এর নাম উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ বলেছেন ইনিই রাজা মানসিংহকে মানকুতুহল রচনায় সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ফকীরুল্লার বিবরণই সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন যে, রাজা মানের সভায় ভানু,

বকস্থ, পাণ্ডেয়, মামুদ, লোহঙ্গ, কিরণ প্রভৃতি সংগীত নায়কেরা যখন মিলিত হ'লেন তখন রাজা মানসিংহ সাধারণের হিতার্থে রাগসম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। এই ভাবেই সকলের সহায়তায় মানকুতূহল গ্রন্থ রচিত হ'ল।

মথুরা-বৃন্দাবনের অবদান

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে শুধু দিল্লী এবং গোয়ালিয়র নয়, আরও কয়েকটী রাজ্যে ধ্রুপদের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শা শর্কীর সময় (১৪৫৮—১৫০০ খৃঃ) জৌনপুরে ধ্রুপদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রেওয়া এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলেও ধ্রুপদের প্রচলন ছিল। এখানে মনে রাখা দরকার যে এই রেওয়ার অন্তর্গত বন্ধোগড়-এর রাজা রামচাঁদের সভাগায়ক ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী মিয়াঁ তানসেন এবং সেখান থেকেই তিনি আকবরের রাজসভায় যান।

এই প্রসঙ্গে সংগীত অনুশীলনের অন্যতম কেন্দ্রটীর কথা উল্লেখ করা দরকার এবং তা হচ্ছে মথুরা-বৃন্দাবন। বৃন্দাবন প্রবন্ধগীতি অনুশীলনের এক বিখ্যাত কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দার লোদীর রাজত্বের শেষ বৎসর চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল দেখতে গিয়েছিলেন। এর পর যে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে[১] তাঁদের তালিকা এইরূপ—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব। এঁদের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভূগর্ভ, যাদবাচার্য, নারায়ণ দাস, জগদানন্দ প্রভৃতি।

এঁরা ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম ভারতের যাঁরা বৃন্দাবনে দেবমূর্তি স্থাপন এবং গ্রন্থ প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বল্লভ ভট্ট, তাঁর দুই পুত্র বিট্ঠলনাথ ও গোপীনাথ, হিত হরিবংশ, হরিদাস স্বামী, হরিরাম ব্যাসজী, থানেশ্বরী জগন্নাথ, অন্ধ সুরদাস, সুরদাস মদনমোহন। এঁরা সকলেই ভক্তসাধক, গায়ক ও কবি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, স্বামী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর নরোত্তম দাস—এই সমস্ত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি প্রবন্ধ ধরণের গীতি খুব ভালভাবে গাইতে পারতেন।

১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ-এ এই ছয় গোস্বামীর বন্দনা আছে।

বৃন্দাবনে যে সমস্ত বৈষ্ণব মহাজনেরা ছিলেন তাঁরা গোয়ালিয়র এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের ধ্রুপদের চর্চা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বৃন্দাবন এবং পরবর্তীকালে মথুরায় ধ্রুপদ সংগীতের এক বিশিষ্ট ধারা সৃষ্টি করেছিলেন কৃষ্ণদাস, হরিদাস এবং অন্যান্য কলাবিদেরা।[১]

সাংস্কৃতিক পটভূমিকা

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষ—ধর্মের ব্যাপারে তখন একটা ওলট-পালট অবস্থা বিরাজমান। শুষ্ক কর্ম ও জ্ঞানবাদ জনসাধারণের ওপর আর প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না—ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা তখন সমাজ ও ধর্ম-জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। জাতীয় জীবনের এই বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা সে যুগে হয়েছিল দু'টি পথ ধরে। এক পথ বিশুদ্ধ পরমব্রহ্মবাদ—যাতে জাতিধর্ম ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নেই, যা মানুষের মনকে উন্নততর জ্ঞানমার্গে পৌঁছে দেয়। আর এক পথ, মানুষের যে বৃত্তিগুলি নিম্নগামী হয়ে সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধের সৃষ্টি করেছিল সেগুলিকে রূপান্তরিত করে বিশ্বেশ্বরের প্রেমের লীলানন্দে ডুবিয়ে দেওয়া। প্রথমটির ফল হয়েছিল বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তিবাদ। এই পথ অবলম্বন করেছিলেন কবীর নানক প্রভৃতি ধর্মগুরুগণ। দ্বিতীয়টির ফল হয়েছিল ভক্তিবাদ, লীলাবাদ এবং এর পরিণতি ঘটেছিল বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপ্তিতে। ভক্তিবাদের পথ যে সমস্ত সাধকরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল সংগীত।

কবীর (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম) নাম গান, গুরুভক্তি, সংসার বৈরাগ্য, জীবে প্রেম এবং ভগবানে আত্মসমর্পন ভেদজ্ঞান বিসর্জনের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর গানও রাগরাগিণীযুক্ত কিন্তু বিশুদ্ধ

১। "It might be the fact Vrindāvana drew its inspiration and impetus of the culture of dhrubapada from Gwālior and its adjacent places, but yet it cannot be denied that Vrindāvana and afterwards Mathura created the schools of their own, and those schools maintained by a host of Kalāvids like Krishnadas, Haridas and others."—Swāmi Pragnanānanda, 'A Historical Study of Indian Music', Calcutta (1955), P. 177—78.

রাগরাগিণীতে তাঁর গান গাওয়া হ'ত কিনা বলা কঠিন। তাঁর গানের দার্শনিক আবেদনই ছিল প্রধান।

নানকও তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছেন এবং রাগরাগিণীযুক্ত তাঁর গান এই প্রচারের সহায়ক হয়েছিল। নানকের কিছু কিছু গান (যেমন; "কাহে রে বন খোজন আঈ," "জগতমে ঝুঠী দেখী প্রীত" প্রভৃতি) ধ্রুপদ গায়ক এবং খেয়াল গায়কদের কণ্ঠে শোনা যায়।

মীরাবাঈ-এর গানেও রাগরাগিণীর নির্দেশ পাওয়া যায়, তবে তার সঙ্গে রাজস্থানের লোক সংগীতের মিশ্রণ লক্ষ্যনীয়। মীরাবাঈ বৃন্দাবনেও এসেছিলেন এবং তাঁর একটী গানে স্বামী হরিদাসের প্রতিষ্ঠিত 'বাঁকে বিহারী'র নাম আছে—

হমারা প্রণাম বাঁকেবিহারীকো।
মোর মুগট মাথে তিলক বিরাজৈ
কুণ্ডল অলকা কারীকো॥
... ...
য়হ ছবি দেখ মগন ভই মীরা
মোহন গিরিবরধারীকো॥

মীরাবাঈ পতিভাবে কৃষ্ণকে ভজনা করেছেন। বৃন্দাবনে হরিদাসী, বল্লভাচার্য সম্প্রদায় ঐ ভাব গ্রহণ করেননি। তাঁরা ভক্তিকেই প্রাধান্য দান করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রেমকেই বড় ক'রে দেখেছেন। সংগীত সবারই মুখ্য অবলম্বন ছিল।

অবশ্য মথুরা-বৃন্দাবনে ভক্তিবাদী যে গান প্রচলিত ছিল, তা'র রূপ ছিল দু'টী —বিষ্ণুপদ বা কীর্তন এবং ভজন। বিষ্ণুপদে চার থেকে আট চরণ পর্যন্ত থাকতো। ভজন সংগীত ভক্তিমূলক সংগীত। এই সংগীতের ভাষাই শুধু সরল নয়—সহজ। এতে অলংকারের প্রাবল্য নেই। সহজ সরলভাবে ভক্ত তাঁর ভক্তি নিবেদন করেন এই সংগীতের মাধ্যমে তাঁর ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে বিষ্ণুপদ প্রকৃত পক্ষে প্রবন্ধ গান। অর্থাৎ ধ্রুব-প্রবন্ধের যে পরিবর্তন ঘটছিল এ গান সেই গান। রাজা মানসিংহের ধ্রুপদের সঙ্গে এর পার্থক্য ছিল। পদের ছন্দই এ ক্ষেত্রে প্রধান ছিল।

বৃন্দাবনধামে অবস্থান করে যে সংগীতসাধক সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি স্বামী হরিদাস। এই মহাপুরুষের জন্মস্থান এবং জন্ম সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। এ সম্পর্কে বহু মতামত পাওয়া যায়। 'ভক্ত-

সিন্ধুতে' বলা হয়েছে, হরিদাসের জন্ম ১৪৪১ সংবত (অর্থাৎ ১৪৯৮ খৃঃ), গোস্বামী-বর্গের দ্বারা প্রমাণিত জন্মকাল ১৫৬৯ সংবত (অর্থাৎ ১৬২৬ খৃঃ), স্বামীজীর পরম্পরানুবর্তী মহানুভাবী দ্বারা কথিত জন্মকাল ১৫৩৭ সংবত (অর্থাৎ ১৫৯৪ খৃঃ)। স্বামীজী প্রায় ৯৫ বছর বেঁচে ছিলেন এবং ২৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—এ সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ নেই।

স্বামীজীর জন্ম সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার এবং তা হচ্ছে এই যে, স্বামীজীর সঙ্গে সম্রাট আকবরের দেখা হয়েছিল। আকবর বৃন্দাবনে গোস্বামীদের দর্শন করতে এসেছিলেন, একথা আমরা নানাভাবে জানতে পারি। Growse তাঁর 'History of Mathura' বইতে (পৃঃ ২৪১) ১৫৭৩-এ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দর্শন লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া Gazettier of Muttra (p. 191)-তেও লেখা আছে, "Indeed in 1570 (1627 V. S.) the fame of the Vrindaban Gosains had spread so far abroad that the emperor himself was induced to pay them a visit. Here he was taken blind folded into the sacred enclosure of the Nidhiban, the actual vrinda grove to which the town owes its name, and so marvellous a vision was revealed to him that he was fain to acknowledge the place as holy ground, the attendant Rajas expressed a wish to erect a series of buildings more worthy of local divinity and having attained the cordial support of the soverign built four celebrated temples of Govinda Deva, Gopinath, Jugal Kishor and Madan Mohan in honour of the event"

আকবর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এদিকে লক্ষ্য রাখলে স্বামীজীর জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই 'ভক্তসিন্ধু'-তে উল্লিখিত ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দেই হরিদাস স্বামীর জন্ম সময় হওয়ার সম্ভাবনা।

হরিদাসের জন্মস্থান কেউ বলেছেন মুলতান, কেউ বলেছেন আলীগড়ের হরিদাসপুর বা হসিয়ারপুর গ্রামে, আবার কেউ বলেছেন ব্রজধামে। "বৃন্দাবন কথা"[১] নামক গ্রন্থে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই—মুলতানের অন্তর্গত

১। পুলিন বিহারী দত্ত, 'বৃন্দাবন কথা', কলিকাতা (১৩২৬) পৃঃ ২১

কোল গ্রামে (মতান্তরে উর্চা গ্রামে) ব্রহ্মধীর নামে এক ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর পুত্র জ্ঞানধীর গিরিধারী গোপালমূর্তি পূজা করতেন। তিনি মথুরায় এসে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র আশাধীর বৃন্দাবনের পার্শ্ববর্তী রায়পুর গ্রামের গঙ্গাধর নামে একজন ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ ক'রে শ্বশুরালয়ে বাস করতে থাকেন। আশাধীরের দুই পুত্র হরিদাস ও জগন্নাথ। হরিদাস শৈশব থেকেই ধর্মপ্রবণ। তিনি ২৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবনের অপর পারে মান-সরোবর নামক কুণ্ডতীরে কুটীর বেঁধে একাকী ভজন পূজনে নিমগ্ন হ'ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেবা বৃন্দাবনে এলে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। সেখানে নিধুবনেব (নিধিবনের) বিশাখা কুণ্ড থেকে মৃত্তিকা খনন ক'রে বাঁকে বিহারী ঠাকুর পান।

হরিদাস স্বামী এবং তাঁর গুরু

হরিদাস কার কাছে সংগীত শিক্ষা করেন জানা যায় না। অনেকে আশাধীর (বা আশুধীর)-কেই তাঁর শিক্ষাগুরু বলেছেন। কেউ বলেছেন তিনি শিক্ষাগুর গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত স্বামী নামক এক সন্ন্যাসীর কাছে শিক্ষালাভ করেন। তবে স্বামী হরিদাসের গুরু হিসাবে স্বামী কৃষ্ণদাসের নামই বিশেষ ভাবে প্রচলিত। 'কৃষ্ণদাস' নামে অবশ্য দু'জন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। এঁরা দু'জনই ছিলেন সংগীত শাস্ত্রকার এবং সংগীত সাধক। বৃন্দাবনে ধ্রুপদের প্রচলন ছিল সমধিক। কথিত যে, রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী দু'জনই সংগীতসাধক ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ পরিকরদের মধ্যে রায় রামানন্দ একজন বিদগ্ধ সংগীত-শাস্ত্রকার ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বরূপদামোদর, কৃষ্ণদাস গোস্বামী ও অন্যান্য আরও অনেকে বৃন্দাবন অঞ্চলে নিজস্ব ধ্রুপদ গায়কীর ধারক ছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম পরবর্তীকালে ঐ বৃন্দাবন মথুরার ধ্রুপদ গান শিক্ষা ক'রে পদাবলী কীর্তনে বিলম্বিত লয়ে গরাণহাটী শ্রেণীর কীর্তন প্রবর্তন করেন। কিংবদন্তীর পশ্চাতে ইতিহাস লুকানো থাকে। তাছাড়া বৃন্দাবনের গোস্বামী বৈষ্ণব সাধকগণ অভিজাত ধ্রুপদ গানের অনুশীলক ও ধারক ছিলেন ব'লে ধরা যায়।

প্রকৃতপক্ষে হরিদাস স্বামীর জন্ম সময়, জন্মস্থান এবং তাঁর নামটী নিয়েও নানা গোলযোগ। অন্ততঃ সাতজন হরিদাসকে পাওয়া যায়—হরিদাস (স্বামী) হরিদাস (দ্বিতীয়), হরিদাস (নায়ক), হরিদাস (ডাগুর), হরিদাস (যবন) হরিদাস (কবীরপন্থী), হরিদাস (রায় সনেহী সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রভৃতি। এ অবস্থায় হরিদাস স্বামীর জন্ম সময় এবং জন্মস্থান নিয়েও যেমন নানা মত, তেমনি

তাঁর গুরু নিয়েও। অবশ্য মধ্যযুগের সংগীত সাধকদের অনেকেরই গুরুর সঠিক সন্ধান পাওয়া কঠিন।

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই আমরা ভারতবর্ষে চারটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখতে পাই: রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক– এঁদের নামানুসারে সম্প্রদায়গুলি গড়ে ওঠে।[১] হরিদাস স্বামী ছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বামীজীকে কেন্দ্র ক'রে যে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তার নাম হরিদাসী সম্প্রদায়।

হরিদাস স্বামী যখন বৃন্দাবনে তখন নানা বৈষ্ণবীয় মতবাদ সেখানে পরিব্যাপ্ত। রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। গান, নৃত্য ও বাদ্যের সহায়তায় বিভিন্ন মতাবলম্বীরা ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করেছেন, সেই সঙ্গে বহু মানুষকে আকর্ষণ করেছেন। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সাধকদের মধ্যে মতান্তর ঘটেনি।

বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের তিনজন গায়ক সুরদাস, গোবিন্দস্বামী ও পরমানন্দ দাস। সুরদাস মথুরায় এসেছিলেন এবং বৃন্দাবন সমীপস্থ গোবর্ধনের নিকট পরসোলীতে বাস করেছেন। তাঁর রচিত কিছু বিষ্ণুপদ আছে। গোবিন্দ-স্বামী কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা ক'রে বহু পদ রচনা করেন। পরমানন্দ দাসও গোবর্ধনে বাস করেছেন। পরমানন্দের গান কবিত্বমণ্ডিত। গোবিন্দ স্বামীও বৃন্দাবনে এসে বাস করেন।

শ্রীরাধা বল্লভীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীহিত হরিবংশ তথা প্রসিদ্ধ বীণকার শ্রীহরিরাম ব্যাস স্বামীজীর সমকালীন ছিলেন এবং বৃন্দাবনে বাস করতেন। স্বামীজীর সঙ্গে এই দু'জনেরই খুব সৌহার্দ্য ছিল। হিত হরিবংশ 'বিষ্ণুপদ' এবং 'হোরি' বিষয়ক কবিতা গান গাইবার উপযোগী ক'রে রচনা করেন। এই সব পদ ধ্রুপদ, ধামার এবং ভজনের রীতিতে গাওয়া হ'ত।

এই বল্লভ-সম্প্রদায়ের আর একজন কৃষ্ণদাস হরিদাসের সমসাময়িক। হরিদাস বল্লভ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসলীলা, 'হোরি' তথা হোলি প্রভৃতি গায়ন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু কে ধ্রুপদের ধাতু ও তালের নাম পরিবর্তন করেন এবং ধামার নামের উদ্ভাবন করেন তা বলা কঠিন। অথচ 'ধামার' এই সময়ে

---

1 Dr. Sushil Kumar Dey, 'Vaisnava faith and movement', Calcutta (1961), P.3.

প্রচলিত ছিল। ধামার তাল বিশেষ। ধ্রুপদ যখন ধামার তালে গীত হয় তখন তাকে ধামার আখ্যাই দেওয়া হয়। ধামারে ধ্রুপদের মত পরিপূর্ণ স্থির গাম্ভীর্য নেই। এতে শৃঙ্গাররসোদ্দীপক প্রেমগীতিই বেশী রচিত হয়ে থাকে। তাই ধামার একটু লঘু প্রভৃতির এবং এতে অলংকারও থাকে বেশী। ধামার তালে ধ্রুপদ রচিত হলে যেমন তাকে ধামার বলা হয়, তেমনি ঝাঁপতালে ধ্রুপদ রচিত হলে তাকে 'সাদ্‌রা' বলা হয়। সাদ্‌রার গতি ত্বরান্বিত। তার চলার গতির ঢং লাফিয়ে চলার মত। ঝাঁপতালের লয়ে এবং প্রধানতঃ বীররস প্রধান বিষয় নিয়ে 'সাদরা' রচিত হয়। এতেও তানের অবকাশ নেই।

কেউ কেউ বলেন যে, 'হোরি'[১] গান ধ্রুপদেরই একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। বসন্তোৎসব উপলক্ষে ভগবৎলীলা সম্বন্ধীয় ধামার তালাশ্রিত ধ্রুপদকেই 'হোরি' বলা হয়। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ বলতে আমরা চারটি অঙ্গ (তুক) যুক্ত গানকেই বিশেষভাবে বুঝব। এই চারটি অঙ্গযুক্ত গানই সাধারণভাবে চৌতাল বা চৌতালের অভিজাত গান বলে পরিচিত। হোরি বা হোলি বিষয়ক ধামার গান চারতাল যুক্ত ধ্রুপদ গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ৯৫ বছর বয়সে স্বামী হরিদাস লৌকিক দেহ ত্যাগ ক'রে নিত্যকুঞ্জ বিহারে লীন হয়ে গেলেন। যদিও সাধারণ লোক তাঁকে এক মহান সংগীতধারার প্রবর্তক হিসাবে জানেন তবুও তাঁর মহান দান তাঁর সাধনক্ষেত্রে। রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য ভক্তির চরম বিকাশের কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে যে পঞ্চম ভক্তিরস মাধুর্য নানারূপে পল্লবিত হয়েছিল তাতে স্বামীজী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভক্তিরসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর উপাসনা ছিল সখীভাবের উপাসনা। তাঁর উপাসনায় শ্যাম এবং শ্যামা নিরন্তর থাকতেন। এই রসে রসিক সাধকের অনন্যতাই মূল মন্ত্র—এমনি অনন্যতা যাঁর জন্য সমস্ত সংসার নিজের ব্যক্তিত্ব, রীতি, নীতি, মর্যাদা, ধর্ম, কর্ম, তীর্থ ব্রতাদি সাধন অন্য দেব-দেবী এমন কি নিজের উপাস্য ঠাকুরের অন্যরূপ বা অন্য লীলার চিন্তা করারও অবকাশ থাকতো না। এই বঙ্কিম পথের সাধক ভক্তির রসের মাধ্যমে আনন্দময় লোকে বিচরণ করতে থাকেন। স্বামীজীর শিষ্য পরম্পরায় অনেক প্রসিদ্ধ বাণী রচয়িতা হয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন রাগরাগিণীতে বহু পদ রচনা করেছেন। সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও ইতিহাসের ওপর অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এই সমস্ত সামগ্রী হাতে লেখা গ্রন্থে সীমিত আছে। সম্প্রদায়ের

১। 'হোলি' আর 'হোরি' এক জিনিস নয়। 'হোরি' ধামার তালে গাওয়া বসন্তকালীন ধ্রুপদাঙ্গ গান; আর 'হোলি' ধামার তাল ছাড়া চাঁচর, দীপচাঁদ প্রভৃতি তালে গাওয়া বসন্ত সংগীত।

সিদ্ধান্ত যে শিষ্যরা দীক্ষা নিয়েছেন তাঁদেরই কেবল বলা হ'ত এবং শুধুমাত্র তাঁদেরই বাণী পাঠের অধিকার দেওয়া হ'ত। সেজন্য এই তত্ত্ব আজও সর্বসাধারণের অজানা র'য়ে গেছে। বৃন্দাবনের কয়েকটি স্থানে স্বামীজীর সম্প্রদায় বর্তমান।

(১) শ্রী 'বাঁকে বিহারীজী'র মন্দির—যেখানে বিহারীজীর গোস্বামী স্বামীর উপাস্য ঠাকুরের সেবা পূজা করেন।

(২) নিধিবন—যেখানে স্বামীজী তথা তাঁর কতিপয় শিষ্যের সমাধি আছে।

(৩) শ্রীগোরেলালজীর মন্দির—যেখানে স্বামীজীর শিষ্য পরম্পরার স্বামী নরহরি দেবজীর সেব্য ঠাকুর বিরাজমান।

(৪) শ্রীরসিক বিহারীজীর মন্দির—যেখানে স্বামী রসিকদেবজীর সেব্য ঠাকুর আছেন।

(৫) টট্‌টী স্থান—যার স্থাপন করেছিলেন স্বামী ললিতমোহিনী দেব।

শেষোক্ত তিন স্থানে স্বামীজীর সম্প্রদায়ের বিরক্ত সাধু বাস করেন। এই বিরক্ত সাধুদের উপাসনার অনন্যতা, নিস্পৃহতা এবং আদর্শ চরিত্র অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ উৎসবে এবং গুরুদেবের জয়ন্তী দিবসে এখানে 'সমাজ' হয় যেখানে স্বামীজী ও তাঁর শিষ্য পরম্পরায় রচিত পদ গাওয়া হয়। শুক্লা ভাদ্রমাসের ৮ই তারিখে, টট্‌টী স্থানে স্বামীজীর জয়ন্তীতে খুব বড় মেলা হয়। এই অবসরে সর্বসাধারণ এই স্থানে প্রবেশের সুযোগ পায়। স্বামীজীর নিজের মাটির পাত্র কেবল এই দিনে সকলের সামনে আনা হয়। এই সময় কয়েক দিন সমাজ হয় এবং এতে 'বিরক্ত' সাধুরা নিজেদের পরম্পরাগত ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। কেবলমাত্র দু'দিন অল্প সময়ের জন্য বাইরের গায়কদের গান করতে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা সংগীতের মাধ্যমে স্বামীজীর পূজা করতে পারেন।

সংগীত স্বামীজীর সম্প্রদায়ের উপাসনার একটি মুখ্য অঙ্গ। এই বৈরাগী সম্প্রদায় আপন গুরুমুখে ধ্রুপদ গানকে পরম্পরায় পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সকলেই প্রতিভাবান ছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ সাধনা এবং অভ্যাসের দ্বারা পরম্পরায় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। স্বামী হরিদাসজীর গায়কীর কি স্বরূপ ছিল তা জানবার কোন উপায় নেই। একথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক নয় যে বিরক্ত সম্প্রদায় আজকাল যে ভাবে ধ্রুপদ গান করেন তা স্বামীজীর গায়কী। যেত একথা বলা যায় যে এই গায়কী বর্তমানের ধ্রুপদ গান থেকে পৃথক; আর এও

সম্ভব যে এই সাধুদের গানের মধ্যে স্বামীজীর নিজের গায়কীর কিছু অংশ বিদ্যমান আছে।

হরিদাসের অবদান

স্বামী হরিদাস সিদ্ধান্তের ১৮টা আর শৃংগারের ১১০টা মোট ১২৮টা পদ রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ পদে "শ্রীহরিদাসের স্বামী শ্যামকুঞ্জবিহারী" এই কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথা ছাড়াও তাঁর কিছু পদ আছে। শৃংগারের পদ "শ্রীকেলিমাল" নামে সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহের মধ্যে দেড়শো বছরের পুরাণো পদও রয়েছে। স্বামীজীর বাণী সম্প্রদায়ের নিকট উপাসনীয় বলে মানা হ'ত। এবং শিষ্য পরম্পরায় তাদের রক্ষা, পূজা তাদের প্রতিলিপি হয়ে আসছে। সুতরাং সংখ্যা আর স্বরূপের সম্পর্কে ভ্রমের কোনও স্থান নেই। স্বামীজীর নামে এর অতিরিক্ত যে পদ সংগীতপ্রেমীদের সামনে আছে তা হয়তো নকল অথবা অন্য কোন হরিদাস নামক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়েছে।

ধ্রুপদের চার বাণীর মধ্যে ডাগর বাণীর আদি প্রবর্তক হিসাবে স্বামী হরিদাসের নাম করা হয়। কিছু সংখ্যক লোক স্বামীজীর সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ সব ভ্রমাত্মক। স্বামীজী আজন্ম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। তাঁর 'বিরক্ত' নামে শিষ্যেরা বংশ পরম্পরায় বৃন্দাবনে আছেন। "ডাগর" বাণীর সঙ্গে স্বামীজীর কোন সম্বন্ধ নেই। "সংগীত রাগ কল্পদ্রুম"-এ হরিদাস ডাগর (ডাগর অথবা ডাগুর) নামে কিছু পদ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তি স্বামী হরিদাস নন। হ'তে পারে এই বাণী স্বামীজীর বহু বছর পরে ধ্রুপদ গায়কদের প্রসিদ্ধ ঘরাণাতে আলাদা আলাদা ভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে এর কিছু সম্বন্ধ আছে এটা প্রমাণ করা দূরে থাকুক, এ-রকম অনুমানও অসম্ভব।

বৈজুবাওরা ও তানসেনের সঙ্গে স্বামী হরিদাসজীর কি সম্পর্ক ছিল তাও বিচারাধীন। সম্রাট আকবর তানসেন ও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেই প্রাচীন চিত্র থেকে যেখানে স্বামী হরিদাসের সামনে তানসেন বসে আছেন এবং সম্রাট আকবর দাঁড়িয়ে আছেন। এই চিত্রের ২০০ থেকে ২৫০ বছরের প্রতিচ্ছবি দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয়ে আছে। এই ছবির প্রায় সমসাময়িক বা তার চেয়েও পুরাণো এক প্রতিচ্ছবি কৃষ্ণগড়ের রাজার সংগ্রহালয়ে আছে। এই প্রতিচ্ছবি আরো পুরাণো কোনো চিত্রের

আধারে তৈরী এরূপ অনুমান করা খুব অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু তানসেন কি স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন? তাঁদের সম্প্রদায়ে শিষ্য শব্দের যে অর্থ তাতে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না। কারণ 'বিরক্ত' ও গৃহস্থ শিষ্যেরা তাহলে অন্যান্য দেবতার স্তুতি করতেন না। অবশ্য তাঁরা স্বামীজীর প্রশংসাসূচক এবং তাঁর পোষ্য ঠাকুর 'বাঁকে বিহারীজী'-র স্তুতিবাচক পদ রচনা করেছেন। এ থেকে মনে হয় কিছু সময়ের জন্য তাঁরা স্বামীজীর কৃপা লাভ করেছিলেন এবং সম্ভবত স্বামীজীর জন্যই সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁরা কিছু পেয়েছিলেন।

স্বামীজী শৃংগারের ১১০ পদের রাগ বিভাজন করেছেন এইভাবে—

কানাড়া—৩০	গৌড়—২
কেদারা—২২	বসন্ত—৫
কল্যাণ—১২	গৌরী—৬
সারঙ্গ—১১	নট—২
বিভাস—১০	বিলাবল—২
মল্লার—৮	

এই রাগ বিভাজন প্রমাণ সাপেক্ষ। কোনো অজ্ঞাত কবির এক প্রাচীন কবিতাতে এই সংখ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সিদ্ধান্তের ১৮ পদের রাগ অনেক পুঁথিতে নির্ণয় করা হয়নি। একটি পুঁথিতে রাগ রাগিণীর সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে এই ভাবে—

বিভাস—৪
বিলাবল—১
আশাবরী—৭
কল্যাণ—৬

হরিদাস স্বামীর রচিত পদ 'সিদ্ধান্ত' ও 'কেলিমাল' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। রাজা মানের সময় ধ্রুপদের যে পরিবর্তন হয় হরিদাস স্বামীর গান সে ধরণের নয়— তিনি পূর্ববর্তী প্রথায় প্রবন্ধ ভিত্তিক ধ্রুপদ গাইতেন। তার পদে তাল মুখ্য, গানের ছন্দ গৌণ। তাঁর পদে সালগসূড় প্রবন্ধের মত চারটী ধাতু ছিল এবং আভোগ অংশে গায়ক ও লেখকের কথা থাকতো। তবে অঙ্গ ব্যবহার করা হ'ত কম। তাঁর গানের ভাষা ব্রজভাষা। তবে এই ভাষা শুদ্ধ এবং ভাবগম্ভীর। তাঁর পদলালিত্যও অপূর্ব। যেমন—

পূরিয়া। চৌতাল

সহজ জোরি প্রগট ভই,
জো রংগ কী গৌর শ্যামঘন দামিনী জৈসে।
প্রথম হুতি আজহুঁ অনেহ রহে হৈ নটার কৈসে,
অংগ-অংগ কে উঘরই সুঘরই সুন্দরতা বৈসে বৈসে।
শ্রীহরিদাস কে স্বামী,
শ্যাম কুঞ্জবিহারী অদ্‌ভুত রূপ অনৈসে।

হরিদাস ধ্রুপদকে গভীর অন্তর্মুখী ক'রে তোলেন। তাঁর আগে ধ্রুপদ ছিল হালকা; তার প্রেরণা ছিল সাধারণের মনোরঞ্জন। হরিদাসই ধ্রুপদকে স্থিতিধর্মী ধ্যানধর্মী ক'রে সাধনার অঙ্গ ক'রে তোলেন। তখনই ধ্রুপদ মার্গসংগীত হিসাবে পরিগণিত হয়। এই পরবর্তী ধ্রুপদ সম্বন্ধে দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন—"যথার্থ ধ্রুপদের মর্মবাণী বিধৃত শান্তিরসে, গাম্ভীর্যে ভাবসংযমে, উদার অথচ নিবিড় সন্ন্যাসে, করুণ অথচ প্রসন্ন বৈরাগ্যে * * * * * ধ্রুপদ হ'ল স্বভাব অন্তর্মুখী। বেগোচ্ছলতা ওর নেই খেয়াল বা টপ্পার মতন। ও শান্তিময়, গহনবাসী। ও প্রেরণা খোঁজে বহির্জীবনের অভিঘাতে সজ্যাতে আনন্দমেলায় না: খোঁজে অন্তরের ধ্যানস্তব্ধ, ভাবগাঢ়, সংযতপ্রভ সুধালোকে। লতা পল্লবের প্রগলভতায়, বন্যা জোয়ারের কলহাস্যে, পিক পাপিয়ার কুহুধ্বনিতে ওর মুক্তি নেই। ওর মুক্তি—গম্ভীর কঠিন স্থাপত্যকারুর অচঞ্চল সম্পদে, সমাহিতিতে, শান্তিতে, সংযমে।" [সাঙ্গীতিকী, পৃঃ ৪৭-৪৮]

পঞ্চম অধ্যায়

ধ্রুপদের চরম উন্নতির যুগ

রাজা মানসিংহের সময় ধ্রুপদের ব্যাপক প্রচলন হ'লেও মোগল যুগে ধ্রুপদ সংগীতের চরম উন্নতি ঘটে বা ধ্রুপদের নবজন্ম হয়। ভারতের ইতিহাসে মোগল শাসনের যুগ নানা দিক থেকে একটী উজ্জল অধ্যায়। এই যুগ শুধু নূতন সৃষ্টি এবং নবজন্মের যুগ নয়—এই যুগ তুর্ক-আফগান যুগের সম্প্রসারণ, অর্থাৎ আগের যুগে যা সুরু হয়েছিল এই যুগে তার পূর্ণ-বিকাশ ঘটে।

এই যুগে শিক্ষার প্রসার ঘটে। এই যুগে 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত প্রচার করেন সম্রাট আকবর। এই যুগে সাহিত্য, স্থাপত্য শিল্প, চিত্রকলা, সংগীত সব কিছুরই বিকাশলাভ ঘটে। এই সব ব্যাপারেই আগের যুগে যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ সুরু হয় তা এ যুগেও অব্যাহত থাকে। মোগল সম্রাটেরা শিল্প সাহিত্য ও সংগীতের শুধু পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর গান রচনা করতেন। হুমায়ুন তাঁর প্রার্থনার সঙ্গে সংগীত পছন্দ করতেন।

আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান তিন জনেই সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন; যার ফলে মোগল যুগে সংগীতের ব্যাপক প্রসার এবং উন্নতি সম্ভব হয়। এদিক থেকে একমাত্র ঔরঙ্গজেব ব্যতিক্রম। তিনি সভাগায়কদের পদচ্যুত করেন এবং তাঁরা এর প্রতিবাদে সংগীতের এক শোকযাত্রা অনুষ্ঠান করেন। ঔরঙ্গজেব সংগীতকে শুধু নিরুৎসাহই করেননি, সংগীত চর্চা বন্ধ ক'রেও দিয়েছিলেন।[১] শুধু তাই নয়, তিনি ধর্ম-সংগীতও নিষিদ্ধ করেন।[২]

মোগল যুগে সংগীতের যে ব্যাপক প্রসার ঘটে, তা শুধু উত্তর-ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, দক্ষিণ ভারতেও এর প্রসার ঘটে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বিজাপুর, বিদর, আহম্মদ নগর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য।

১। "Aurangzeb positively discouraged music and placed a ban upon it."—'An advanced history of India' by, R. C. Mazumdar, H. C. Roychoudhuri, Kalikinkar Dutta, New York (1965), P. 60.

২। "He (Aurangzeb) also prohibited religious music on the day at the Profet's birth."—Atulananda Chakrabarti, 'Hindus and Musalmans of India', Calcutta (1940), P. 139.

মোগল সম্রাটদের শাসনকাল বিশেষ ক'রে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ) ভারতীয় সংগীতের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। নব নব সংগীত ধারার জন্ম হয় এই যুগে। হিন্দু সংগীত এবং মুসলমান সংগীতের মিশ্রণও হয় এই যুগে। মোট কথা সব দিক থেকেই ভারতীয় সংগীত বৈশিষ্ট্য লাভ করে এই যুগে। ঔরঙ্গজেব ছাড়া, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান—সকল শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটই সংগীতের সমজ্‌দার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানেরা সংগীতপ্রীতির জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বিজাপুর মার্গসংগীত, বিশেষভাবে ধ্রুবপদ-এর চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিলশাহ (দ্বিতীয়) আকবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি সংগীতপ্রেমী এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট আকবরের নির্দেশে আসাদ বেগ ১৬০৩-৪ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের রাজসভা পরিদর্শনে যান। তাঁর বিদায় উপলক্ষে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয় তাতে গান বাজনার ব্যাবস্থা ছিল। ইব্রাহিম সংগীতের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলেন যে তিনি আসাদ বেগের অনেক প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারছিলেন না। তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিল সবই সংগীত এবং সংগীতজ্ঞ সম্পর্কে।[১]

ডঃ নাজির আহম্মদ তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ইব্রাহিম আদিলশাহ কর্তৃক রচিত 'কিতাব-ই-নৌরস'-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে ইব্রাহিম ধ্রুপদ গানে রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এই বই মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সম্রাট কিতাব-ই-নৌরসের অন্তর্ভুক্ত ধ্রুপদ আদিলশাহ্ বক্তার খঁ-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন ব'লে তিনি দাবী করেছেন। ডঃ নাজির আহম্মদ বলেছেন, "The Sultan's achievements in music will be best judged from his own composition, the Kitāb-i-Nawrās. He has stated by Jāhangīr to have learnt this art from Bakhtār Khān, a notable statesman at the court of Bijāpur, to whom the Sultan is stated to have married his niece subsequently." তিনি আরও বলেছেন, "Unfortunately the names of only two of the musicians have survived ; the first is Bakhtar Khan about whom we have spoken

১। Swāmi Prajnānānanda, 'A Historical Study of Indian Music', Calcutta(1965), P. 178

earlier. He is stated to be the King's teacher in Dhrupada form of music. But he seemed to be younger than the Sultan himself.

The other musician at the court of Ibrāhim was Chānd Khān."[১]

ইব্রাহিম সংগীতজ্ঞদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বক্তার খাঁ-এর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহদানই এর প্রমাণ। উপরে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে শুধু মোগল দরবারে নয়, ইব্রাহিম আদিল শাহ (দ্বিতীয়)-র রাজ্যেও ধ্রুপদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আদিলশাহ-র গানের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তানসেন প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের মত রাজপ্রশংসাসূচক গান তিনি করেননি। তাঁর গানে সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতির স্তব আছে, পীর পয়গম্বর-এর বন্দনা আছে, রাগ বর্ণনা আছে, প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা এবং মিলন বিরহ সম্পর্কিত ভাবাত্মক কল্পনাও আছে। তাঁর গানে অপূর্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটী গান এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

উপমা সুন্দরী সোহে সুদ সদা বরসাঁত।
বিজলিয়াঁ ঝমকে জগা জোতসোঁ বত্তিসী দাঁত ॥
কিসবত রংগরংগ দিসে জ্যুঁ বাদল
ছায়ে বরসে মেঘ সো খোয়ে জল ॥
গরজে সো তু কহে রাগ মলহার
ইবরাহিম মোর রীঝ নাচে পুকার ॥

আদিলশাহ-র অধিকাংশ গানই কানাড়া রাগে রচিত। রাগ নামের পূর্বে তিনি নৌরস কথাটি ব্যবহার করতেন। সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তীকালে তাঁর কানাড়া রাগের গান নৌরসী কানাড়া নামে পরিচিত হয়। "আদিল শাহর গানে সাধারণত তিনটি ধাতু বা তুক পাওয়া যায়। তিনি এদের নাম ঠিকমতো দেননি। প্রথমটির নাম নেই—সেটিকে স্থায়ী বলতেন; কি ধ্রুব বলতেন তা জানা যায় না; দ্বিতীয় তুক্‌কে আদিল শাহ বলেছেন "বৈন", ক্বচিৎ "অন্তরা"; তৃতীয় তুকের নাম আভোগই আছে। এই তিনটি তুক্ দেখে জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে গানগুলিকে ধ্রুপদ ও খ্যালের মধ্যবর্তী বলেছেন।"[২]

১। Kitāb-i-Nauras by Ibrāhim Adil Shāh, edited by Dr. Nazir Ahmed, New Delhi (1956), pp. 48, 52-53.

২। ডঃ বিমল রায়, ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, (১৩৩৭), পৃঃ ১৫

আর একজন আদিলশাহের সঙ্গে তানসেনের নামকে যুক্ত দেখা যায়। শের শাহ-এর মৃত্যুর পরে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান (মৃত্যু সময় তিনি রেওয়াতে ছিলেন) সুলতান ইসলাম শাহ—এই নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন মুবারিজ খান (শের শাহের ভ্রাতা নিজাম খাঁ-এর পুত্র) মহম্মদ আদিল শাহ নামে সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি সংগীতে পারদর্শী ছিলেন এবং খুব ভাল পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। বদাওনি-র বিবরণ অনুসারে বাজবহাদুর এবং তানসেন তাঁর সংগীত-শিষ্য ছিলেন। বদাওনি লিখেছেন—"Adil was so highly skilled in singing and dancing that Miyān Tansin, the well-known Kalān-wat[১] who is a past master in this art used to own to being his pupil, and Bāz Bahadur, son of Suzāwal Khān, who was also one of the most gifted men of his age and had no equal in this life-wasting[২] accomplishment acquired the art (of music) from 'Adli[৩]".[৪]

বদাওনির বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে রামদাস নামে লক্ষ্ণৌ-এর একজন সংগীতজ্ঞ খান খানান বৈরাম খান্-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর তানসেনের মতই সুমিষ্ট ছিল। তিনি বৈরাম খান্-এর কাছ থেকে গায়ক হিসাবে এক লাখ তঙ্কা পুরস্কার পেয়েছিলেন।[৫] বদাওনি আরও বলেছেন যে সেখ বক্সু নামে

১। কলাবন্ত অথবা কালোয়াত

২। বদাওনির এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি সংগীত কলাকে ভালো চোখে দেখেননি।

৩। বদাওনি-র মত অনুসারে 'আদলি' ছিল আদিল শাহের জনপ্রিয় নাম।

৪। 'Muntakhabu-T-Twārikh', vol. I, by Abdul-L-Quādir Ibn-I-Muluk Shah Known as Al-Badāoni, translated by W. H. Lowe, M. A., published by RAAS, Calcutta (1898) p. 557.

৫। "Khān Khānān, although he had nothing in his treasures, gave at one sitting a lac of tankhas worth in money and goods to Ram Das of Lakhnou, who was one of the musicians of Aslim Shāh and one that in music and song you might term a second Miyān Tān Sin"—Muntakhabu-T-Twārikh' Vol II by Abdul-L-Quadir Ibn-I-Muluk Shah Known as Al-Badaoni translated by W. H. Lowe M. A. published by R.A A S. Calcutta (1924). p. 37

একজন গায়ক সংগীতে তানসেনের চেয়ে বেশী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন এবং আকবর তাঁকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দান করেন।

শেখরা সংগীত এবং নৃত্যপ্রিয় ছিলেন। সুলতানী আমলে মুলতানের বহাউদ্দীন জাকেরিয়া একজন নামকরা সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে মুলতানী রাগ এই নামকরণটী তাঁর নির্দেশেই হয়। আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি শেখ হাজী মহম্মদ গওস। তানসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সুবিদিত।

আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'-তে' আকবরের সভাগায়কদের তালিকায় উপরোক্ত বাজবহাদুর-এর নাম উল্লেখ ক'রে তাঁকে "একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক"[১] হিসাবে ঘোষণা করলেও তাঁকে অন্যান্য সভাগায়দের মত পেশাদার সংগীতজ্ঞ হিসাবে গণ্য করা যায় কি না সন্দেহ। তিনি ছিলেন মালবের শাসনকর্তা। রাণী দুর্গাবতীর কাছে পরাজিত হ'য়ে তিনি বিলাসের কোলে গা ঢেলে দেন। এই সময়েই নৃত্য, গীত তাঁর প্রিয় হ'য়ে ওঠে। 'তবাকৎ-ই-আকবরী' গ্রন্থের লেখক খাজা নিজামুদ্দীন আহম্মদ বলেছেন—"Bāz Bahādur was unrivalled in his time, in the art of music and in varlous kinds of Hindi tunes. The greater part of his time was spent in the society of prostitutes and dancing women in all kinds of vice."[২]

আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে বাজবহাদুরের সভাগায়ক ও নর্তকীরা সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রূপমতীর নাম সবচেয়ে পরিচিত। এই রূপমতী এবং বাজবহাদুর-কে ঘিরে মালব এবং রাজস্থানের পল্লী সংগীতে মধুর কাহিনী ছড়িয়ে আছে। বাজবহাদুরের সঙ্গে রূপমতীর কি সম্পর্ক ছিল ইতিহাসে তা স্পষ্ট নয়। খাজা নিজামুদ্দীন রূপমতীকে বাজবহাদুরের 'প্রিয়তমা পত্নী'[৩] ব'লে উল্লেখ করেছেন।

বাজবহাদুরের প্রকৃত নাম বায়াজিদ। তাঁর পিতার নাম শুজাত খাঁ (ইতিহাসে সাধারণতঃ তিনি সাজাওয়াল খাঁ নামে পরিচিত)। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শের শাহ মালব অধিকার করেন এবং শুজাত খাঁ-কে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত

১। "Bāzbahādur ruler of Malwa, a singer without rival"—Abul Fazl. Ain-i-Akbari translated by Blochmann, Delhi (1965) p 681

২। Tabaquāt-I-Akbari .Vol II by Kwājāh Nizamuddin Ahmad translated by B. Dey published by RAS Calcutta (1936) p. 252.

৩। Ibid p. 253

করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাজবহাদুর মালবের শাসনভার গ্রহণ করেন। "তাঁর গানে রাজা মানের সংগীত-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব তাঁর পত্নী-রূপমতী-র গানের ভাষায়, তালে ও ভাবেও বর্তমান আছে। এই প্রকৃতির গানের জন্য বাজবহাদুর-কে খ্যাল গায়ক বলা হয়। আসলে কিন্তু এ গান-রীতি ধ্রুপদেরই। আর বাজবহাদুর আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গান ক'রে ঐ রীতিকে বাজ-খানী রীতি নামে পরিচিত করিয়েছিলেন।"[১]

আকবরের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে মালব অধিকারের জন্য আকবর নির্দেশ দেন। সারঙপুরের কাছে এক যুদ্ধে বাজবহাদুর পরাজিত হ'ন। তিনি মালব পুনরধিকার করেন বটে, কিন্তু পুনরায় তাঁকে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে হয়। কোনরূপ সাহায্য সংগ্রহ ক'রতে না পেরে আকবরের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে তিনি আকবরের বদান্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে প্রথমে একহাজারি, পরে দুইহাজারি মনসবদার পদে উন্নীত করা হয়। আকবরের সেনাদলের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের সময়েই রূপমতীর মৃত্যু ঘটে।[২] বাজবহাদুর এবং রূপমতী-র সমাধি উজ্জয়িনীতে একটি সরোবরের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করছে।

আইন-ই-আকবরী রচয়িতা আবুল ফজলের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আকবরের রাজ-সভায় ৩৬ জন প্রধান সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁরা হচ্ছেন:—

তানসেন, বাবা রামদাস, সুভান খাঁ, সুজ্ঞান খাঁ, মিঞা চাঁদ, বিচিত্র খাঁ, মহম্মদ খাঁ ঢাঢ়ী, বীরমণ্ডল খাঁ, বাজ-বহাদুর, শাহাব খাঁ, দাউদ ঢাঢ়ী, সরোদ খাঁ, মিঞা লাল, তানতরঙ্গ খাঁ, মুল্লা ইশাক ঢাঢ়ী, উস্তা দোস্ত, নানক জারজু, পূরবী খাঁ, সুরদাস (বাবা রামদাসের পুত্র), চাঁদ খাঁ, রঙ্গসেন, শেখ দেওয়ান ঢাঢ়ী, রহমতুল্লা, মীর সজ্জীদ আলী, উস্তা ইউসুফ, কাসীম, তাশ বেগ, সুলতান হাফিজ হোসেন, বহরম কালি, সুলতান হাসিম মশাদ, উস্তা শা মহম্মদ, উস্তা আমিন, হাফিজ খাওজালি, মীর আবদুল্লা, পীর জাদা, উস্তা মহম্মদ হোসেন।

১। ডাঃ বি.ল রায়, 'ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা (১৩৭১), পৃঃ ১১৮

২। এই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন অধম খান। 'তবাকৎ-ই-আকবরী (রচয়িতা খাজা নিজামউদ্দীন আহম্মদ) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বাজবহাদুরকে পরাজিত হতে দেখে এক খোজা রূপমতীকে তরবারির আঘাতে হত্যা করার চেষ্টা করে। কারণ ভয় ছিল যে রূপমতী অধম কোকার হাতে পড়তে পারেন। কিন্তু তরবারির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি সতীত্ব রক্ষার জন্য বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।—'Tābaquat-I-Akbari' by Khāwājāh Nizamuddin Ahmad, Vol, III translated by B. Dey Calcutta (1936), p. 253.

উপরোক্ত এই ৩৬ জন সংগীতজ্ঞের মধ্যে বীর মণ্ডল খাঁ, শাহাব খাঁ, উস্তা দোস্ত মশাদ, পূরবী খাঁ, শেখ দেওয়ান ঢাঢ়ী, মীর সজ্জীদ আলী, উস্তা ইউসুফ, কাসীম, তাশবেগ, বহরাম কালি, সুলতান হাসিম, উস্তা শা মহম্মদ, উস্তা আমিন, মীর আবদুল্লা, উস্তা মহম্মদ হোসেন—এঁরা ছিলেন বাদ্যযন্ত্রী। আর সবাই ছিলেন গায়ক। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে আকবরের সভায় বহু সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং আবুল ফজল নিজেই বলেছেন যে তিনি মাত্র ৩৬ জন সংগীতজ্ঞের নাম করেছেন। ঐ সব সংগীতজ্ঞদের মতে হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী প্রভৃতি জাতির সংগীতজ্ঞ তো ছিলেনই, পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর সংগীতজ্ঞই তাঁর সভা আলোকিত করছিলেন। সংগীত-সম্রাট তানসেন ছিলেন এঁদের মধ্যমণি।

আকবরের রাজসভার বেশ কিছু সংখ্যক গায়ক ছিলেন গোয়ালিয়রের; বাবা রামদাস, শুভান খাঁ, সুজ্ঞান খাঁ, মিঞা চাঁদ, বীরমণ্ডল খাঁ, শাহাব খাঁ মিঞা লাল, নায়ক চর্জু, চাঁদ খাঁ, প্রভৃতি গোয়ালিয়র থেকে এসেছিলেন, মশাদ থেকে এসেছিলেন উস্তা দোস্ত, হাফিজ খাজা, সুলতান হাসিম; হরাৎ থেকে এসেছিলেন বাহরাম কালি; খুরাশান থেকে এসেছিলেন পীরজাদা।

তানসেন

সংগীত জগতে যাঁকে 'সম্রাট' বলে অভিহিত করা হয়েছে সেই তানসনের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ, প্রকৃত নাম, তাঁর পিতৃপরিচয়, ধর্মান্তর গ্রহণ, তাঁর গুরু—সমস্ত বিষয়েই নানা মত বর্তমান। ব'লতে গেলে তাঁর জীবনচরিত শুধু কিংবদন্তীয় ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমত তাঁর জন্ম ও মৃত্যু-র তারিখ। তানসনের জন্ম সময় সম্পর্কে যে যে খৃষ্টাব্দ উল্লিখিত হয়েছে তা হ'ল এইরূপ—১৪৯৩, ১৫০৬, ১৫২০, ১৫৩১, ১৫৪৮। এইগুলির মধ্যে কোনটা ঠিক তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এক্ষেত্রে দুটি কথা মনে রাখতে হ'বে: (১) তিনি আকবরের রাজসভায় যখন আসেন তখন তিনি শুধু বিবাহিতই ন'ন, তাঁর পুত্রেরাও সংগীতজ্ঞ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। (২) তানসেন যখন আকবরের দরবারে আসেন তখন তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন না। কারণ সংগীত প্রতিভা যদি তাঁর একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যেত তাহলে আকবরের দরবারে এসে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। আকবরের রাজত্ব শুরু হয় ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে

এবং তানসেন আকবরের দরবারে আসেন ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে। এ অবস্থায় তানসেনের জন্ম ১৫২০ খৃষ্টাব্দে হবারই সম্ভাবনা। আবুলফজল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ রচনা করেন। সে সময় তানসেন বেঁচে ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল সম্ভবত ১৫৮৫ থেকে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ গোয়ালিয়রের বিরাট পর্বত-দুর্গের পাদদেশে মহম্মদ গওসের সমাধির পাশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ করা হয়।

ভারতীয় সংগীত জগতে বহু-বিতর্কিত নাম 'তানসেন'। কেউ বলেছেন 'তানসেন' উপাধি বিশেষ। এই উপাধি কে দিয়েছিলেন তা নিয়েও মতভেদ আছে। ফজলআলির 'কাল্লিয়াৎ-গোয়ালিয়র'-এর অনুসরণে বলা হয়েছে যে তানসেন এই উপাধি পেয়েছিলেন গোয়ালিয়র-রাজ বিক্রমজিতের দরবারে। আবার কেউ বলেছেন সম্রাট আকবর তানসেনকে এই উপাধি দান করেন। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী তাঁর 'হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস' (১৯৬৫) নামক গ্রন্থে এই তথ্য লিপিবদ্ধ ক'রে বলেছেন, "এই উপাধির অর্থ যিনি সংগীতে 'তান' (সুর লহরী) দ্বারা 'সৈন' অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেন তিনিই তানসেন" (পৃঃ ৩৮-৩৯)।

'তানসেন' উপাধি হিসাবে ধ'রলেও তানসেনের প্রকৃত নাম এবং তাঁর পিতার নিয়েও গোলযোগ কম নয়। কেউ বলেছেন তাঁর নাম রত্নাকর পাণ্ডে এবং পিতার নাম মুকুন্দরাম পাণ্ডে বা মকরন্দ পাণ্ডে বা পাঁড়ে। তানসেনের নাম বলা হয়েছে রামতনু।[১] আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার আগে তাঁর নাম ছিল তন্নামিশ্র।[২]

তানসেনের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কেও নানা রকম কাহিনী প্রচলিত। এইরূপ বলা হয় যে, তাঁর পিতা কাশীধামে কথকতার দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। পণ্ডিত ও সংগীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তানসেনের আগেও তাঁর অনেকগুলি পুত্র সন্তান জন্মেছিল কিন্তু একটিও বাঁচেনি। তিনি তাই গোয়ালিয়রে হজরৎ মহম্মদ গওস নামক একজন পীরের শরণাপন্ন হন। এই

১। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চোধুরী, 'হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান', কলিকাতা (১৩৬৪), পৃঃ ১২।

২। "জো মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করনেকে পূর্ব তন্নমিশ্রকে নামসে পুকারে যাতে থে"—বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, 'উত্তর ভারতী সংগীতকা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,' হাথ্‌রাস, ইউ, পি, (১৯৬৬), পৃঃ ৩০।

পীর প্রদত্ত মাদুলির বলেই তানসেন জন্মগ্রহণ করার পর মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান। এই পীরের প্রভাবেই নাকি তানসেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হয় মহম্মদ আতা আলী খাঁ। কেউ কেউ বলেন হোসেনী ব্রাহ্মণী নামক এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করার জন্য তাঁকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই হোসেনীর হিন্দু নাম ছিল প্রেমকুমারী। তাঁর পিতা সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তর গ্রহণের পর প্রেমকুমারীর ইসলামী নাম রাখা হয় 'হোসেনী'।[১] এই সময় গোয়ালিয়রের অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। আইন-ই-আকবরী-তে যে ছত্রিশ জন সংগীতজ্ঞের নাম আছে তাঁদের মধ্যে পনের জন গোয়ালিয়রের। এঁদের মধ্যে তানতরঙ্গ খাঁ, শ্রীজ্ঞান খাঁ, বিচিত্র খাঁ, বীরমণ্ডল খাঁ, মিঞা চাঁদ, পুরবীন খাঁ, চাঁদ খাঁ প্রভৃতি।

তানসেনের গুরু

গোয়ালিয়রেই তানসেনের সাংগীতিক জীবন সুরু। এ পর্যন্ত যত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে তানসেন বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামী এবং গোয়ালিয়রের শেখ মহম্মদ গওস—এই দু'জনের কাছেই সংগীত শিক্ষা করেন। হরিদাস স্বামী যেমন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের মহান উত্তরাধিকার বহন করেছেন, গওস'ও তেমনি বহন করেছেন পারস্য সংগীতের উত্তরাধিকার। তানসেনের সংগীতে আমরা এই দুই ধারার সমন্বয় দেখতে পেয়েছি। গওসের সঙ্গে তানসেনের সম্পর্ক জন্মের পর থেকেই—একথা আগেই বলা হয়েছে। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে তানসেন গওসের কাছে শুধু সংগীতই শিক্ষা করেননি, গওসের অতুল সম্পত্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন (বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস,' পৃঃ ৩৮)।

তানসেনের সঙ্গে হরিদাস স্বামীর দেখা হয় বারাণসী ধামে—একথা কেউ কেউ বলেছেন ('হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান'পৃঃ ১৩)। কেউ বলেছেন তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় গোয়ালিয়রে। আবার এমন মতও প্রচলিত আছে যে হরিদাস স্বামীর অদ্ভুত সংগীত প্রতিভার কথা শুনে তানসেন নিজেই বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দশ বছর হরিদাস স্বামীর কাছে সংগীত শিক্ষা করার পর পিতার অন্তিম সময়ে তানসেন গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন। এই সময়

১। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী,'হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস,' পৃঃ ৩৫—৩৭, এবং 'হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান', পৃঃ ১২

গওসের নিকট তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। শেখ মহম্মদ গওস হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। এজন্য বদাওনি তাঁর প্রতি রীতিমত অপ্রসন্ন হ'ন। তিনি লিখেছেন যে, 'শেখ মহম্মদ গওসকে আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ব্যগ্র ছিলাম ; কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে হিন্দুদের কাছ থেকেও তিনি অভিবাদন গ্রহণ ক'রে থাকেন তখন আমার সে ইচ্ছা অন্তর্হিত হ'ল এবং তাঁর সম্বন্ধে যে সন্তুষ্টির ধারণা ছিল তাও অন্তর্হিত হ'ল।'[১]

আকবরের দরবারে তানসেন

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর সাত বৎসর পরে তানসেন আকবরের দরবারে স্থান লাভ করেন। আকবরের সভায় আসার আগেই তানসেন সংগীতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আকবরের রাজসভায় আসবার আগে তানসেন রেওয়ার অন্তর্গত বন্ধগড়ের রাজা রামচাঁদ বাঘেলার[২] রাজসভায় ছিলেন। তাঁর দিল্লীর দরবারে আসা সম্পর্কে আইন-ই-আকবরীতে এইরূপ বিবরণ আছে—'সম্রাট্ আকবরের রাজত্বলাভের ৭ম বর্ষে তানসেনের খ্যাতির কথা তিনি শুনতে পেলেন। তিনি আগ্রায় তানসেনকে নিয়ে আসবার জন্য জালাউদ্দীন কুরচিকে পাঠিয়ে দিলেন। আকবরের অনুরোধ উপেক্ষা করার ক্ষমতা রামচাঁদের ছিল না। তিনি বাদ্যযন্ত্র এবং অনেক উপহার সহ তানসেনকে আগ্রায় পাঠালেন। তানসেন প্রথম রাজসভায় গান গেয়ে দুই লক্ষ টাকা ইনাম পেলেন। তিনি আকবরের সভায় থেকে গেলেন। তাঁর অধিকাংশ সংগীত আকবরের নামে লেখা এবং এখন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের জনসাধারণ সেই গান গেয়ে থাকেন।'[৩]

রাজা রামচাঁদ একজন বিখ্যাত সংগীতপ্রেমী ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে

১। Atulananda Chakrabarti, Hindus 'And Musalmans of India Calcutta (194?) P. 129.

২। উত্তরে কৈমুর পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে মিকাইল পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঘেলা নামে এক উপজাতি শাসন করত। এরা পরে বন্ধ এবং কলিঞ্জর অঞ্চলে বসবাস করে এবং এই অঞ্চলের নাম হয় বাঘেল খন্দ। বাঘেলা-রাজ বিক্রমদেবের সঙ্গে জৌনপুরের শর্কী শাসকদের ভাল সম্পর্ক ছিল। এঁর বংশেরই রাজা রামচাঁদ। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজা রামচাঁদ শক্তিশালী শাসকরূপে পরিগণিত হন।

৩। Abul Fazl Ain-i-Akbari translated by Blochmann, Delhi (1956 p. 445.

ধ্রুপদ গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে তিনি তানসেনকে এক কোটী তঙ্কা (স্বর্ণমুদ্রা) দান করেন। এই বিবরণ 'বীরভানুদয়' কাব্যের লেখক কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। 'বীরভানুদয়'-এর লেখক বলেছেন—প্রতিটি গান, প্রতিটি তান এবং প্রতিটি ধ্রুপদের জন্য তিনি (রাজা) এই তানসেন নামীয় সংগীতজ্ঞকে (কলাবিদ) এক কোটী টাকা দান করেছেন। এই সমস্ত বিবরণে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এ-থেকে তানসেনের সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

তানসেন যখন মোগল দরবারে আসেন তার পূর্বেই তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন এবং তিনি তখনই 'তানসেন'—এই নামে পরিচিত ছিলেন। তানসেন মোগল দরবারে আসার এক বছর পরে আব্দুল মজিদ আসফ খাঁ রাজা রামচাঁদের রাজ্য অধিকার করেন এবং রামচাঁদ বিখ্যাত বন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁকে পরে রাজত্বে পুনপ্রতিষ্ঠিত করা হয় বটে, কিন্তু সেটা মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের সর্তে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামচাঁদের মৃত্যু হয়।

তানসেনের অবদান

'আইন-ই-আকবরী' রচয়িতা আবুল ফজল লিখেছেন—"তানসেনের মত গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে একজনও জন্মগ্রহণ করেননি।"[১] 'বৈষ্ণব কি বার্তায়' লিখিত আছে—"তানসেন সংগীত বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন। তিনি আকবরের দরবারে সকল সংগীতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" 'তুজুক জাহাঙ্গী-রই'-তে জাহাঙ্গীরই তাঁর পিতার দরবারের অন্যতম রত্ন তানসেনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দুঃখের বিষয় তানসেনের সংগীত প্রতিভার শুধু একটা দিকই দেখা হয়ে থাকে। গায়ক হিসাবে অতুলনীয় যশের অধিকারী তানসেনের কবি-যশ ভাগ্যে ঘটেনি। কারণ সংগীত-শিল্পী তানসেনের আড়ালে কবি তানসেন ঢাকা পড়েছিলেন। তিনি নিজের রচিত গানই গাইতেন। সে গানে কাব্যরস অপেক্ষা সংগীত রসই প্রধান আকর্ষনীয় ছিল। ক্লাসিক গানের সকল রচয়িতাদের সম্পর্কেই যে কথা খাটে অর্থাৎ তাঁদের গানের কাব্যসৌন্দর্য সুর ছন্দে অনেকটা চাপা পড়ে যায়—তানসেনের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে।

১। "Miyān Tānsen of Gwālyār. A singer like him has not been in India for the last thousand years", Abul Fazal, Ain-i-Akbari, translated by Blochmann, Delhi (1965), P 681.

কিন্তু যে গান নবজাগরণ আনলো সংগীতের ক্ষেত্রে সে গানের ভাষার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব নয়। তানসেন যে যুগের (ষোড়শ শতাব্দী) সে যুগ প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। একদিকে তুলসী দাস ও সুরদাসের কাব্যমণ্ডিত গান, ফারসী রাজভাষা—পোষাকী ভাষা, ফারসী সাহিত্যের চর্চা এবং তাতে আকবর ও তাঁর আমাত্যদের উৎসাহ; তেমনি অন্যদিকে দেশ-ভাষা হিন্দী (ব্রজভাষা) চর্চায় সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের উৎসাহ ছিল অফুরন্ত।

"আকবর নিজে হিন্দীতে কবিতা রচনা করতেন। 'অকব্বর' বা অকব্বর সহি—এই ভণিতায় আকবরের রচনা বলিয়া প্রচারিত কতকগুলি হিন্দী দোহা বা কবিতা পাওয়া যায়। তাঁহার সভাসদগণের মধ্যে রাজা বীরবল, মীরজা, আব্দুর রহীম খাঁ—খানান ও বীকানেরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ রাঠোড় উচ্চদরের কবি বলিয়া হিন্দী ও রাজস্থানী সাহিত্যে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন।"[১]

তানসেন ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের গীতিকবি। কিন্তু কবি বা সাহিত্যিকদের মজলিশে তাঁর কাব্য পাঠ করা হ'ত না, কালোয়াতের জলসায় এবং রাজদরবারে সংগীত পিপাসুদের সম্মুখে গাওয়া হ'ত তাঁর কাব্যসমৃদ্ধ গান। তানসেনের আগের ধ্রুপদ রচয়িতাগণ শব্দ ও ছন্দের ওপরে বিশেষ জোর দিতেন। তানসেন সুরের দিকে এবং সুরের মাধুর্যের দিকে দৃষ্টি বেশী দিয়েছেন সত্যি কিন্তু তাঁর গান কবিত্বগুণে মোটেই খাটো নয়।

তানসেন ব্রজভাষায় পদ রচনা ক'রেছেন। ব্রজভাষা মথুরা অঞ্চলের জনভাষা (ব্রজবুলি নয়) এবং এই ভাষায় একটি বিরাট সাহিত্য আছে। এই ভাষা গীতিকবিতার উপযুক্ত। শ্রুতি মাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে ব্রজভাষা সুন্দর ও শক্তিশালী এবং গীতি কবিতার বিশেষ উপযোগী। তানসেন ও অন্যান্য গীতি-কবিদের ব্রজ-ভাষাকে মধ্যযুগের আর্য-ভাষা বলা যায়। এই ভাষায় স্বরবর্ণ বেশি ব'লে ব্রজভাষা শ্রুতি সুখকর। এই ভাষায় প্রায় সব শব্দ স্বরান্ত। তাই এই ভাষা গানের ভাষার উপযোগী।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রজভাষার বৈশিষ্ট্য এবং গানে তার ব্যবহারের উপযোগিতা বর্ণনা করে বলেছেন, "গানে ব্যবহৃত হইলে ব্রজভাষার একটু উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য দুই এক ক্ষেত্রে আসিয়া যায়—অন্ততঃ ধ্রুপদ গানের কোনও কোনও ধারায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—অনুনাসিক বর্ণের পরে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়

১। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কবি তানসেন', প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০

তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ আসিলে এই অনুনাসিক যুক্ত সংযুক্ত বর্ণের পূর্বেকার অ-কারকে ঔ-কারবৎ উচ্চারণ করা হয়—অ-কারের সাধারণ হিন্দী আ-কার ঘেঁষা উচ্চারণ না হইয়া কতকটা বাংলার দীর্ঘ অ-কারবৎ উচ্চারণ আসে—পঙ্কজ, শঙ্খ, গঙ্গ, পঞ্চ ইত্যাদি শব্দ গানের সময়ে শোনায় যেন—পৌঙ্কজ, শৌঙ্খ, গৌঙ্গ, পৌঞ্চ। ইহাতে গীতকালে এই সানুনাসিক সংযুক্ত বর্ণগুলির বিশেষ একটু শ্রুতিমাধুর্য আসিয়া যায়।"[১]

তানসেনের পদের একটী লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে পদের ভাষার সংক্ষেপ বা সংকেত। তানসেনের গানের পদগুলি এইরূপ ভাবে সাজানো যাতে আমাদের মানসপটে একটি চিত্র অঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। যেমন :

রাগিণী হিন্দোল। চৌতাল

সুন্দর সরস ঋতুরাজ বসন্ত আয়ত ভায়ন, কুঞ্জ কুঞ্জ
ফুলি ফুলি (ফুলে ফুলে) ভয়র (ভ্রমর) গুঞ্জ,
কোয়িল পঞ্চম গান মতারে নরনারী ॥
কানন কানন ফুটত চমেলী, বকুল গন্ধরাজ বেলী,
মোতিয়া গুলাব সুগন্ধ মনোহারী ॥
পয়ন চলত মন্দ মন্দ, বিছুড়ি গন্ধ চহুঁ দিস্, গুঞ্জন
ঝন নাদ পঞ্চম পূরত সবহু বন ভুর ॥
রতি-পতি ভজ জুরক জুয়তী, নাচত গাবত হিন্দোল মাতি ;
গোবিন্দ-মঙ্গল তানসেন গায়ৌ রী ॥

বিষয়বস্তুর সুনির্দিষ্টতা ও বাহ্যবস্তুর ধরা বাঁধা নিয়মের জন্য ধ্রুবপদ গান স্বচ্ছন্দ কাব্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। মাত্র কয়েকটি বিষয় অবলম্বন ক'রে ধ্রুপদের বাণী রচনা করা হয়—যেমন : ব্রহ্মা, মহাদেব, পার্বতী, দেবদেবীগণ, শ্রীকৃষ্ণ-রাধালীলা প্রভৃতি বর্ণনা এবং ইস্‌লাম মতে আল্লার গুণকীর্তন, মহম্মদ এবং মুসলমান সাধক-গণের স্তুতিবাদ প্রভৃতি। প্রাচীন হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষায় ধ্রুপদ গান রচনা করা হয়ে থাকে। তানসেনের সময়ে আরবী-ফারসী শব্দ বহুল উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য ইসলাম ধর্মের অনুকূল পদে আরবী-ফারসী নাম এবং শব্দ, এমন কি বাক্য পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ধ্রুপদের পদ রচনায় কবিত্ব শক্তি বিকাশের পথে নানা বাধা থাকা সত্ত্বেও

১। "ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কবি তানসেন', প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০

তানসেন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। নানা বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ধ্রুপদের পদ রচনায় স্বীয় প্রতিভা প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন তানসেন। ধ্রুপদ গানের যে এক ধীরোদাত্ত, স্নিগ্ধ, গম্ভীর ভাব আছে, তানসেনের রচনায় তা মহিমাময় হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনাশৈলীর উদারতা ও আভিজাত্য দ্বারা তাঁর শব্দ-রচনার কৌশল ধ্রুপদ গানকে আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ ও উদ্ভাসিত করে। দেবতার মহিমা বর্ণনাতে তিনি যে সকল বিশেষণ বা সংজ্ঞা করেছেন তার মধ্যেও মৌলিকত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনন্দ-সমারোহ, বর্ষার ঘনঘটা, মেঘগর্জন ও অবিরাম বৃষ্টিপাতের ধ্বনি তাঁর রচিত বসন্ত ও মল্লার রাগে ভরপুর। প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু কাব্য ও ভক্তিবাদের সারাংশ তানসেনের গানে সন্নিবেশিত। দেবতাদের মহিমা কীর্তনের সময় তিনি তাঁর পদে যে সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, যে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, সেগুলির মধ্যে যেন একটী আদিম মহত্ত্ব—বিশালত্ব আছে। উদাহরণ স্বরূপ পরমব্রহ্মা বা শিব বা বিষ্ণু বিষয়ক কয়েকটি পদের উল্লেখ করা যায়। পাখীর গান, মলয় পবন, বসন্ত ঋতু, পুরবী বাতাস, বিজলী চমকের ঘনঘটা, বর্ষার রিমঝিম স্নিগ্ধতা, রাধা-কৃষ্ণের অনৈসর্গিক প্রেমলীলা—এ সবই আছে তাঁর পদে। "ভারতীয় কাব্য সাহিত্যে মহিমময় ও মাধুর্যময় যাহা কিছু আছে সে সমস্তের দ্বারা তানসেনের পদ যেন ভরপুর, প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু কাব্য ও ভক্তিবাদ মথিয়া নবনীতটুকু যেন তানসেনের পদে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধ্রুপদের বাণী এবং অন্য কবিদের রাগরাগিণী বর্ণনার পদ—এই সব পদে যেন প্রাচীন রাজপুত ও মোগল চিত্রের কবিতাময় ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাওয়া যায়—এই দুইটী বস্তু ভারতের কাব্যোদ্যানে দুইটী অনিন্দ সুন্দর সৌরভময় পুষ্প।"[১]

রাজদরবারে থাকলেও তানসেন যে গান রচনা করেছেন তা জনসমাজের অনুভূতির বাইরে নয়। সকলের মনের কথা তিনি গানের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। তাই মনে হয় তানসেনের গান জাতীয় চিত্ত থেকে রস পেয়ে রূপান্বিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তানসেনের গানকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়:

(১) যৌবন—এই সময়ে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা- মহারাজার গুণগান এবং ঋতু প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এই পদগুলি উল্লাস ও উজ্জ্বলতায় পূর্ণ।

(২) প্রৌঢ়াবস্থা—এই সময়ে তানসেন দেবতাদের লীলা ও মহিমা কীর্তন করেন। এই শ্রেণীর পদে তাঁর ঐশ্বর্য বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি আছে।

১। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কবি তানসেন', প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০

(৩) পরিণত ও বার্দ্ধক্য অবস্থা—এই শ্রেণীর পদে আছে আত্মানুভূতি, ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তির গভীরত্ব।

রাজ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় তানসেনের সংগীত চর্চা চলেছিল। এ অবস্থায় তাঁর গানে যে রাজা মহারাজাদের প্রশংসা থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। আকবরের প্রশংসাসূচক গান তানসেন অনেকগুলি রচনা করেছিলেন। আকবর শুধু তাঁর পৃষ্ঠপোষক নন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন গুণী ব্যক্তি। তিনি সংগীত চর্চা করতেন এবং নিজে নক্কাড়া বাজাতে পারতেন। সংগীত শাস্ত্র সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ কম ছিল না, এহেন আকবরের গুণগান যে তানসেন করবেন সেটা আর অস্বাভাবিক কি। আকবরের প্রশংসাসূচক একটি গান উদ্ধৃত করছি—

দরবারী কানাড়া। চৌতাল

"চঢ়ো চিরঞ্জীব শাহ আকবর শাহনশাহ
বাদশাহ, তখত বৈঠো ছত্র ফিরে নিশান।
দিল্লীপতি তুম নবী-জি কোঁ নায়ব
অতি সুন্দর সুলতান।
চার্যো দেশ লিয়ে কর জোর কমান
রাজারাব উমরাব সব মানত তোরি আন।
কহে মিয়াঁ তানসেন শুনিয়ো মহাজান!
তুমসে তুমহি ঔর নহিঁ দুজো,
গুণিজননকো রাখত মান॥

তানসেনের বিনয় এবং প্রার্থনাত্মক পদগুলি অতুলনীয়, কারণ এগুলিতে তাঁর হৃদয়ের সারল্য, বিশ্বাস ও প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। একটি তাত্ত্বিক, ধর্মজ্ঞ ও ভক্ত প্রাণের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তার ধর্ম বিষয়ক পদগুলিতে। তানসেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁর যথার্থ পরিচয় এবং সেগুলি সম্পর্কে তাঁর আস্থা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ তাঁর পদেই পাওয়া যায়। শিব, বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবী-র মহান ও বিরাট কল্পনার অন্তর্নিহিত গভীর চিন্তা, জ্ঞান ও উপলব্ধি ও সৌন্দর্যবোধ—সব দিকেই ছিল তাঁর শিল্পীর দৃষ্টি। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং তন্ত্র ও মধ্য-যুগের সাধুসন্তদের ভক্তিবাদ—এ সবের মধ্যে যে মনীষা, যে সত্যদৃষ্টি—যে প্রাণ, যে রসদৃষ্টি বর্তমান—সে সব কিছুরই উত্তরসাধক হলেন

তানসেন। তানসেনের ধ্রুপদ গান শুনে শ্রোতার মনে জাগে দিব্যভাগ। এখানে এই ধরণের দুটী গান উদ্ধৃত করছি—

রাগ ভৈরব। ঢিমা ত্রিতাল

মহাদেব মহাকাল ধুরজটী শূলী পঞ্চ-বদন প্রসন্ন নেত্র॥
পরমেশ্বর পরাৎপর মহাজোগী মহেশ্বর পরম পুরুষ
প্রেমময় পরা-শান্তি দাতা॥
সরিতাগণ (নদী সমূহ) ভিন্ন ভিন্ন পন্থ জৈসে আবত
সিন্ধুর পাই বহত মগন—
তানসেন কহে—তৈসে ভগত ভিন্ন ভিন্ন মূরতি
উপাসত একহী ব্রম্হ আবত॥

রাগিণী ভৈরবী। চৌতাল

অনন্ত-কাল—কৃপা করো, হিয়া-পর ঠারো, হবি কবঁল নৈন,
কমঁলাপতি, মুরলী অধর, ললিত-মধুর, বঙ্কিম ভয় বঙ্কবিহারী॥
বদন খীন (দেহ দুর্বল) ইন্দ্রিন হীন, পাপ সুমঁরি সুমঁরি
(স্মরণ ক'রে ক'রে

অস্থির প্রাণ, নিরাশা প্রবর (প্রবল) বিশ্বআধার,
নেহ ঘোড়ি প্রাণ জাত, হরি॥
বিষয় আপদ, সুখ সম্পদ ধন জন দারা বান্ধব সুত
সব-কো ছোড়ি চলিহৌ (আমি চলে যাব) এক করম
অব সঙ্গি (সঙ্গে) রহিয়ৌ (রয়েছে)।
পতিত পাবন প্রভু জনার্দন পতিত দীন তানসেন ;
বিশ্বমোহন, পরগামী প্রাণ আশ্রয় দীজে, গোলকবিহারী॥

তানসেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধ্রুপদের মধ্যে আল্লার মহিমাকীর্তন, নবীমহম্মদের ও মুসলমান সাধকদের গুণবর্ণনা পাওয়া যায়। মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে সে যুগের হিন্দু সংস্কৃতি শুষ্ক জ্ঞান-মার্গ পরিত্যাগ ক'রে যে মাধুর্যময় ভক্তির ধারা সৃষ্টি করেছিল (মীরাবাঈ, তুলসীদাস, সুরদাস-এর পদ এর দৃষ্টান্ত) তানসেন তার অন্যতম উদ্গাতা। তানসেনের পদ ভারতীয় চিত্ত থেকেই রস গ্রহণ করেছে।

সুরস্রষ্টা তানসেন

ধ্রুপদ রচনায় যাঁরা ছিলেন তানসেনের পূর্বসূরী তাঁদের বিশেষ নজর ছিল শব্দ ও ছন্দের ওপরে। কিন্তু তানসেন শব্দ ও ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-কে বজায় রেখেও বিশেষ নজর দিলেন সুর ও সুর-মাধুর্যের দিকে।

প্রাচীন ভারতের প্রবন্ধ সংগীতের আধারেই ধ্রুপদের সৃষ্টি। কিন্তু ধ্রুপদ সংগীত নিছক প্রাচীনের সংরক্ষণ বা অন্ধ-অনুকরণ মাত্র ছিল না। তা যদি হ'ত তবে ধ্রুপদের এত প্রসার ঘটত না। তানসেনের ধ্রুপদ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ধ্রুপদ তানসেনের পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের সময়েই এই সংগীতের প্রসার ঘটে। কিন্তু তানসেনের সময়ে ধ্রুপদের নবজন্মলাভ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রভাব বাংলার উদ্বেলিত জাতীয় চিত্তে রস সঞ্চার ক'রে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এই ষোড়শ শতাব্দী। এই শতাব্দীতে ভক্তিবাদ শুধু জনজীবনেই নবজাগরণ আনলো না—অনুরূপভাবে মুসলমান প্রভাবে সুরেব ক্ষেত্রেও নবজাগবণ এলো। এই কাজ সুরু হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খসরুর দ্বারা—তানসেনে আমরা সেই সমন্বয়ের ধারার এক উজ্জল রূপের প্রকাশ দেখতে পেলাম।

হিন্দু সংগীতের অন্যতম দিকপাল হরিদাস স্বামীর শিষ্য তানসেন। এই হরিদাস স্বামীর মত আর একজন লোককে রাজা মানসিংহ শ্রদ্ধা করতেন। এঁর নাম মহম্মদ গওস্। ইনি পারস্য সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। এই মহম্মদ গওস্-এর কাছেও তানসেন পারস্য সংগীত শিক্ষা করেন। ফলে একদিকে হরিদাস স্বামী ও অপর দিকে মহম্মদ গওসের শিক্ষার সমন্বয় ক'রে তানসেন এক অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তানসেন যে সব অভিনব রাগরাগিণী সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে—দরবারী কানাড়া, দরবারী কল্যাণ, দরবারী আসাবরী, দরবারী টোড়ী, শাহানা, মিঞাকী সারং, মিঞাকী মল্লার, মিঞাকি জয়জয়ন্তী প্রভৃতি। এ সব রাগই প্রাচীন সংগীত ও পারস্য সংগীতের ঢঙে মিশ্রিত। তা ছাড়া তাঁর ধ্রুপদে কথার বাহুল্যের পরিবর্তে তানের বাহুল্য এবং মীড়ের কাজ—এ সবই গোয়ালিয়রেব সাধনার ফল। গোয়ালিয়রেই তাঁর সংগীত সাধনার প্রথম প্রকাশ আকবরের দরবারে তার পূর্ণ বিকাশ। তানসেন পদ বাহুল্যের পরিবর্তে তানের প্রয়োগ বেশী করেছেন। নিজে তিনি গৌড়বাণী প্রয়োগ করেছেন বেশী। তাঁর পূর্বের ধ্রুপদ রচয়িতাগণ শব্দ ও ছন্দের ওপরে বিশেষ নজর দিয়েছেন—কিন্তু তানসেন তার সঙ্গে সুর

মাধুর্যের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর ধ্রুপদ এবং আলাপ গায়ন পদ্ধতিতে আলংকারিক প্রয়োগের বিশেষত্ব আছে। তাঁর গানে আশ্, মীড়, গমক, ও মূর্চ্ছনার প্রয়োগ পরবর্তী যুগের ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির পূর্বাভাষ বলা যায়। ধ্রুপদের পর ধামারের ভাব, সুর রচনা, লীলায়িত ছন্দ এবং আলংকারিক প্রয়োগ ধ্রুপদও খেয়ালের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। তাই বলা যায় যে তানসেন ভারতীয় সংগীতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছেন।

তানসেন দরবার থেকে দীর্ঘদিনের জন্য বিদায় নিয়ে সারা ভারত পরিক্রমার দ্বারা ভারতীয় সংগীতের আত্মা ও রসের সন্ধান করেন। নানা দেশের দেশীয় সংগীত, পল্লী সংগীতের মধুর রূপ এবং প্রকৃতির সুর-ঝংকার এই ভাবে তাঁর গানে দানা বাঁধতে থাকে এবং তা হয়ে ওঠে মাধুর্যমণ্ডিত। এই অভিনব সুষমা ও মাধুর্যমণ্ডিত সুরলহরী ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

তানসেনের সংগীতকে ঘিরে অনেক রকম অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে যেটি সবচেয়ে প্রচলিত তা হচ্ছে তার 'দীপক' রাগিণী সম্পর্কিত। 'দীপক' রাগ গাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ জ্বলে উঠতো; এমনকি সভায় একবার নাকি দাউ দাউ ক'রে আগুনও জ্বলে উঠেছিল এবং তিনি নিজে সেই আগুনে দগ্ধ হয়েছিলেন। তানসেন দুহিতা সরস্বতী এবং সাধিকা রূপবতী মেঘমল্লার গেয়ে বর্ষা ধারায় তানসেনের দগ্ধ দেহ শীতল করেন ('হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান', পৃঃ ২৬-২৭)। এই কিম্বদন্তীর সত্যাসত্য বিচার না ক'রে মোটামুটী বলা যায় যে তানসেন কত বড় গায়ক ছিলেন এটা প্রমাণের জন্য এই ধরণের কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তানসেন প্রচলিত 'দীপক' রাগের আমূল পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তিত 'দীপক' রাগ সেনী ঘরণাির নিজস্ব সম্পত্তি। অন্যান্য রাগ শিক্ষার পর এই ঘরণার গায়কদের এই রাগ শিক্ষা দেওয়ার কথা আজও প্রচলিত আছে।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য এবং তা হচ্ছে এই যে তানসেন ধ্রুপদের নানাদিকে নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তিনি উচ্চমানের গায়ক হিসাবে পরিগণিত হলেও সংগীত নায়ক হিসাবে তাঁর সমসাময়িক যুগে স্বীকৃতি পাননি।

গায়ক হিসাবেই তানসেনের প্রসিদ্ধি কিন্তু যন্ত্রসংগীতেও তাঁর অবদান কম নয়। তাঁকে রবাব যন্ত্রের উদ্ভাবক বলা হয়।[১] এটি মুসলমানী বাদ্যযন্ত্র। এই

১। Herbert A. Popley, 'The Music of India', Calcutta (1950) P. 18.

যন্ত্রে ভারতীয় স্বর বৈচিত্র্য-কে তানসেন ফুটিয়ে তোলেন। তার ফলে রবার অন্যতম সংগীতযন্ত্র হিসাবে পরিচিত হয়। Popley বলেছেন "The great Tānsen played this instrument. It is a handsome instrument and has a very pleasing tone, somewhat fuller than that of the Sārangi."[১]

তানসেন 'রাগমালা' এবং 'সংগীতসার' নামে দু'খানি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। তানসেন যখন আকবরের সভায় ছিলেন সেই সময় 'রাগমালা' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

ধ্রুপদের চারটি বাণী

আকবরের সময়ে আমরা ধ্রুপদ সংগীতের চারটী বাণীর পরিচয় পাই। এই চারটী বাণী হল –(১) গৌড়হার বা গৌড়ী, (২) খাণ্ডার, (৩) ডাগুর বা ডাগর এবং (৪) নৌহার।

'মাদনুল মুসিকী' নামক সংগীত গ্রন্থ রচয়িতা হাকিম মহম্মদ এই চারটী বাণীর উদ্ভাবকগণের সম্বন্ধে লিখেছেন :—

আকবর বাদশাহের দরবারে তখন চারজন মহাগুণী বাস করতেন। তাঁদের নাম হল :—

(১) তানসেন—গোয়ালিয়র নিবাসী। তাঁর পিতার নাম মকরন্দ। তানসেন বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে তানসেনের জন্ম হয়।

(২) ব্রিজচন্দ—ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। দিল্লীর নিকটবর্তী ডাগুর গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল।

(৩) রাজা সমোখন সিংহ—রাজপুত ছিলেন। তিনি ছিলেন বীণাবাদক। তিনি খাণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

(৪) শ্রীচন্দ—জাতিতে রাজপুত। নৌহার নামক স্থানের অধিবাসী

আকবরের সময়ে এই চারজন চারটী বাণীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেজন্য তাঁর বাণীর নাম ছিল 'গৌড়ী' অথবা 'গৌড়হার' বাণী। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক সমোখন সিংহ তানসেনের কণ্যাকে বিবাহ করায় তাঁর নূতন নাম হয় নবাৎ খাঁ। নবাৎ খাঁ-র বাসস্থান ছিল খাণ্ডার। তাই

১। Ibid, P. 115.

তাঁর বাণীর নাম হয় 'খাণ্ডার' বাণী। ব্রিজচন্দের বাসস্থানের নাম অনুযায়ী তাঁর বাণীর নাম হয় 'ডাগুর' বাণী। রাজপুত শ্রীচন্দ নৌহারের অধিবাসী ছিলেন তাই তাঁর বাণীকে বলা হয় 'নৌহার' বাণী।

বিভিন্ন বাণীর উদ্ভাবক এবং তাঁরা কোন অঞ্চলের অধিবাসী এ নিয়ে কিছু কিছু মত পার্থক্য আছে। যেমন ডাগর বাণীর উদ্ভাবক ব্রিজচন্দ-কে হাকিম মহম্মদ বলেছেন দিল্লার নিকটবর্তী ডাগর গ্রামের অধিবাসী। আবার কেউ কেউ বলেছেন তিনি রাজপুতনার অন্তর্গত ডাগর-এর অধিবাসী। আবার শ্রীচন্দকে কেউ বলেছেন রাজপুত, কেউ বলেছেন তিনি দিল্লী প্রদেশের অন্তর্গত নৌহার-এর অধিবাসী। কেউ কেউ আবার নৌহার বাণীর উদ্ভাবক হিসাবে মোগল দরবারের গায়ক সুজন খাঁ নৌহারের নাম করেছেন।

এই চার বাণী-র মধ্যে গৌড়ী বাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রসাদ গুণ। এই বাণী শান্ত রসের উদ্দীপক। এর গতি ধীর। অন্যদিকে খাণ্ডার বাণী তীব্র রস উদ্দীপক। এর গতি খুব বিলম্বিত নয়। বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য প্রকাশই এর বিশেষত্ব। ডাগর বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সারল্য ও লালিত্য। এর গতি সহজ ও সরল। নৌহার রীতি আশ্চর্য রসোদ্দীপক এবং এর গতি খানিকটা দ্রুত। এক সুর থেকে দু'তিনটী সুর অতিক্রম ক'রে পরবর্তী সুরে যাওয়া এর লক্ষণ।

যাকে শুদ্ধ বাণী বলা হয় তা গৌড়ী ও ডাগুর বা ডাগর বাণীরই নামান্তর। খাণ্ডার বাণী যদি শুদ্ধ বাণীর গতি ও ছন্দ না ভেঙে চলে তা হ'লে তা'তে সুরের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাণীগুলি সংহত হলেও চার বাণীর মধ্যে গৌড়ী বাণীকে রাজা, ডাগর বাণীকে মন্ত্রী, খাণ্ডার-কে সেনাপতি এবং নৌহার ভৃত্যের স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

গৌড়ী বাণী এবং ডাগুর বাণী শুদ্ধ বাণীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত 'ভিন্না রীতি'-ই খাণ্ডার বাণী। এই বাণীতে সুরগুলি গাওয়া হয় কেটে কেটে। সুর প্রয়োগের বক্রতা এই বাণীতে আনে বৈচিত্র্য ও মাধুর্য। সূক্ষ্ম মধুর গমক সহযোগে এই বাণীতে গান গাওয়া হয়। তবে গমকের উৎকট প্রয়োগ এই বাণী-র বিকৃতি ঘটায়। সূক্ষ্ম গমক ও শ্রুতি প্রয়োগ দ্বারা খাণ্ডার বাণীতে যথেষ্ট মধুর রস সৃষ্টি করে গেছেন তানসেন বংশীয় বীণকারগণ।

এখানে চারটী বাণীর চারটী গান পর পর স্বরলিপি সহ উদ্ধৃত করা হলো :

গৌড়হার বাণী

বিলাসখানি টোড়ী। চৌতাল

স্থায়ী— প্রেমনগর বৃন্দাবন আনন্দধাম।
মহাতীর্থ ভকতনকে গগণ পবন মধুর মধুর॥

অন্তরা—হরিনারায়ণ কৃষ্ণ নারায়ণী রাধিকা।
যুগল রূপ করে বিচরণ অতি মনোহর॥

সঞ্চারী—গোপীজন বল্লভ শ্রীরাধামাধব।
লীলা রচে নব নব ঘনশ্যাম সুন্দর।

আভোগ—কৃষ্ণ মন্ত্র সাধক জন গায়ে সদা নাম গান।
দরশন পাওনকে ধায়ে অন্তর॥

৩ ৪
সা ঋা | জ্ঞা পা I
প্রে ০ ০ ম

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
II দা মা | মা মা | ঋা ঋজ্ঞা | ঋা সা | সা দ্া | সা সা I
ন ০ গ র বৃ ন্দা০ ব ন আ ০ ০ ন

I ঋা সা | সা ঋা | জ্ঞা জ্ঞা | সা ঋা | -জ্ঞা পা | -া পা I
০ ন্দ ধা ০ ০ ম ম হা ০ তী ০ র্থ

I দা দা | না দা | মা মা | -দা র্সা | র্ঋা ণা | দা মা I
ভ ক ত ন ০ কে গ গ ন প ব ন

I জ্ঞা ঋা | -জ্ঞা জ্ঞা | ঋা ঋা | -সা সা | সা -ঋা | -জ্ঞা পা II
ম ধু ০ র ম ধু ০ র প্রে ০ ০ ম

II জ্ঞা পা | দা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | -া র্ঋা | -র্সা -র্সা I
হ রি না ০ রা ০ য় ণ | ০ কৃ ০ ষ্ণ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

I র্সা র্ঋা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা | -া -া II
না ০ রা ০ য় ণী রা ০ ধি কা ০ ০

I পা দা | র্সা র্সা | র্ঋা র্সা | র্ঋা ণা | দা মা | মা মা I
যু গ ল রূ ০ প ক রে বি চ র ণ

I জ্ঞা পা | দা মা | ঋা জ্ঞা | ঋা সা | সা ঋা | জ্ঞা পা II
অ তি ০ ম ন ০ হ র প্রে ০ ০ ম

II জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা | ঋা জ্ঞা | ঋা সা | সা ণা I
গো ০ পী ০ জ ন ব ০ ০ ল্ল ০ ভ

I সা ঋা | ন্া দ্া | সা সা | সা ঋা | সা জ্ঞা | -া -া I
শ্রী ০ রা ০ ধা ০ মা ০ ধ ব ০ ০

I সা ঋা | জ্ঞা পা | পা পা | দা দা | ণা দা | মা মা I
লী লা ০ র ০ চে ন ব ০ ন ০ ব

I দা ণা | র্ঋা ণা | -দা মা | জ্ঞা ঋা | জ্ঞা ঋা | সা সা I
ঘ ন শ্যা ০ ০ ম সু ০ ন্ দ ০ র

I জ্ঞা পা | দা র্সা | র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | র্ঋা র্সা I
কৃ ০ ষ্ণ ম ০ ন্ত্র সা ০ ধ ক জ ন

I র্সা -র্ঋা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | -া র্জ্ঞা | র্ঋা -া | র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা র্সা I
গা ০ য়ে স ০ দা না ০ ম গা ০ ন

I দা র্সা | -া র্সা | র্ঋা র্সা | র্ঋা ণা | দা মা | মা মা I
দ র ০ শ ০ ন পা ও য়া না ০ কে

I জ্ঞা পা | দা -মা | জ্ঞঋা জ্ঞা | ঋা সা | সা -ঋা | জ্ঞা পা II II
ধা ০ য়ে ০ অ ন ০ ন্ত র প্রে ০ ০ ম

খাণ্ডার বাণী

মিঞা মল্লার। চৌতাল

স্থায়ী— বরখা ঋতু আয়ে শ্রাবণ মে।
দেখ বরষত চার প্রহর
চউদিশ ঘন ঘোর॥

অন্তরা— প্রবল মেঘ দল বেগ চলে।
দমকত চমকত দামিনী
গরজত ঘন ঘন॥

সঞ্চারী— বহত পবন জোর জোর
দেখ গগন ভয়ঙ্কর
কাঁপত সব জীব জীবন॥

আভোগ— তরুবর পর কোয়েলিয়া
বৈঠ রহত বোল না বোলে।
রবি শশী নেহি গগনমে শোভে॥

৩ ৪
ণমঃ পঃ I
ব০ র

১´ ০ ২ ৩ ৩ ৭
II র্রা র্রা | র্সা রনা | র্সা র্সা | ণপা ণপা | মজ্ঞা মরা | সা সা I
খা ০ ০ ঋতু আ য়ে শ্রা০ ০০ ব ০ ০ণ মে ০

I রা সা | ণ্ধ্া ণ্ধ্া | না সা | রা পা | মজ্ঞা মরা | সা সা I
দে খো ব ০ র ০ ০ ষত চা ০ র ০ ০প্র হ র

I মা ণা | ধা ণধা | ণা পা | র্সা মজ্ঞা | মা রা | মা ণমঃ পঃ II
চ উ ০ দি০ ০ শ ঘন ঘো০ ০ ০ র ব ০ র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

II মপা ণা | পা ণা | পা মপা | ণধা ণধা | না না | র্সা া I
প্রব ০ লমে ০ ঘ দল বে০ ০০ ০ গচ লে ০

I র্জ্ঞা র্মা | র্মা র্রা | র্জ্ঞা র্সা | র্সা র্সর্রা | সা র্না | র্সা র্সা I
দম ০ কত চম ০ কত দা ০ ৪ ০ মি০ ০ নী

I ণধা ণধা | ণধা ণধা | ণা পা | পা র্সা | জ্ঞা মা | রসা ণপঃ র্সঃ II
গ০ র০ ০০ জ০ ০ ত ০ ঘন ঘ ০ ০ন ব ০ র

II সা সা | সা সা | ণা ধা | ণধা ণা | পা ণমা | পা পা I
ব হ ত প ০ বন জো০ ০ র জো০ ০ র

I মা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞমা | পা ণপা | জ্ঞা জ্ঞা | মা রা | জ্ঞরা সা I
দে ০ খো গ০ ০ গন ভ য় ০ ক্ষ ০০ র

II ণ্ধ্া ণ্ধ্া | ণ্ধ্া ন্া | সা সা | রা পা | পা জ্ঞা | মা রসা I
কাঁ০ ০ ০ প ০ ৩ ০ সব জী ০ ব জী ০ বন

I মা পা | পা ণধা | ণা পা | ণধা ণধা | না না | র্সা -া I
ত রু ব র০ ০ পর কো০ঃ০০ ০ য়েলি য়া ০

I র্সা র্সা | র্রা র্রা | র্রা র্রা | র্পা র্পা | র্মর্জ্ঞা র্মা | র্রা র্সা I
বৈ ০ ঠ র ০ হত বো ০ ল০ না বো লে

I ণধা ণধা | ণধা ণধা | ণপা র্সা | জ্ঞা জ্ঞা | মা রা | সা ণমঃ র্সঃ II II
র০ বি০ শ০ শী০ ০ ০ নেহি গ গন মে শো ভে ব০ র

ডাগর বাণী

মালকোষ। চৌতাল

স্থায়ী— এ মহামায়া দয়া না হোতা মো পর।
কেয়া কিয়া কসুর তেরো চরণ পর ॥
অন্তরা— তুহি ব্রহ্ম সনাতনী ত্রিজগতকে জননী
মহাশক্তি দে মা তু ইহ জীবন পর ॥
সঞ্চারী— পরমেশ্বরী নাম ধরত পরমজ্ঞান দায়িণী।
কহত তিন লোক তেরো মহিমা অপার ॥
আভোগ— করুণা কর করুণাময়ী সন্তানকে ভরসা মায়ি
সদা ভক্ত বৎসল কর রে উদ্ধার ॥

সা́ সা́ । ।ধমা I
এ ০ ০ মহা

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

II মা দজ্ঞা | মা মা | জ্ঞা জ্ঞা | মা মা | জ্ঞা জ্ঞা | সা সা I
মা০০ ০ য়া দ য়া ০ না হো০ ০ তা০

I দণ্‌ন্‌ সা | মা মা | জ্ঞমা ণা | -া ণা | দা দা | ণদা মা I
মো০ ০ ০ পর কেয়া ০ ০ কিয়া ক সু ০ ০ র

I সা́ ণা | দা দা | ণদা মা | জ্ঞমা জ্ঞসা | সা́ সা́ | -া দমা II
তে ০ ০রো চ ০০ রণ প০ ০ র এ ০ ০ মহা

II জ্ঞা মা | দা ণা | সা́ সা́ | ণা সা́ | -া জ্ঞ́ণা | সা́ সা́ I
তু ০ হি ব্র ০ হ্ম স না ০ ত০ ০ নী

I দা দা | দা দা | ণা ণা | ণা দসা́ | ণা দা | মা মা I
ত্রি জ গ ত ০ কে ০ জন নী ০ ০'০

১´ ০ ৩ ০ ০ ৪

I দা ণা | র্সা জ্ঞা | জ্ঞা র্সা | র্মা জ্ঞা | র্সা র্সা | -া র্সা I
ম হা ০ শ ক্ তি দে ০ ০ মা ০ তু

I সা র্সা | ণা দা | মা মা | জ্ঞমা জ্ঞসা | র্সা র্সা | -া দমা II
ইঁ হ জী ০ ব ন প ০ ০ র এ ০ ০ মহা

II সা সা | মা মা | মা মা | মা -া | মা মা | দা মা I
প র মে ০ শ্ব রী না ০ ম ধ র ত

I জ্ঞা মা | ণা ণা | ণা ণা | দা দা | ণা দা | মা মা I
প র ম জ্ঞা ০ ণ দা ০ ০ য়ি ০ নী

I সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | দা দা | ণা দা | মা মা I
ক হ ত ˜০ তি ন লো ০ ০ ০ ০ ক

I মা র্সা | ণা দা | মা মা | জ্ঞা জ্ঞা | মা জ্ঞা | সা সা I
তে ০ রো ম হি মা অ পা ০ ০ ০ র

I জ্ঞা মা | ণা দা | দা দণা | ণা র্সা | জ্ঞ´ণা র্সা | র্সা র্সা I
ক রু ণা ০ ০ করো ক রু ণা ০ ০ ম য়ী

I দা দা | দা ণা | ণা ণা | -া দর্সা | ণা দা | মা মা I
স ন্ তা ন ০ কে ০ ভর সা মা ০ য়ি

I দা ণা | র্সা জ্ঞা | জ্ঞা র্সজ্ঞা | র্মা জ্ঞা | র্সা র্সা | -া -া I
স দা ০ ভ ক্ ত০ ব ৎ স ল ০ ০

I সা র্সা | ণা দা | মা মা | জ্ঞমা জ্ঞসা | র্সা র্সা | -া ণদা IIII
ক রো রে ০ উ ০ দ্ধা০ ০র এ ০ ০ মহা

মৌহার বাণী

বাহার। চৌতাল

স্থায়ী— বোল রহে ঘনশ্যাম
ঘন ঘন মুরলীয়া বাজাওয়াত।
শ্রীরাধিকা নাম লিয়ে
শুনায়ে রাগ রঙ্গ ভরি॥

অন্তরা— মনোহর লেত রাগ বাহার
সব ছোড়্‌কে ধায়ে যমুনা কিনার।
ভুল গয়ি সব খান পান ঘরকি কাম
বৃন্দাবন কি সব নরনারী॥

সঞ্চারী— গোকুল কি গোপাল যশোদা কি লাল
পালক হ্যায় জগত সংসার।
জগদীশ্বর জগন্নাথ
অতি দয়াল ভকত বৎসল॥

আভোগ— সব জন গায়ে গোবিন্দ নাম
ত্যজ আয়ে হরি গোলকধাম
কংস ঘাতক দেবকীনন্দন
জয় জয় নারায়ণ শ্রীরাধাপতি ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥

০ ৩ ৪
র্সা ধা | ণপা মা | মা ণধা I
বোল ০ রহে ০ ঘন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II র্সা র্সা | জ্ঞমা রসা | জ্ঞমা ণধা | ণা পা | না না | র্সার্সা I
শ্যা ম ঘ ন ঘন মু ০ রলী য়া ০ বা জা ও য়াত

I র্সা র্রা | র্সা র্রা | র্সা নর্সা | ধণা পমা | জ্ঞা জ্ঞমা | রা সা I
শ্রী রা ধিকা না ম লিয়ে ০০ ০ ০ শুনা ০০ য়ে ০

I মা মা | ণধা ণধা | ধা নর্সা | র্সা ধা | ণপা মা | মা ণধা II
রা গ র ০ ঙ্গ০ ০ ভরি বো ল ০ র হে ০ ঘ ন

II মা ণধা | র্সা -া | -া র্সা | ণধা ণধা | ণমা ণধা | র্সা র্সা I
মন হর লে ০ ০ ত রা০ ০০ ০০ গবা হা র

১ ০ ২ ০ ৩ ৪

I র্সা র্রা | র্সা র্রা | র্সা না | র্সনা র্সধা | ণা পমা | মা মা I
সব ছোড়কে ধা য়ে যমু না০ ০০ ০ কিনা ০ র

I র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্মা র্রা | র্সা র্সা | ণা ণা | ধা ধনা | র্সা র্সা I
ভূ লগ য়ি ০ ০ সব খা ০ ০ নপা ০ ন

I ণপ মপা | জ্ঞা জ্ঞমা | রা সা | সা মা | মা মপা | মপা -া I
ঘর কি০ কা ০ ০ ০ ম বৃ ন্দা ০ ব ন কি ০

I মা ণধা | না -া | র্সা র্সা | র্সা ধা | ণপা মা | মা ণধা II
সব নর না ০ ০ স্বী বো ল ০ র হে ০ ঘন

II মা মা | মা মা | পা পা | ণপা মপা | জ্ঞা জ্ঞমা | রা সা I
গো কু ল কিগো পা ল যশো দা কি লা ০ ০ ০ ল

I সা সা | ধ্‌া ণ্‌প্‌া | ম্‌া ম্‌া | ণ্‌া ণ্‌ধ্‌া | সা সা | সা সা I
পা ০ ল ০ ক হ্যা য় জগ তস ং ও সা র

I সা মা | মা মা | -া মা | মা মা | পা জ্ঞা | জ্ঞা মা I
জগ দী ০ শ্ব ০ র জ গ ০ ন্না ০ থ

I ধা ধা | ধণা ধা | ণা পা | জ্ঞা জ্ঞা | মা রা | জ্ঞা সা I
অ তি দ০ য়া ০ ল ভ ক ত ব ৎ সল

I মা ণধা | র্সা -া | -া র্সা | ণধা ণধা | ণমা ণধা | র্সা র্সা I
সব জন গা ০ ০ য়ে গো০ বি০ ০০ ০ন্দ না ম

I র্সা র্রা । র্সা -া | ণা নর্সা | নর্সা র্রর্সা | ধণা পা | মা মা I
ত্যজ আ য়ে ০ ০ হরি গো০ লক ধা০ ০ ০ ম

I র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্মা | র্রা র্সা | ধণা পমা ⁞ ণধা না | র্সা র্সা I
ক ং সঘা ০ ভ ন দে০ বকী ন০ ০ ন্দ ন

I ণপা মপা | জ্ঞা জ্ঞমা | রা সা | সা -া | মা মা | পা -া I
জয় জয় না ০ ০ রা য়ণ শ্রী ০ রা ধাপ তি ০

I মা ণা | ধা ধা | না র্সা | র্সা ধা ! ণপা মা | মা ণধা II II
ত্রিভ ০ ঙ্গি ম ঠা ম বো ল ০র হে ০ ঘন

সাধারণত এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে আকবরের রাজত্ব কালেই এই বাণীগুলির উদ্ভব হয়। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কতটা সত্যতা আছে তা পর্যালোচনার বিষয়। কারণ বিভিন্ন ধরণের গীতি প্রচলন মতঙ্গের (৫ম-৭ম শতাব্দী) পূর্বেই ছিল। মতঙ্গ, পার্শ্বদেব ও শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি তাঁদের গ্রন্থ 'বৃহদ্দেশী', 'সংগীত-সময়-সার' এবং 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে ঐ সব গীতির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। মতঙ্গ বলেছেন সাত প্রকারের গীতির (রাগগীতি) প্রচলন ছিল। সেগুলি হচ্ছে শুদ্ধা, ভিন্না অথবা ভিন্নকা, গৌড়ী অথবা গৌড়ীকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা এবং বিভাষা। এই রাগগীতিগুলির নামকরণ হয়েছিল তাদের রাগ অনুসারে। এই রাগগীতিগুলির বিশেষ ধরণের গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি যখন গাওয়া হ'ত তখন বিভিন্ন গায়ন শৈলী বিকশিত হ'ত। এই বিভিন্ন গায়ন শৈলীকেই বর্তমানের বিভিন্ন রীতি বলে গ্রহণ করা চলে। যাষ্টিকের মত অনুসারে রাগগীতির সংখ্যা পাঁচ এবং সেগুলি হচ্ছে—শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী অথবা গৌড় এবং সাধারিত অথবা সাধারণী। দুর্গাশক্তি তিন প্রকার রাগগীতির কথা বলেছেন এবং শার্দুল একটি মাত্র রাগগীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই সব উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচীন রাগগীতি এমন কি গ্রাম-রাগগীতিও বিভিন্ন রীতিতে গাওয়া হ'ত।

মতঙ্গ এবং শার্ঙ্গদেব তাঁদের উল্লিখিত ৭ অথবা ৫টী রাগগীতির যে পরিচয় দিয়েছেন তা মোটামুটি এই :

(১) শুদ্ধা রাগগীতির স্বর, ঋজু কোমল এবং মধুর হ'ত।

(২) ভিন্না রাগগীতির স্বর বক্র; কিন্তু এতে থাকতো সূক্ষ্ম এবং গমকের তান মাধুর্য।

(৩) গৌড়ী রাগগীতিতে ব্যবহৃত স্বরগুলি কম্পন অথবা গমক সহযোগে স্থির ওজন রক্ষা ক'রে তিনটী সপ্তকের মধ্যে বার বার ঘোরাফেরা ক'রত।

(৪) বেসরা রাগগীতির স্বরগুলি দ্রুত লয়ে এবং দ্রুততর কম্পন সহযোগে ব্যবহৃত হ'ত।

(৫) সাধারণী রাগগীতি-র নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অপর চারটী রাগগীতির মিশ্রণে এই রাগগীতি সৃষ্ট হ'ত।

(৬) ভাষা রাগগীতি-র স্বরগুলি মিষ্ট। এগুলি স্পর্শ স্বর এবং কাকু সহযোগে গাওয়া হ'ত।

(৭) বিভাষা রাগগীতি-র স্বরগুলি ছিল স্নিগ্ধ এবং আনন্দদায়ক। এই

রাগগীতিতে ব্যবহৃত স্বরগুলি তিনটী সপ্তকের মধ্যে বিচরণ ক'রত। এর স্বরগুলি বিভিন্ন গমক সহযোগে গাওয়া হ'ত।[১]

'বিভিন্ন রাগ (অর্থাৎ গ্রামরাগ) এই সব রাগগীতি থেকেই উৎপন্ন হয় এবং এটা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, যে রাগগুলি (গ্রাম-রাগগুলি) পরবর্তী কালে সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি রাগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে গাওয়া হ'ত।[২]

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রবন্ধ গীতির বিভিন্ন পদ্ধতিতে গাওয়ার রীতি ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কিছু নূতন আবিষ্কার নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে পরবর্তী কালে যে বাণীগুলি সৃষ্টি হয় সেগুলি প্রাচীন যুগের রীতিকে ভিত্তি ক'রে।

এ প্রসঙ্গে কুমার B. K. Roychaudhury মহাশয়ের পর্যালোচনা এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন যে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদের আমরা চারটী বাণীর নাম পাই। এই বাণীগুলি ধ্রুবপদ গায়ন রীতি নির্দেশ করে। গৌড়ীয় বাণী শাস্ত্রীয় শুদ্ধাগীতির অনুরূপ। এতে রাগের আঙ্গিক অনুসারে ঋজু মীড়ের টান থাকে। যদিও মিঞা তানসেন অন্য রীতিগুলি জানতেন; কিন্তু তিনি গৌড়হার বাণীতে সবচেয়ে বেশী দক্ষ ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ-র শিষ্য মহলে প্রধানত এই রীতি অনুসরণ করা হ'ত। অনুরূপভাবে ডাগর বাণী ভিন্না গীতির মত। এতে মিষ্টি এবং সূক্ষ্ম গমকের সঙ্গে বক্ররেখার মীড়ের কাজ থাকতো। ডাগর বাণী খুব মাধুর্যপূর্ণ এবং বলা হয়ে থাকে যে বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্যেরা এবং তানসেনের কন্যা সরস্বতী দেবী এই রীতিতে গান গাইতেন। সরস্বতী দেবীর স্বামী মিশ্রী সিং একজন বিখ্যাত বীণাবাদক ছিলেন। খাণ্ডার বাণী শাস্ত্রীয় বেসরা গীতির মত। এতে থাকতো দ্রুত গমকের কাজ। বলা হয়ে থাকে যে ধ্রুবপদের এই বাণী অনুসরণ করতেন বাজবহাদুর এবং মিশ্রী সিং-ও তাঁর বীণা বাদ্যে এই রীতি অনুসরণ করতেন। পরবর্তীকালে মিশ্রী সিং-এর উত্তরাধিকারীরা ডাগর বাণী এবং খাণ্ডার বাণী এই দুই রীতিতেই গান গাইতেন। নৌহার বাণী শাস্ত্রীয় গৌড়ী গীতির মত। এতে ছুট্ অলংকার থাকতো। এই বাণীতে স্বরগুলি বিভিন্ন গমক সহযোগে উল্লম্ফন রীতিতে ব্যবহৃত হ'ত।

কুমার রায়চৌধুরী আরও বলেছেন যে, ধ্রুবপদের বিভিন্ন রাগের বিশেষ বিশেষ

১। 'বৃহদ্দেশী' (ত্রিবাঙ্কুর সংস্করণ)। পৃঃ ৮২-৮৪

২। Swami Prajnanananda, 'A Historical study of Indian Music Calcutta (1965). P. 185.

ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ নির্দেশ এবং শব্দের সুর নির্দেশ ক'রত। বলা হয়ে থাকে যে সুমধুর গৌড়হার বাণী প্রশান্ত ভাবাবেগ এবং শান্ত রস সৃষ্টি করে; ডাগর বাণী সৃষ্টি ক'রে মধুর রস এবং করুণ রস; খাণ্ডার বাণী সৃষ্টি করে বীর রস এবং নৌহার বাণী সৃষ্টি করে অদ্ভুত রস।[১]

নবাৎখাঁ-তানতরঙ্গ-বিলাস খাঁ

'মাদনুল মুসিকী' নামক সংগীত গ্রন্থ প্রণেতা হাকিম মহম্মদ রাজা সমোখন সিংকে খাণ্ডার-বাণীর জনক আখ্যা দিয়েছেন। আজমীর সিংহল গড়ের ক্ষত্রিয় নৃপতি এই সমোখন সিং-এর পুত্র মিশ্রী সিং সংগীত জগতে নবাৎ খাঁ নামে পরিচিত। তানসেনের কন্যা সরস্বতীকে তিনি বিবাহ করেন এবং এই সূত্রেই তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সুপণ্ডিত সুদর্শনাচার্য শাস্ত্রী লিখেছেন, "তানসেনজীকে জামাতা নবাৎ খাঁজী(মিশ্রী সিংজী) বীণাবাদনমে শ্রীহরিদাস স্বামীজীকে শিষ্য থে। য়ে বীণামে বড়ে প্রধান য়ে শরীরমে বড়ে বলিষ্ঠ থে। নবাৎ খাঁজী জাতি প্রথম হিন্দু থে পিছে বিবাহকি কারণ মুসলমান হুয়ে। নবাৎ খাঁজী জামাতা হোনেকে কারণ তানসেনজীকে পুত্রতুল্য হী থে ইস্‌সে সম্ভব হ্যায় কি ইন্‌কো কুছ শিক্ষা তানসেনজীসে ভি প্রাপ্ত হুই, তো ভি য়ে প্রাধান্যসে বীণামে শ্রীহরিদাস স্বামীজীকে শিষ্য থে বীণাকে অদ্বিতীয় ওস্তাদ হুয়ে। ইন্‌কো খাণ্ডারে গোত থে।"

মিশ্রী সিং-এর মুসলমানী নাম নবাৎ খাঁ (মিশ্রী=নবাৎ, সিংহ=খাঁ)। ইনি তানসেনের সংগীত সাধনায় যোগ্য সহযোগী ছিলেন। বীণা বাদনে তিনি যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তেমনি তাঁর বংশের সংগীত সাধকেরা বীণা বাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিকে এই বীণা বাদনে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য তাঁর বংশ যেমন বীণকার বংশ নামে পরিচিত, তেমনি তানসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হেতু তাঁর বংশও সেনী নামে পরিচিত।

নবাৎ খাঁ প্রাচীন পদ্ধতিতেই বীণা বাজাতেন। কিন্তু তানসেনের নূতন গায়নরীতির সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে তাঁর বীণা বাদনেও স্বভাবতই নবীনত্ব এসেছিল।

আকবরের রাজসভায় যে ছাত্রিশজন সংগীতজ্ঞের পরিচয় আবুল ফজল দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আমরা পাই তানতরঙ্গ খাঁ-কে। এঁকে মিঞা তানসেনের পুত্র এবং

১। B. K. Roychaudhury, 'Hindustani Music and Mian Tansen' Calcutta, P. 6-9.

কণ্ঠ সংগীত শিল্পী হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আবুল ফজলের গ্রন্থে তানসেনের অন্যতম পুত্র হিসাবে বিলাস খাঁ-এর নামেরও উল্লেখ আছে। এছাড়া শরৎ সেন, সুরৎ সেন এই দুই নামে তানসেনের দুই পুত্র ছিল—তানসেনের জীবনীকারেরা এই কথা লিখেছেন। কেউ কেউ তানতরঙ্গ খাঁকে তরঙ্গ সেনও বলতে চেয়েছেন। আবার তাঁর রচিত গানের ভনিতায় 'তানতরঙ্গ' নামই আছে। যেমন—

পটমঞ্জরী। সুরফাক্তা

ধীরে ধীরে কান্‌হ সীখোপর গৃহ আবন।
হোঁ তো অবহী জার কহোঁগী
নন্দরায় সোঁ য়হ বিধতেঁ হমকো চলাবন।
কৈসে ছলবল বালক কর
ভেখ ধরো জব বামন।
তানতরঙ্গ-প্রভু ঐসী হোঁ ন গবাঁর,
তুম মোই লাগে বৌরাবন॥

তানসেনের পুত্রদের মধ্যে শরৎ সেনের কোনও সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুরৎ সেন প্রাচীন প্রবন্ধ সংগীতের চর্চা করতেন ব'লে জানা যায়। তানতরঙ্গ অবশ্য ধ্রুপদ গানে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি আকবরের রাজসভায় অন্যতম সংগীতজ্ঞ হিসাবে স্থান লাভ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে তানতরঙ্গ ছিলেন কণ্ঠ সংগীত শিল্পী; যন্ত্রের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল না। অন্যদিকে বিলাস খাঁ কণ্ঠ সংগীত শিল্পী হলেও তাঁর বংশে যন্ত্র একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এই যন্ত্র হ'ল 'রবাব'। অন্যদিকে তানসেনের কন্যা বংশ অর্থাৎ নবাৎ খাঁ-সরস্বতীর বংশ বীণকার বংশ ব'লে পরিচিত। তানসেনের শিষ্যরা রবাবী বংশ এবং বীণকার বংশ হিসাবেই নিজেদের বিভক্ত করেছেন।[১]

১। "The disciples of Tānsen divided themselves into two groups, the Rabābiyārs and the Binkārs. The former used the new instrument invented by TānSen, the rabab; while the latter used the bin, as the vina is called in the north." Herbert A. Popley, The Music of India,' Calcutta (1951), pp 17-18.

তানতরঙ্গের মত বিলাস খাঁ-ও তানসেনের কাছ থেকেই সংগীত শিক্ষা করেন। এঁদের গান যেমন ভগবৎ বিষয়ক গান তেমনি রাজ-প্রশংসাসূচক গান। এখানে বিলাস খাঁ রচিত ভগবৎ বিষয়ক একটী গান উদ্ধৃত করছি—

সুরট। চৌতাল

মেরে তো হরিনামকো অধার, জিন রচ্যো সংসার,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ জঞ্জার।
জিন রচ্যো অরস কুরস, জিমী আসমান
নিরঞ্জন নিরঙ্কার সাঁচী কৌঁন সেবো পরবরদিগার।
কাহেকুঁ হুজ্যে গুণহগার, কাহেকু লীজ্যে এতো ভার,
সোই সবাদ কৌঁন তজিয়ে জাকো নাম গুণাগার।
প্রভু বিলাস কহে পাক্ সাফ বছিয়ে
তয়ার জনম জীতর নহি বার বার॥

আকবরের রাজসভায় সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সংগীত শুরু করলেও বিলাস খাঁ খ্যাতি লাভ করেন জাহাঙ্গীরের সময়ে (১৬০৫-১৬২৭)। জাহাঙ্গীরের দরবারে তিনি প্রধান সংগীতজ্ঞের পদলাভ করেন। বিলাস খাঁ সম্বন্ধে বলা হ'য়ে থাকে যে তিনি সংসার সম্পর্কে প্রায় উদাসীন ছিলেন এবং অর্থ, প্রতিপত্তি কোন দিকেই তাঁর খেয়াল ছিল না। কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে বিলাস খাঁ-এর প্রসিদ্ধি উপেক্ষা করবার নয়। তিনি বিলাসখানী টোড়ী, বিলাসখানী কল্যান প্রভৃতি নূতন রাগ বিন্যাস করেন। বিলাস খাঁ-এর সবচেয়ে বেশী খ্যাতি যে বিলাসখানি টোড়ীর জন্য, তার একটী উদাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ১১১-১২)।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল (১৬০৫-১৬২৭)

আকবরের সময়ে যে সমস্ত সংগীতজ্ঞ ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমরা জাহাঙ্গীরের দরবারেও দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে একজন রঙ্গ খাঁ। এঁর অপর নাম দৈরং খাঁ। ইনি ধ্রুপদ সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। প্রায় আশি বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। এই সময়ের আর একজন সংগীতজ্ঞ বিলাস খাঁ। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে যে লাল খাঁ-র কথা আছে তিনি বিলাস খাঁ-র জামাতা। তিনি শৈশব থেকেই তানসেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লাল খাঁ-র চার পুত্রের মধ্যে খুশাল খাঁ এবং বিশ্রাম খাঁ পিতার ধ্রুপদের ঐতিহ্য রক্ষা ক'রে চলেছিলেন। খুশাল খাঁ (খুশ্ হাল খাঁ) ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ইনি টোড়ী

রাগ পরিবেশনে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর ভাই বিশ্রাম খাঁ শাহজাহানের দরবারে শ্রেষ্ঠ গায়কের আসন অধিকার করেছিলেন।

গুণ সেন, সুরৎ সেন—এঁরা দুজনও জাহাঙ্গীরের দরবারে ছিলেন। এঁদের রচিত গান থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আকবরের সময় থেকে বাদশাহদের গুণগান ক'রে গান রচনার একটা রেওয়াজ চলে আসছিল। সুরৎ সেন এবং গুণসেন জাহাঙ্গীরের বন্দনা ক'রে গান গেয়েছেন—এমন কি খুশাল শা,-এই ভনিতায় সংগীত বিরোধী ঔরঙ্গজেবের গুণগানও করা হয়েছে।

শাহজাহানের রাজত্বকাল (১৬২৭-১৬৩৮)

শাহজাহানের শাসনকালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। মুঘল শাসনের গরিমা এই যুগেই সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই যুগে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব তেমন তীব্র ছিল না : বহিরাক্রমণের সম্ভাবনাও কমে গিয়েছিল এবং বহির্বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটছিল। এই যুগ জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের যুগ। এই যুগের স্থাপত্য শিল্প আজও বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই যুগে সংগীতের অবশ্য উল্লেখযোগ্য নূতন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। তবে আগের যুগের কয়েকজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এই যুগে বেঁচে ছিলেন। অর্থাৎ লাল খাঁ, খুশাল খাঁ, বিশ্রাম খাঁ, রঙ্গ খাঁ, জগন্নাথ কবিরায়, গুণ সেন প্রভৃতিতো ছিলেনই, এছাড়াও ছিলেন আরও অনেক সংগীতজ্ঞ ; যেমন শেখ বহাউদ্দীন, শের মহম্মদ, মিঞা ডালু ঢাঢ়ী, সবাৎ খাঁ ঢাঢ়ী প্রভৃতি।

আবদুল হামিদ লাহরি তাঁর 'বাদশাহ নামা' গ্রন্থে শাহজাহান-এর রাজত্ব কালের সংগীত চর্চ্চার বিবরণ দিয়েছেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণের পরে পরেই (১৬২৭ খৃঃ) লাল খাঁ কলাবন্তকে সম্মানিত করেন। সেই সময়ে লাল খাঁ একজন বিখ্যাতি সংগীতজ্ঞ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ধ্রুপদ গানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শাহজাহান তাঁকে 'গুণসমুদ্র' উপাধি দান করেন। এই সময়ে জগন্নাথ কবিরায় জাহাঙ্গীরের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠি সংগীতজ্ঞ।

জগন্নাথ কবিরায়

ফকীরুল্লা তাঁর 'রাগদর্পণ'-এ তাঁর সমসাময়িক যে সব সংগীতজ্ঞের নাম উল্লেখ করেছেন জগন্নাথ তাঁদের অন্যতম। ইনি শাহজাহানের দরবারে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন এবং এই দরবারেই তিনি 'কবিরায়' উপাধি লাভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর জন্ম। তানসেন যখন খ্যাতির উচ্চশিখরে তখন

তাঁর বয়স খুবই অল্প এবং সংগীত চর্চায় সবে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি তানসেনকে 'নট' রাগে ধ্রুপদ গেয়ে শুনিয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ফকীরুল্লার 'রাগদর্পণ' থেকে জানা যায় যে তানসেন সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'এ যদি বেঁচে থাকে এবং এর এই সম্ভাবনা যদি পরিণতি লাভ করে তা হ'লে সংগীত জগতে আমার পরেই হ'বে এর স্থান।' তিনি ধ্রুপদ গাইতেন। গানে তিনি শাহজাহানের গুণকীর্তন করেছেন। তিনি প্রায় একশত বছর বেঁচে ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে এঁর জন্ম এবং ইনি বেঁচে ছিলেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সুরু হবারও দু' বছর পর পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

শেখ বহাউদ্দীন

অভিজাত ঘরের সন্তান বহাউদ্দীন প্রথম জীবনে শাহজাহানের শিকারের সঙ্গী ছিলেন এবং এই পশু শিকারই তাঁর মনে পরিবর্তন আনে। তিনি সন্ন্যাসী হ'য়ে যান। দীর্ঘ পঁচিশ বছর নানা স্থান পর্যটনের পর তিনি নিজ গ্রামে (দোয়াবের অন্তর্গত ঝিনঝিনা পরগণার বারনাওয়া গ্রামে) ফিরে যান। এই সন্ন্যাস জীবনে তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে পারদর্শিতা লাভ করেন। প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলেই তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি গীত, ধ্রুপদ, এবং খেয়াল গান রচনা করতেন এবং নিজে গাইতেন। 'চুটকলা' রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি রবাব, বীণা বাদনে দক্ষ ছিলেন। তিনি 'খেয়াল' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রও আবিষ্কার করেন। ১৭শ শতকের শেষে পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেখ শের মহম্মদ

শেখ বহাউদ্দীনের মতই সংসার ত্যাগ ক'রে তাঁরই সঙ্গে দেশ পর্যটনে বের হ'ন শেখ শের মহম্মদ। তাঁর সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন শেখ নাসিরুদ্দিন। তিনি ধ্রুপদ গাইলেও 'চুট্‌কলা' খেয়াল ও তারাণাতেই বেশী দক্ষ ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে পাটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সুরদাস—বিধর্মী পাখোয়াজী সুরদাস আকবরের সময়ের লোক। মিঞা তানসেনের সঙ্গে তিনি সঙ্গৎ করেছিলেন। ফকীরুল্লাও তাঁকে দেখেছিলেন। তিনি প্রায় একশো বছর বেঁচে ছিলেন।

শাহজাহানের রাজত্বে আরও দুজন গুণীর সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের নাম

ফকিরুল্লা মনে রাখতে পারেননি। তাঁরা দক্ষ সুর্ণা বা সানাইবাদক ছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক সংগীতশিল্পী ছিলেন যাঁরা শাহজাহানের সামনে আসেননি। ফকীল্লাও তাঁদের দেখেননি।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭)

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল বিস্তৃত। এই যুগ থেকেই মুঘল-গরিমা অন্তর্হিত হ'তে থাকে। এই সময় ধর্মীয়-নীতি, রাজপুত নীতির পরিবর্তন হ'তে থাকে। শাসন শক্তির সঙ্গে জনসাধারণের বিছিন্নতা ঘটে। ঔরঙ্গজেব নানা দিকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার জন্য যে শিল্প কলার প্রতি উদাসীন হয়েছিলেন তা নয়। তাঁর চরিত্রই ছিল শিল্প কলা বিমুখী।

ঔরঙ্গজেবের সময় সংগীতের উন্নতি হয়নি। তাঁর সময়ে কিন্তু দুখানি বিখ্যাত সংগীত-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের শাসন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সইফ খান ফকীরুল্লা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে 'রাগদর্পণ' রচনা করেন এবং সংগীত বিদ্বেষী সম্রাটকেই গ্রন্থখান উৎসর্গ করেন। ফকীরুল্লাকে যখন কাশ্মীরের গভর্ণর ক'রে দেওয়া হয় সেই সময়েই এই গ্রন্থটি রচিত হয়। এই গ্রন্থ যদিও 'মান কুতুহল' গ্রন্থের পারসী অনুবাদ তথাপি এই গ্রন্থে সে যুগের সংগীত সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, এবং অন্যান্য যে সমস্ত গান তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বারোয়া রাগের ঠুংরী পারস্যের মুজাদাত এবং বারুয়ার অনুরূপ।

ঔরঙ্গজেবের সময়ে লেখা আর একখানি সংগীত-গ্রন্থের নাম 'তুফাৎ-উল-হিন্দ'। এটী রাগদর্পণের নয় দশ বছর পরে লেখা হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা মীর্জা খাঁ বা ইবন ফকরুদ্দিন মহম্মদ রাজপরিবারের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে রাগ রাগিণীর চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ভাগে গীতিকার ও নানারূপ গীতের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে মীর্জা খাঁ বলেছেন, "এর কয়েকটি প্রকারভেদ বর্তমান। যাঁরা প্রাচীন সংগীতে অভিজ্ঞ তাঁরা এটি গেয়ে থাকেন। এটি প্রাকৃত ভাষায় গাওয়া হয়। আজকালকার ভাষায় একে বলে পাতালবাণী। ব্রজভাষায় একে নাগবাণী বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ হচ্ছে—ধ্রুপদ। এটি চারটী তুকে নিবদ্ধ। এই তুকগুলির নাম হচ্ছে—আস্থল (স্থায়ী)। একে পিড়াবন্দাও বলা হয়। দ্বিতীয়টিকে অন্তরা বলে। পরের দুটি তুককে ভোগ বলা হয়; সাধারণ্যে এটি

আভোগ নামে পরিচিত এবং গোয়ালিয়রের রাজা মান এটি রচনা করেন। ধ্রুপদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুই তুকের ধ্রুপদকে তিউট বলেন।"[১]

আগের যুগের গায়কদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গায়ক ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালেও বেঁচে ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহম্মদ বার্কী।—ইনি ধ্রুপদ সংগীতে নিপুণ ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বেঁচে ছিলেন। খুশাল খাঁ-ও ঔরঙ্গজেবের সময় বেঁচে ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে সমস্ত সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ দেওয়া হ'ল।

(১) মিঞা ডালু (দামু) ঢাঢ়ী—তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গায়ক। ফকীরুল্লা লিখেছেন যে, এঁর মত ধ্রুপদ তিনি আর কারও কাছে শোনেননি। ইনি বাদ্যযন্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। আকবরাবাদে এঁর মৃত্যু হয়।

(২) মিসির মন্‌জন্ ঢাঢ়ী—বিলাস খাঁ-র শিষ্যদের অন্যতম মিসির মন্‌জন্ ঢাঢ়ীর সমকক্ষ সংগীতজ্ঞ খুব কমই ছিলেন। ইনি সুন্দর গীত রচয়িতা ছিলেন।

(৩) সবাৎ (সওয়াদ) খাঁ ঢাঢ়ী—তিনি ফতেপুরের অন্তর্গত ঝুনঝুনওয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একাধারে উত্তম গায়ক ও গীত রচয়িতা ছিলেন।

(৪) ওয়ালী ঢাঢ়ী—তিনি উত্তম গায়ক ছিলেন। অকবরাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৫) রহীম দাস ঢাঢ়ী—গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মার্গসংগীতে তাঁর জ্ঞান ছিল এবং তিনি মার্গসংগীতও গাইতেন। ফকীরুল্লার সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন।

(৬) করজুৎ ঢাড়ী—ফুলওয়ারের অধিবাসী ছিলেন। সংগীতজ্ঞ হিসাবে তিনি উচ্চসম্মানের অধিকারী হ'ন।

(৭) সালিহ্ রব্বানী ঢাঢ়ী—তিনি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে রাজধানীতে তাঁর যথেষ্ট পসার ছিল।

(৮) ইলাহ্‌দাদ ঢাঢ়ী—তিনি ছিলেন জলন্ধরের অন্তর্গত একটী গ্রামের অধিবাসী। তিনি সারেঙ্গী বাজাতেন।

(৯) তাহীর ঢাঢ়ী—তিনি খঞ্জরী বাদক ছিলেন। হোলিগানে এই বাদ্যযন্ত্রের বিশেষভাবে ব্যবহার হয়। ফকীরুল্লা বলেছেন যে, তিনি এঁর মত আর কারও বাজনা শোনেননি।

১। রাজ্যেশ্বর মিত্র—'মুঘল যুগের সংগীত চিন্তা', কলিকাতা (১৩৭১) পৃঃ ৯৫-৯৬

(১০) ফিরোজ ঢাঢ়ী—তিনি লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাখোয়াজ বাজাতেন। তাঁর নিখুঁত বাজনা শ্রোতাদের মোহিত ক'রে রাখতো।

(১১) মিশ্রী খাঁ ঢাঢ়ী—বিলাস খাঁ-র ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৭শ শতাব্দীতে শাহ সুজার সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন গুণ খাঁ কলাবন্ত। তাঁরা দু'জনেই ধ্রুপদ রচনা করতে ও গাইতে পারতেন। গুণ খাঁ সংস্কৃত প্রবন্ধ গানও গাইতেন। বাংলাদেশে এঁরা কাউকে সে যুগে গান শিখিয়েছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেনী ধ্রুপদ রীতি বিষ্ণুপুরে প্রচলিত হবার বহু পূর্বে বাংলাদেশে এসেছিল।

(১) গুণ সেন—তিনি নায়ক ভানুর পৌত্র। ১৬শ শতকের শেষের দিকে তাঁর জন্ম হয়। গুণসেনের মুসলমানী নাম নায়ক আফজল। তিনি কাশ্মীরে বাস করতেন এবং সেখানেই মারা যান। গুণ সেন মার্গ সংগীতের তত্ত্বে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ধ্রুপদ গান গাইতে ও রচনা করতে পারতেন।

(২) সুখর (সুঘর) সেন—তিনি বায়োজিদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি সুন্দরভাবে রবাব বাজাতে পারতেন।

(৩) সুবল সেন ও তাঁর পুত্র হমীর সেন--উভয়েই উত্তম ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে এঁদের মৃত্যু হয়।

(৪) সুদেস সেন বা সুধীন সেন—সুবল সেনের আর এক পুত্রের নাম সুদেস সেন বা সুধীন সেন। সুধীন সেনও গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি উচ্চস্তরের গান রচনা করতে পারতেন। তিনি ফকীরুল্লার সঙ্গে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে চলে যান।

(৫) সুবল সেন—তানসেনের পৌত্র এবং সুরত সেনের পুত্র সুবল সেন ১৬শ শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫৫ থেকে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মারা যান। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মীর খাঁ কাওয়াল—দিল্লী নিবাসী মীর খাঁ কাওয়াল উচ্চশ্রেণীর গায়ক ছিলেন। গায়ক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

হুসন্ খাঁ নওয়ার—ইনি পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর জীবিত ছিলেন। ইনিও ছিলেন একজন অতুলনীয় গায়ক।

শেখ কামাল—ইনি মিঞা ডালু (দালু) ঢাঢ়ী-র শিষ্য ছিলেন। সিপাহী-র কাজ করেন। গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ফকীরুল্লার সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছিলেন।

বখ্‌ৎ খাঁ—এই গুজরাটি কলাবন্ত বিলাস খাঁ-র শিষ্য ছিলেন। ইনি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ছিলেন। ধ্রুপদ গান গেয়ে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বেঁচে ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের প্রথম দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘুলাম্‌ মহীউদ্দীন—অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তম সংগীত রচনা করেন।

গুণ খাঁ কলাবন্ত—শাহজাহানের রাজত্বকালে এই সংগীত-শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। সংগীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল। মার্গসংগীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। বাংলা দেশে তাঁর মৃত্যু হয়।

সালিম্‌চান্দ্‌ ডাগর—উচুদরের গাইয়ে ছিলেন। রচনাকার হিসাবেও তাঁর নাম পাওয়া যায়।

শেখ সাদুল্লা লাহোরী—এই অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞানী, সুকণ্ঠ সংগীতজ্ঞ ফকীরুল্লার সঙ্গে থাকতেন। তিনি অতিরিক্ত আফিং সেবন করতেন। ফলে তাঁর বয়স ষাট বছর অতিক্রম ক'রলে তাঁর গান শ্রোতার কাছে আবেদন হারায়।

পূজা—পূজা ছিলেন শেখ্‌ শেব মহম্মদ-এর ভাই। তিনি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ছিলেন। রচনাকার হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেননি। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে রাজধানীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ফকীরুল্লার কর্মচারী ছিলেন।

বাজিদ্‌ খাঁ (নওছাওরী কলাবন্ত)—উঁচুদরের গায়ক ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে মারা যান।

রাওরা কাওয়াল্‌—গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি পঞ্চাশ, ষাট বছর বেঁচে ছিলেন।

কবীর্‌ কাওয়াল—সুকণ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শেখ্‌ শের্‌ মহম্মদের শিষ্য। খেয়াল গানে তিনি নবীন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

মালতীরাম কলাবন্ত—মালতীরাম কলাবন্ত ছিলেন বিধর্মী। তিনি পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বেঁচে ছিলেন।

ধরমদাস কলাবন্ত—বিধর্মী ধরমদাস কলাবন্ত উচুদরের গায়ক ছিলেন। তিনি কর্মজীবন ত্যাগ করেন। তিনি সাধুর মত জীবন যাপন করতে থাকেন। এই অবস্থায় পরিণত বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঈদল সিং—ঈদল সিং ছিলেন খড়্গপুর-এর (বিহারের অন্তর্গত) শাসনকর্তা। ইনি ছিলেন রাজা রোজ আফ্‌জুন-এর পুত্র এবং রাজারাম সাহার পৌত্র। ঈদল সিং নিজে দৌলৎ আফ্‌জুন্ খেতাব অর্জন করেন। ফকীরল্লার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। ফকীরুল্লা তাঁর অতুলনীয় সংগীত শুনেছিলেন। আমীর খসরু অথবা সুলতান হুসেন শর্কীর সমতুল্য জ্ঞানী ছিলেন ঈদল সিং। তিনি শ্রুতিমধুর খেয়াল ও তারাণা রচনা করেন।

মীর ইমাদ্—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তিনি সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তি'ন হিরাতের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

রসীদ্ খাঁ নওহার—সুজান খাঁ-এর পৌত্র রসীদ্ খাঁ নওহার দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। ফকীরল্লা-র সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন। ধ্রুপদ গানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। পণ্ডিত হিসাবে তাঁকে আমীর খসরুর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সৈয়দ্ তবীব্ (তাখাল্লুস্ বা ছদ্মনাম বুধ্)—ঝারসা পরগণা নিবাসী সৈয়দ্ তবীব্-এর কণ্ঠস্বর খুব ভালো ছিল না। কিন্তু রাজধানীর গায়কদের মধ্যে তাঁর গানের উচ্চারণ অর্থাৎ 'বাণী' ভালো ছিল। জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত সংগীত শিল্পী হিসাবে আকবরাবাদে তিনি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিলেন।

সুন্দর ঘুন্—বিধর্মী সুন্দর ঘুন্ ভালই গান করতেন। সংগীত রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরস নৈন—এঁর নাম ছিল "হয়া.''। জাহাঙ্গীরের দরবারে অল্প বয়সেই তিনি বাদক রূপে স্বীকৃতি পান। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ফকীরুল্লার সঙ্গে ছিলেন।

রসবীন খাঁ—শাহজাহানের দরবারে তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বীণকার। রসবীণ খাঁ-এর প্রকৃত নাম ছিল 'মহম্মদ'।

বায়েজিদ্ রব্‌বাণী—দক্ষ বাদক ছিলেন। তিনি অত্যধিক মদ্য পান করতেন। সেজন্য তিনি বেশী দিন বাঁচতে পারেননি।

মৃদঙ্গ রায়—বিধর্মী কৃপায়ী-র খেতাব হল মৃদঙ্গ রায়। তিনি মার্গসংগীতে পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট তাঁকে পছন্দ ক'রতেন। তৎকালীন বাদকদের মধ্যে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফকীরুল্লার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন।

শিউকী—তিনি তম্বুর (তানপুরা নয়, পারসিক বাদ্য 'তুম্বা-বরাহ') বাদক ছিলেন। এই বাদ্যে কেউ তাঁর সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। হিন্দী এবং ফার্সী দুই ঢঙেই তিনি এই বাজনা বাজাতে পারতেন। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলায় যাকে 'খেয়াল' (হিন্দী এবং উর্দুতে 'খ্যাল') বলা হয় সেই শব্দটী মূলত আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় এর উচ্চারণটা অনেকটা এইরূপ—'খ'য়াল'। কথাটীর অর্থ চিন্তা, কল্পনা, উদ্দাম ভাবনা, মতলব, ঝোঁক প্রভৃতি। খেয়াল গান বলতে সাধারণভাবে আমাদের মনে এমন ধরণের গানের কথা জাগে যা কল্পনাত্মক এবং যা গায়কের যেন মর্জির ওপরে নির্ভর করে। একটী বিশেষ রীতির গানের নাম 'খেয়াল' হওয়ার কারণ বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগের দিক থেকে এটা কল্পনাত্মক। রাগের কাঠামো ছাড়া ধ্রুপদের মত এর দৃঢ় বন্ধন নেই। গানের কাঠামোতে যতদূর সম্ভব স্বরবিস্তার এতে চলে। প্রথমে থাকে কিছু আলাপ; এতে অলংকরণ, কম্পন, গিট্‌কিরি প্রভৃতি চলে—সর্বোপরি চলে তান প্রয়োগ। এতে শিল্পীর স্বাধীনতা বেশী।

সব রকমের বিষয়বস্তুই খেয়ালে গ্রাহ্য : ভক্তিমূলক, বীররসাত্মক, এবং রোমান্টিক। তবে ধ্রুপদে যেমন যুদ্ধ সম্পর্কিত বা বীরত্বব্যঞ্জক বিষয় স্থান পেতে পারে, খেয়ালে ততটা সম্ভব নয়। খেয়ালে গাঢ়বন্ধ কাঠিন্য না থাকার জন্যই তারল্য তার চরিত্র লক্ষণ। খেয়ালের ধর্ম হ'ল তাল বন্ধন থেকে মুক্তি; সুরের রেখায়িত গতি, বিচিত্র সাবলীল প্রবাহ (যাকে বলা হয় তান কর্তব)। ধ্রুপদের সঙ্গে খেয়ালের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে, রাগবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং অলংকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল গানে স্বাধীনতা অনেক বেশী। দিলীপকুমার রায়ের ভাষায় বলতে গেলে, খেয়ালে রয়েছে "ধ্রুপদী স্থাপত্যের শাসন অগ্রাহ্য ক'রে সুরের ফুলনিকুঞ্জ, লতাবিতান রচনা করার প্রয়াস; লতাফুল কখনো হয় প্রগল্‌ভ কখনো বা স্বল্পবাক্। তাই কোনো খেয়ালে তান বেশী, কোনো খেয়ালে কম। ওযে খামখেয়ালী এটা ভুললে তো চলবে না।" এই কারণেই খেয়ালের নামকরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিলীপকুমার রায় বলেছেন, "ধ্রুপদে রাগবিস্তারের পদ্ধতি ছিল ধরাবাঁধা। তাল ছন্দও ছিল প্রধানত গাম্ভীর্যমুখী। খেয়ালের ঔদার্যগুণে তালের এই বজ্র আঁটুনি থেকে রাগ পেল অব্যাহতি। তাই বোধ হয় ক্রোধন ধ্রুপদী পিতা কুলাঙ্গার সন্তানের এহেন নামকরণ করেন।"[১]

১। দিলীপকুমার রায়, 'সাঙ্গীতিকী', কলিকাতা (১৯৩৮) পৃঃ ৪৯

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত। খেয়াল গান বলতে অনেকে সম্পূর্ণ নূতন একপ্রকার গায়ন-রীতি মনে করেন এবং মনে করেন যে এটা বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অনেকে সোজাসুজি কোনো এক ব্যক্তিকে খেয়াল গানের উদ্ভাবক ব'লে ঘোষণা ক'রে দেন। এইভাবে আমীর খসরু, হুসেন শাহ শর্কী এবং সদারঙ্গ প্রত্যেকেই খেয়াল গানের উদ্ভাবক ব'লে প্রচারিত হয়েছেন। এই ধরণের মতবাদ যাঁরা প্রচার করেছেন তাঁরা ভুলে গেছেন যে কোনো বিশেষ গায়ন-রীতি হঠাৎ একদিন কোনো ব্যক্তি উদ্ভব ঘটাতে পারেন না। তাছাড়া খেয়াল ভারতীয় সংগীতের অন্যতম একটী রীতি হিসাবে ভারতের বিরাট সংগীত ঐতিহ্যের ভূমিকাকে অস্বীকার করেও দাঁড়াতে পারে না।

এই কথা মনে রেখে খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা যাচ্ছে :

(১) খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে একটী মতবাদ হ'ল এই যে, আলিজাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত 'কৈবাড়' নামক প্রবন্ধ থেকে খেয়াল উদ্ভূত হয়েছে।

(২) খেয়ালের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত এই যে, খেয়ালের উৎসমুখে রয়েছে একতালী এবং রাসক প্রবন্ধ।

(৩) কেউ কেউ বলেন শার্ঙ্গদেব তাঁর সংগীতরত্নাকরে যে শাস্ত্রীয় আক্ষিপ্তিকার বর্ণনা দিয়েছেন (এই আক্ষিপ্তিকা দক্ষিণ ভারতের 'পল্লবী'-র অনুরূপ) তা থেকেই খেয়ালের উদ্ভব ঘটেছে।

(৪) কেউ কেউ বলেন যে সুরেলা শব্দ-গঠন এবং অলংকরণ প্রবণতার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে।

(৫) খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতটী সব চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা হচ্ছে এই যে, কাওয়ালী বা কাব্বালি গানের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে। এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা বলেন যে, সুলতান আলাউদ্দিন এবং আমীর খসরু-র পূর্বে উত্তর ভারতে কাওয়াল[১] বা কাব্বাল নামক একদল যাযাবর গায়ক সম্প্রদায় ছিল। এরা 'কাওয়ালী' নামক প্রেম-ভক্তি মূলক আঞ্চলিক গীতি গাইতো। এই কাওয়ালী থেকেই 'খেয়াল' বা 'খ্যাল' সৃষ্টি হয়।

১। "দিল্লীর নিকটায় 'কাবাল' (কাওয়াল) নামক সংগীত ব্যবসায়ী এক জাতি ছিল খেয়াল তাদের জাতীয় গান। এরা সর্বদা যে ভাল গান গায় তার নাম কাওয়ালী রাখা হয়েছে।"— কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গীতসূত্রসার', কলিকাতা (১৮৮৫)।

এবার একে একে খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতগুলি পর্যালোচনা করা যাক :

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে একটী মতবাদ হ'ল এই যে আলিজাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত 'কৈবাড়' নামক প্রবন্ধ থেকে 'খেয়াল' উদ্ভূত হয়েছে। এতে ছিল তিনটী সংগীতাংশ (ধাতু) এবং এটী তিন 'অঙ্গ' বিশিষ্ট ভাবনী জাতীয়। 'সংগীত রত্নাকর' থেকে জানা যায় যে, এই প্রবন্ধে পাটাক্ষর দ্বারা উদ্গ্রাহ্ এবং ধ্রুবের অনুষ্ঠান হয়। 'কৈবাড়' শব্দটী সম্বন্ধে কল্লিনাথ টীকায় বলেছেন—"কৈবাড় ইতি করপাট প্রধানত্বাত্তদ্ভবোঽপভ্রংশপদেনেয়ং সংজ্ঞা।" এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, মূলত শব্দটী ছিল 'করপাট'। এই সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে কৈবাট>কৈবাড় হয়েছে। মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে এই গীতের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে :

অক্ষরৈর্গীয়তে সম্যক পাটৈরেব হি কেবলৈঃ।
কৈবাট ইতি স জ্ঞেয়ো গন্ধর্বৈস্তাল সংযুতঃ।।

—অর্থাৎ পাটাক্ষর সহযোগে গান্ধর্বতালে যে গীতি অনুষ্ঠিত হয় তাকে 'কৈবাট' বলে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ঘনশ্যাম দাস (নরহরি চক্রবর্তী) কর্তৃক সংকলিত 'সংগীতসার সংগ্রহ' গ্রন্থে 'কায়বলি' নামীয় গীতের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা এই :

এভ্যোঽন্যো কায়বালাখ্যঃ স এবাদৌ নিরুচ্যতে।
যতস্তালাঃ প্রকাশ্যন্তে পাটনাত্রেণ কেবলম্।।
পদানাং কল্পনাভোগে কায়বাল স ঈর্য্যতে।
উদাহরণন্তু গীত প্রকাশে মৃগ্যম্।।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কায়বাল নামীয় গীতে পাট বা বাদ্যাক্ষর দ্বারা তাল প্রকাশ করা হতো এবং আভোগ অংশে পদাদির কল্পনা করা হতো। কৈবাড় প্রবন্ধের লক্ষণের সঙ্গে এই লক্ষণের মিল রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বেঙ্কটমখি তাঁর 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা' (১৬২০) গ্রন্থের প্রবন্ধ প্রকরণে বলেছেন যে, তাঁর সময়ে এক গায়ক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল ; এঁরা আভোগটীকে পৃথকভাবে যোজনা ক'রে এক ধরণের প্রবন্ধ গাইতেন। আভোগটীকে দু'টী ভাগ ক'রে তার প্রথম অর্ধটী তালবর্জিত আলাপের মত গাওয়া হ'ত, দ্বিতীয় অর্ধটী তালযুক্ত ক'রে গাওয়া হ'ত। 'কৈবাড়' জাতীয় প্রবন্ধে এই প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হ'ত। এই সমস্ত আলোচনার

ওপরে ভিত্তি করে মন্তব্য করা হয়েছে—"এই সমস্ত বর্ণনা থেকে এইটী মনে হয় যে, এই কৈবাড়ই খেয়ালের আদিরূপ এবং পরিবর্তনটী এইভাবে হয়েছে— করপাট>কৈবাট>কৈবাড়>কায়বাল>খয়াল বা খেয়াল।"[১]

সিংহভূপালও বলেছেন যে, যে প্রবন্ধে পাট, অক্ষর, এবং ধ্রুবা ও উদ্‌গ্রাহ এই দুই ধাতু থাকে, এবং গ্রহ যেখানে উদ্‌গ্রাহ-তে শেষ হয় তাকেই কৈবাড় বলে :

পাটাক্ষরৈর-ধ্রুবোদগ্রাহৌ কর্তব্যৌ।
গ্রহ উদগ্রাহে সমাপ্তিরস্য সা কৈবাড়ঃ ॥

কৈবাড় দু'শ্রেণীর—সার্থক এবং অনর্থক। কল্লিনাথ কৈবাড় প্রবন্ধকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—সার্থকশুদ্ধকৈবাড়, অর্থহীনশুদ্ধকৈবাড়, সার্থকমিশ্রকৈবাড় এবং অর্থহীনমিশ্রকৈবাড়। শেষোক্ত একটি কি দুটি শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনটি ক'রে সংগীতাংশ (ধাতু) এবং তিনটি অঙ্গ (পাট, পদ, তাল) এবং এগুলি ভাবনী জাতীয় : "পাটপদতালবদ্ধস্ত্বাত্রঙ্গো ভাবনীজাতিমান"। ভাবনী জাতি সম্পর্কে সিংহভূপাল বলেছেন, "ত্রিভিরঙ্গৈ-রূপনিবদ্ধ ভাবনী"—অর্থাৎ ভাবনী তিনটি অঙ্গে রূপ-নিবদ্ধ।

আমরা সংগীতরত্নাকরে কিন্তু দেখতে পাই যে সাধারণ কৈবাড় প্রবন্ধের দুটী অঙ্গ; কিন্তু মিশ্র জাতীয় কৈবাড় তা নয়। সুতরাং বলা যায় যে কৈবাড় প্রবন্ধ খেয়ালের উৎস নয়।

'খেয়াল'-এর উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত হৈএষ, খেয়াল-এর উৎস মুখে রয়েছে 'একতালী' এবং 'রাসক' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ দুটী শুদ্ধসূড়-এর অন্তর্গত। 'রাসক' প্রবন্ধ 'ঝোম্বরা'র মত অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহের প্রথমার্ধটী দু'বার এবং পরের অর্ধটী একবার গাওয়া হয়—তবে এটী গমকস্থান বর্জিত অর্থাৎ সম্ভবত মেলাপক বর্জিত। এটী রাস তালে গাইবার রীতি। 'রাসক' সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা এইরূপ :

ভজতে রাসকঃ সোহয়ং রাসতালেন গীয়তে।
গণৈর্বর্ণৈশ্চ মাত্রাভিঃ কোচিদেনং ত্রিধা জগুঃ।।
স্যাদ্রাসবলয়ো হংসতিলকো রতিরঙ্গকঃ।
চতুর্থস্তত্র মদনাবতারশ্ছগণাদিজঃ ॥

এই রাসক প্রবন্ধ দ্বি অঙ্গ বিশিষ্ট তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। 'একতালী'

১। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'সংগীত সমীক্ষা', কলিকাতা (১৩৬৬), পৃঃ ১৭৫

প্রবন্ধের উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব অংশটী পুনরায় গাইবার পর গীত শেষ হয়। এটীও মেলাপক বর্জিত দ্বি-অঙ্গ বিশিষ্ট 'তারাবলী' জাতীয় প্রবন্ধ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র দুটী ধাতু থাকলেই তা খেয়াল গান হয় না।

খেয়ালের উৎস সম্পর্কে তৃতীয় মত হচ্ছে যে, আক্ষিপ্তিকা খেয়ালের উৎস। নিবদ্ধ শ্রেণীর আক্ষিপ্তিকা স্বর এবং পদ সমন্বিত।

খেয়াল গানের বৈশিষ্ট্য হ'ল পদের সঙ্গে এবং তালের সঙ্গে বিস্তার থাকে। আক্ষিপ্তিকায় গায়ন পদ্ধতিও এইরূপ :

চঞ্চৎপুটাদি তালেন মার্গত্রয় বিভূষিতা :
আক্ষিপ্তিকা স্বরপদ গ্রথিতা কথিতা বধৈঃ ।।
নোক্তে করণ বর্তি ন্যৌ প্রবন্ধান্তর গতেরিত ?
মতঙ্গাদি মতাদ্ক্রেমৌ ভাষাদিষ্বেব রূপকম ।।
(সংগীতরত্নাকর—রাগবিবেকাধ্যায় ২৬, ২৭)

এই আক্ষিপ্তিকার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের পল্লবী-র সাদৃশ্য রয়েছে। এ সম্পর্কে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের N. S. Ramchandran তাঁর 'Ragas of Carnatic Music' গ্রন্থে লিখেছেন, "Sarangadeva defines 'Aksiptika' as made up of swaras and padas, sung according to Chanchatputa and other talas and adorned by the Mārgas. The "Pallavi' receives similar treatment at the present day. Kallinatha states that it is a variety of nibaddhagita. In it any one of the Mārga talas is applied. In this is used one of the three Mārgas viz, chitra etc. and this is sung according to the rules applicable to Jatis. The swaras sa, ri etc. and words are arranged in it. Because the padas and talas are thrown up as it were, it is named Aksiptika. This is so considered by Matanga and others.

দেখা যাচ্ছে পদ ও তালের ক্ষেপণ অর্থে আক্ষিপ্তিকার মত খেয়ালও তাল ও মাত্রায় নিবদ্ধ, মার্গশ্রেণীর তাল আক্ষিপ্তিকায় ব্যবহৃত হয়। এই আক্ষিপ্তিকার সঙ্গে কিন্তু আলাপ এবং 'রূপক'-এর পার্থক্য আছে—একথা টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন। এই রূপককেই খেয়ালের অগ্রদূত বলা যায়। আক্ষিপ্তিকা থেকে খেয়াল গানের উদ্ভব হয়েছে—একথা বলা ঠিক নয়।

সংগীত রত্নাকর-এ রূপক প্রবন্ধের পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে—

গুণান্বিতং দোষহীনং নবং রূপকমুত্তমম্।
রাগেন ধাতুমাতুভ্যাং তথা তাললয়োড়ুবৈঃ ॥
নূতনৈ রূপকং নূতনং রাগঃ স্থায়ান্তরৈর্ণবঃ।
ধাতুরাগাংশভেদেন মাতোস্ত নবতা ভবেৎ ॥
প্রতিপাদ্য বিশেষেণ রসালঙ্কার ভেদতঃ।
লয়গ্রহবিশেষেণ তালানাং নবতা মতা ॥
তালবিশ্রামতোহন্যেন বিশ্রামেণ লয়ো নবঃ।
ছন্দগণগ্রহন্যাস প্রবন্ধাবয়বৈর্নবৈঃ ॥

রূপক প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর নূতনত্ব। শার্ঙ্গদেব মোটামুটিভাবে যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, এই নূতন ধরণের রূপক একটি দোষহীন ও গুণান্বিত গীতি, নূতন নূতন রাগের প্রয়োগে, কলির বিভিন্ন সংস্থানে পদবৈচিত্র্যে এবং তাল ও লয়ের বিচিত্র সমাবেশে এই গীত নূতনরূপে প্রতিভাত হয়। কেবলমাত্র নূতনরাগের প্রয়োগেই নয়, রাগের অবয়বের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে রূপক-কে প্রতিবার নবভাবে রূপায়িত করা হয়। রাগাংশভেদেও নূতনত্ব সম্পাদন করা হয়। এই গীতের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু এবং রসালংকার ভেদে বাক্যাংশেরও নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাল বৈচিত্র্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে দ্রুত, মধ্য বিলম্বিত—এই তিন-প্রকার লয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়, সম, অতীত, অনাগত এই তিন গ্রহের বৈষম্য প্রদর্শিত হয়। তাল বর্জনাদির দ্বারা অপরাপর অবয়বের বিশ্রাম ঘটিয়ে লয়ের নূতনত্ব সৃষ্টি হয়। ছন্দ, গণ-নিয়ম, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করার সুযোগ এই গানে আছে।

খেয়াল এবং রূপক প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা ক'রতে গিয়ে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজংকার বলেছেন, "খেয়াল একটী পার্সী শব্দ এবং আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ দাঁড়ায় কল্পনা, স্বতস্ফূর্ত চিন্তা এবং আমাদের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সংস্কৃত গ্রন্থে যে রূপকম্ জাতীয় গীতের কথা পাওয়া যায় তারই মধ্যে এর বীজ নিহিত।" তাঁর ভাষায় বলতে গেলে, "Roopakam is a musical composition in which there is scope for creating novelty, something original out of the trodden path in the Rāga as well in the wordings of the composition, by emphasising passages which, though ordinarily occurring in the Rāga

being sung, are prominent in some other sympathatic Rāga, by using fresh words expressing some emotion, by making changes in the Tāla and Laya. It may not therefore be too fantastic perhaps to consider the kheyal as an off-shoot of the Roopakam type of musical compositions. Within a short time after Sarangdeva the old system of music was fast receding in the background and a new one in which influence of foreign music was beginning to rush in was coming into vogue".

এ বিষয়ে ঠাকুর জয়দেব সিং নূতন আলোকপাত করেছেন। খেয়ালের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "এরূপ মনে করা হয়ে থাকে যে আমীর খসরু এই রীতির উদ্ভাবক এবং এটী ভারতীয় সংগীতে পূর্বে ছিল না। আমীর খসরু খ্যাতি লাভ করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এমন কোন নিজস্ব গায়নরীতি কি ছিল না যা সব দিক থেকে মাধুর্যময়? শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর' এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই লেখা হয়। আমরা এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাঁর দিকেই দৃষ্টিপাত করবো। শার্ঙ্গদেব পাঁচ রকমের সংগীত রীতির উল্লেখ করেছেন: শুদ্ধা, ভিন্না, গোড়ী, বেসরা এবং সাধারণী। তিনি বলেছেন—

"শুদ্ধা স্যাদবক্রৈর-ললিতৈঃ স্বরৈঃ।
ভিন্না বক্রৈঃ স্বরৈঃ সূক্ষ্মৈর্মধুরৈর্গমকৈর্যুক্তা॥"

ঠাকুর সাহেব বলতে চান যে খেয়াল নূতন রীতির গান নয়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় সাধারণী গীতি থেকে এটা নূতন ক'রে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এব মনোমুগ্ধকর রীতিটি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচলিত রূপকালপ্তি থেকে উদ্ভুত হয়েছে। ঠাকুর সাহেবের নিজের ভাষায় বলতে গেলে, "I maintain that the so called khyāl style of musical composition is nothing but only a natural development of the Sādhārani-giti, which used the exquisite features of all the styles. It is this *S*ādhārani-giti with the predominant use of bhinnā in it that became the khyāl."[১]

ঠাকুর সাহেব কর্তৃক উল্লিখিত 'সাধারণী-গীতি'র কথা আমরা পাই মতঙ্গের

১। 'A Historical Study of Indian Music' গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঠাকুর সাহেবের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ২০৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বৃহদ্দেশী গ্রন্থে। গীতির পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা এই সাতটী গীতির উল্লেখ করেছেন। এই গীতিগুলির গুণ এবং প্রয়োগবিধি পৃথক পৃথক। শার্ঙ্গদেব তাঁর সংগীতরত্নাকরে এই রাগগীতি-গুলির কথা বলেছেন। শার্ঙ্গদেবের উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, ভরতের সময়ও পাঁচটী গীতি বা রাগগীতি সহ গ্রামরাগ প্রচলিত ছিল।

সিংহভূপাল বলেছেন, "গ্রামরাগঃ পঞ্চপ্রকার ভবন্তি
কেন বিশেষেণ তেষাম্ পঞ্চ-প্রকারত্বম্?
অত আহ পঞ্চগীতি সমাশ্রয়াদিতি।"

ভরত চারটী গ্রামরাগের উল্লেখ করেছেন। এগুলি মাগধী, অর্ধ-মাগধী, সম্ভাবিতা এবং পৃথুলা —এই চারটী গীতি সহযোগে প্রয়োগ করা হ'ত।

শার্ঙ্গদেব 'সংগীতরত্নাকর'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে পাঁচটী গীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পাঁচটী গীতির নাম বলেছেন শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, এবং সাধারণী। তাঁর বর্ণনা অনুসারে—

(১) অবক্র এবং ললিতস্বর যুক্ত গীতির নাম শুদ্ধা।

(২) মন্দ্র, মধ্য, তার এই তিন স্থানে পরিব্যাপ্ত, দ্রুত কম্পনযুক্ত, গমক সমন্বিত, অখণ্ডিত স্থিতি, গাঢ়স্বর সম্পন্ন গীতি হ'ল গৌড়ী।

(৩) বেসরা (অথবা বেগস্বরা) স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী—এই চার বর্ণ সমৃদ্ধ এবং আবেগোচ্ছল।

(৪) বক্র, সূক্ষ্ম এবং মধুর স্বরসম্পন্ন গমকযুক্ত গীতি-র নাম ভিন্না।

(৫) উপরোক্ত চার প্রকার গীতির (অর্থাৎ শুদ্ধা, গৌড়ী, বেসরা, ভিন্না) মিশ্রণে যে গীতির সৃষ্টি হয় তার নাম সাধারণী। [সংগীতরত্নাকর, ২য় অধ্যায়]

সাধারণী গীতি ছিল সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর। কারণ অপর চারটী গীতির শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে এই গীতি রচিত। এই গীতি গমক পরিপূর্ণ, শ্রুতি মধুর এবং এর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ভাবাবেগ থাকে। খেয়াল গানে এই সবগুলি গীতির সুন্দর অংশগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সব রকম গমক[১] গ্রহণ করা হয়েছে; খট্কা, মুড়কী, মীড়, কম্প, আন্দোলন—এ সবই সুন্দরভাবে খেয়ালের কাঠামোতে সন্নিবেশিত।

১। সংগীতরত্নাকরে পনের প্রকার গমকের নাম পাওয়া যায়; 'সংগীত পারিজাতে' কুড়িটি গমকের নাম আছে। এবং সেনী ঘরোয়ানায় প্রচলিত গমকের সংখ্যা বাইশ।

এ প্রসঙ্গে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য এবং তা হ'ল এই যে খেয়ালের অলংকরণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় রূপকালপ্তির সাদৃশ্য আছে। শার্ঙ্গদেব তাঁর সংগীত-রত্নাকরের তৃতীয় অধ্যায়ে এই রূপকালপ্তির এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

রূপকস্থেন রাগেণ তালেন চ বিধিয়তে।
যা প্রোক্তা রূপকালপ্তিঃ সা পুনর্দ্বিবিধাভবেৎ ॥

সিংহভূপাল বলেছেন, "প্রবন্ধস্থেন রাগেন তালেনচোপলক্ষিত যা আলপ্তি ক্রিয়তে সা রূপকালপ্তি"। অর্থাৎ প্রবন্ধস্থিত আলপ্তি অথবা আলাপ যখন রাগ এবং তালে আচরিত হয় তাকে রূপকালপ্তি বলে।

রাগের আলাপনের নামই আলপ্তি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন—"রাগালপনমালপ্তিঃ প্রকটীকরণং মতম্"। সিংহভূপাল টীকায় বলেছেন, "যেন স্বরসন্দর্ভেণ রাগঃ প্রকটীক্রিয়তে সা আলপ্তি। সা দ্বিবিধ, রাগালপ্তিঃ রূপকালপ্তিশ্চ। অর্থাৎ যে স্বর সন্দর্ভ দ্বারা রাগ প্রকটীত হয় তার নাম আলপ্তি। আলপ্তি দু'প্রকার—রাগালপ্তি এবং রূপকালপ্তি।

রাগালপ্তির শুধুমাত্র রাগকে কেন্দ্র করেই বিস্তার লাভ ঘটে। এটা রূপকের বা গানের মত অংগ যুক্ত নয়। রাগালপ্তির ব্যাপ্তিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এর এক একটী ভাগকে বলা হয় স্বস্থান। বিবিধ বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে যাতে রাগ প্রতীয়মান হয় তার জন্য স্থায় প্রয়োগের ব্যবস্থা।

রূপকালপ্তি সৃজনশীল এবং কল্পনাত্মক গীতি (মনোধর্মী সংগীত)। অন্যদিকে রাগালপ্তি প্রযুক্তিগত ব্যাপার। দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে 'রূপক'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলংকারিকরা বলেছেন 'রূপরোপাৎ তু রূপকম্'অর্থাৎ রূপের আরোপই হচ্ছে রূপক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মহাভারতের কৃষ্ণ, অর্জুন, কর্ণ প্রভৃতি হ'ল এক একটি রূপ। 'কর্ণার্জুন' নাটকে এক একজন নট এর এক একটী রূপ রূপায়িত করে। অর্থাৎ মহাভারতের কৃষ্ণ 'রূপ' আর নাটকের কৃষ্ণ 'রূপক'। রূপকালপ্তির ব্যাপারটিও এইরূপ। নিবদ্ধ সংগীতের যে বিশিষ্ট রূপ রয়েছে সেই রূপটীকে এক্ষেত্রে স্বরালাপে ফুটিয়ে তোলা হয়। সোজাসুজি বলতে গেলে প্রবন্ধ সংগীতের অনুকরণে এই রূপায়নকেই বলা হয় রূপকালপ্তি। এতে তালও সন্নিবেশিত থাকে।

রূপকালপ্তি দু'রকম—প্রতীগ্রহণিকা এবং ভঞ্জনী। রাগালপ্তি উপলক্ষে বিবিধ স্থায় প্রদর্শন ক'রে যদি প্রবন্ধ সংগীতের অবয়ব গ্রহণ করা হয় তাহলে তাকে প্রতীগ্রহণিকা রূপকালপ্তি বলে। এক্ষেত্রে আলপ্তি রূপককে গ্রহণ করছে।

ভঞ্জনী রূপকালিপ্ত দু'রকম—স্থায় ভঞ্জনী এবং রূপক ভঞ্জনী। প্রবন্ধের অনুরূপ রূপকে সংস্থিত স্থায়-এর বিচিত্র রীতি যখন প্রদর্শিত হয় তখন তাকে বলা হয় স্থায় ভঞ্জনী ; এটা যদি আরও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য সহকারে অনুষ্ঠিত হয় তখন তাকে বলে রূপকভঞ্জনী। সিংহভূপাল দু'প্রকার ভঞ্জনীর এইভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন : "যা স্যা মালপ্তৌ রূপকঃ সংস্থিতঃ প্রবন্ধাস্ত্রীয়ো যাঃ স্থায়-বর্ণব্যবস্থস্য প্রবন্ধস্য পদমানেক নানাপ্রকারোনেকা ভঙ্গিক ক্রিয়তে সা স্থায় ভঞ্জনী। রূপক ভঞ্জনী লক্ষতি তৈঃ পদৈরীতি। তৈঃ প্রবন্ধস্থৈ পদৈঃ ; তেন প্রবন্ধস্থেন মানেন সমগ্রমেব রূপক-মন্যথান্যথ ভঙ্গী-বিশেষেণ যস্যামালপ্তৌ-গমক গায়েৎ সা রূপক ভঞ্জনী।" রাগের অবয়ব প্রতিষ্ঠা অথবা সংগঠনের রূপবন্ধকে স্থায় বলে। গায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন কলাকৌশলও স্থায়ের অন্তর্ভূক্ত। স্থায় ভঞ্জনীর ক্ষেত্রে স্থায় শব্দের অর্থ অবশ্য সাংগীতিক রচনারই অংশ।

সিংহভূপাল-এর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে স্থায় ভঞ্জনী হ'ল সুষ্ঠু সৃজনশীল কল্পনাত্মক রচনা। অন্যদিকে রূপক ভঞ্জনী বলতে বোঝায় যে, 'শিল্পী যে গান করেন সেই গানের অন্তর্গত তানের মধ্যে তিনি আবদ্ধ ন'ন তিনি বিশেষ রাগ অনুসারে গমক অলংকার সহ অন্য তানও প্রয়োগ করে থাকেন।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে খেয়ালে যে অলংকরণ করা হয় সেইরূপ অলংকরণ স্থায় এবং রূপকভঞ্জনীতেও করা হয়ে থাকে।

শুদ্ধরূপক এবং আলাপ অথবা আলপ্তি এবং আক্ষিপ্তিকা থেকে রূপকালপ্তির অলংকরণ এবং ধরণ কখনও কখনও পৃথক হয়। প্রবন্ধ এবং রূপক-এর মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রবন্ধে কাঠামোর সৌন্দর্যের ওপর জোর দেওয়া হয় আর রূপক-এ সৃজনশীল কল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে রূপকালপ্তির ওপর ভিত্তি ক'রে সাধারণী-গীতির কাঠামো থেকে খেয়ালের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

উপরোক্ত আলোচন থেকে দেখা যাচ্ছে যে খেয়াল সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি গান নয় এবং বিদেশ থেকেও তা আমদানি করা হয়নি এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খসরু তার উদ্ভাবন করেননি। এই গান কাওয়ালদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কাওয়ালরা কাওয়ালী নামে দ্রুত লয়ে আঞ্চলিক গীতি গাইত। তারা তাদের গানে শুধুমাত্র 'কাউলা' ব্যবহার করতো। ঠাকুর জয়দেব সিং বলেছেন, "সংস্কৃতে 'বচন' শব্দ বলতে যা বোঝায় 'কাউলা' বলতেও তাই বোঝায়। যদিও শব্দ দুটির ব্যাপক অর্থের ব্যবহার আছে, তথাপি সংগীতে দুটো শব্দই বিশেষ অর্থে

ব্যবহৃত হয়। যেমন হিন্দু ধর্মে 'বচন', 'বাণী' অথবা 'শব্দ' বলতে রহস্যময় অথবা ভক্তিমূলক গান বোঝায় তেমনি মুসলমান ধর্মে 'কব্বালী' অথবা 'কাউলা' শব্দের অর্থ রহস্যময় গান।" আমীর খসরু কাওয়ালী বা কব্বালী সম্পর্কেই বেশী আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি এই ধরণের গানে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং প্রচুর গানও রচনা করেছিলেন। এই আমীর খসরুকে আমরা পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকর প্রকাশিত হয়। আমীর খসরু নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। তাছাড়া পারসী, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সুতরাং সংগীতরত্নাকর-এ বর্ণিত সাধারণী-রাগগীতি এবং রূপকালপ্তি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকারই কথা। এটা হতে পারে যে তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত কাওয়ালী রীতির মধ্যে কোনও বিশেষ রীতিকে খেয়াল নামে অভিহিত ক'রে থাকবেন। কিন্তু এরও কোনও প্রমাণ নেই। যদি তাই হয় তাহলে এটা সম্ভব যে এই বিশেষ রীতিই ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এবং এই রীতি ক্রমশ সংস্কৃত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শর্কী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শর্কী শাসকদের সময় ধ্রুপদের চর্চা ব্যাপক ছিল। যদিও এই সময়েই খেয়ালেরও প্রচলন দেখা যায় তথাপি সুলতানদের সভাব পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে লাভ করে ধ্রুপদ। ক্যাপটেন উইলার্ড খেয়ালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন, "In the Kheyal the subject generally is a love tale, and the person supposed to utter it, a female. The style is extremely graceful, and replete with studied elegance and embellishment "[১]

উইলার্ডের উক্তি থেকে বুঝতে পারা যায় যে চটুল প্রেম সংগীত হিসাবে খেয়ালের প্রচলন এই সময়ে ছিল এবং বিশেষভাবে নারীরা অর্থাৎ নর্তকীরা এই গান গাইত। তবে, উইলার্ড হুসেন শর্কীকে খেয়ালের প্রবর্তক হিসাবে যে ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।

জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী

Captain Willard বলেছেন যে 'খেয়াল' অথবা 'খ্যাল' খইরাবাদ জেলায় প্রচলিত ভাষায় প্রধানত রচিত হয়। তিনি আরও বলেছেন, "জৌনপুরের

১। 'A Treatise on the Music of Hindoostan', (1834), p. 67.

সুলতান হুসেন শর্কী এই রীতির গানের প্রবর্তক।"[১] A. H. Fox-Strangways তাঁর 'Music in Hindostan' (1914) বইতে লিখেছেন যে সাধারণ ধরণের খেয়াল ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদের পরবর্তীরূপ; এটা ১৪০১ থেকে ১৪৪০-এর মধ্যে মহম্মদ (সুলতান) শর্কীর[২] সময় থেকে সৃষ্টি হয়।

ফকীরুল্লা তাঁর রাগদর্পণে খেয়ালের পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'খেয়াল দুটি কলিতে গঠিত দেশীভাষায় গাওয়া হয়। বর্তমানে এটা দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত। আকবরের সময় এটা প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন আকবরাবাদ রাজধানী হ'ল সেই সময় যাবতীয় গায়ক ও ওস্তাদ যাঁদের তুলনা কোন যুগে দেখা যায়নি তাঁরা এখানে জমা হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই গোয়ালিয়রের বাসিন্দা ছিলেন * * * * বর্তমানে যে সব ভাষা ভালোভাবে বলা হয় তা দশ শতেরও অধিক। এইসব ভাষায় প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধীয় গান রচিত হয়েছে। কতকগুলি খেয়াল আছে যেগুলি চারটী কলি সহযোগে গঠিত। কিন্তু প্রথম দু'টি কলির পদান্তে মিল শেষের দুটি কলির মিল থেকে ভিন্ন।'[৩]

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আকবরের পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ষোড়শ শতকের আগেই 'খেয়াল' প্রচলিত হয়েছিল।

জৌনপুর যে সংগীতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং হুসেন শাহ শর্কী যে সংগীতের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফিরোজ তুঘলক তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহম্মদ জৌন-এর স্মৃতি রক্ষার্থে জৌনপুর শহর নির্মাণ করেন। এই জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজা জহান্ দিল্লীর সুলতানদের কাছে আনুগত্য অস্বীকার করে "মালিক-উশ-শর্ক" উপাধি গ্রহণ ক'রে স্বাধীন রাজ-বংশের পত্তন করেন। সেই থেকে জৌনপুরের সুলতানরা নিজেদের 'শর্কী' নামে অভিহিত করেছেন। এই বংশের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কী একজন সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতিবান ছিলেন এবং সাহিত্য, সংগীত এবং অপরাপর কলাবিদ্যার তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এর ফলে তাঁর সময়েই

১। "Sooltān Hoosyan Sharque of Jaunpur is the innovator of this class of song" 'Treatise on the Music of Hindoostān' (1834) by Captain Willard. p, 67.

২। এখানে সম্ভবত ইব্রাহিম শা শর্কী-র কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি মুবারক শা শর্কীর মৃত্যুর পর ১৪০২-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। —'An Advanced History of India'. New York (1965) p p. 347-48.

৩। রাজ্যেশ্বর মিত্র-এর অনুবাদ, 'মুঘল যুগের সংগীত চিন্তা, কলিকাতা (১৯৬৪), পৃঃ ৫৭-৫৮।

জৌনপুর মুসলিম সংস্কৃতির একটী কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। জৌনপুরে সংগীতের চর্চা দীর্ঘদিন ধ'রে অব্যাহত ছিল। এই রাজবংশেরই সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী। সুলতান মহম্মদ শা একজন অপদার্থ নরপতি ছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে হত্যা ক'রে হুসেন শাহ্ শর্কীকে সিংহাসনে বসান (১৪৫৮)। তিনি বহলোল লোদী-র সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন এবং ওড়িষ্যা অভিযান করেন। তিনি ১৪৬৬-তে গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করেন এবং রাজা মানসিংহ তোমর প্রচুর ধন-সম্পদ খেসারৎ দিয়ে রেহাই পান। কিন্তু বহলোল লোদী-র সঙ্গে আবার হুসেন শাহ্ শর্কীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জৌনপুর স্বাধীনতা হারায়। হুসেন-শাহ্ শর্কী পরাজিত হয়ে প্রথমে বিহারে এবং পরে বাংলা দেশের নবাব হুসেন শাহ-র রাজত্বে বাস করতে থাকেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধাবগ্রহে ব্যাপৃত থাকলেও হুসেন শাহ শর্কী এরই মধ্যে সংগীতের পৃষ্ঠপোষণা ও সংগীত চর্চা করেছিলেন। বহু গ্রন্থ থেকে আমরা তাঁর সংগীত সাধনার কথা জানতে পারি। ইতিপূর্বে তাঁর সম্পর্কে Captain Willard-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতুলানন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন, "The culture of Jaunpur is alive in the minds of many to-day. It lives through its gift of Khyal to Indian music. The Jaunpuri style of khyal is a thing of joy in our daily life throughout India. For this enchanting legacy we are indebted to Sultan Hussain Sharqui.[১]

এই ধরণের উক্তি সত্ত্বেও হুসেন শাহ্ শর্কীকে খেয়ালের প্রবর্তক বলতে অনেকেই রাজী ন'ন। তিনি 'শ্যাম' এবং 'টোড়ী' রাগগুলির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন একথা জানা যায়। তবে কেউ কেউ বলেন যে তিনি যে সংগীত রীতির প্রবর্তন করেন তা 'চুটকলা' নামে পরিচিত। এই 'চুটকলা' এক ধরণের প্রেম-সংগীত। ফকীরল্লা 'রাগদর্পণে' বিভিন্ন প্রকার সংগীতের বিবরণ দিতে গিয়ে জৌনপুরে প্রচলিত এক প্রকার গীতিকে 'চুটকলা' বলেছেন। এই গানে দুটি কলি থাকে। পদান্ত মিল এতে থাকে না এবং এই গান তালে গাওয়া হয় না। দুটি কলির প্রথমটিতে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়—দ্বিতীয়টি কবিতার মত।

এই গান প্রেম ও বিরহ বিষয়ক। এই গান যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত হ'লে তাকে সাধর্-চুটকলা বলা হয়। গানের এইরূপ বিবরণ দেওয়ার পর ফকীরল্লাই বলেছেন যে, এই গীতের স্রষ্টা সুলতান হুসেন শর্কী।

১। 'Hindus and Musalmans of India'. Calcutta (1940), P. 95.

ক্যাপটেন উইলার্ড তাঁর বইতে 'চুট্‌কলা' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি খেয়াল থেকে উদ্ভূত এক তুক্‌ বিশিষ্ট গানকে বলেছেন 'চুট্‌কলা' এবং দুই তুক্‌ বিশিষ্ট গানকে বলেছেন 'বারুই' (A Treatise on the Music of Hindoostan, p. 67)। সুলতান হুসেন শর্কীর যুগেও প্রকৃত খেয়াল সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা যায় নানা প্রচেষ্টা খেয়াল গঠনের দিকে এগিয়ে চলছিল। এই সৃষ্টি কর্মে হুসেন শর্কীর অবদান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই ব'লে তিনি খেয়ালের উদ্ভাবন করেন—একথা স্বীকার করা কঠিন।

শর্কী শাসকদেব সময় যে ধরণের খেয়াল রীতির প্রচলন হয়েছিল তার প্রসার বন্ধ হয়ে যায়নি।

আকবরের সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে ধ্রুপদের যখন চরম উন্নতির যুগ, তখনও এই ধরণের খেয়াল প্রচলিত ছিল। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে লেখা 'রাগদর্পণ' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার গীতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ফকীরুল্লা বলেছেন 'খেয়াল দুই কলিতে গঠিত। দেশী ভাষায় এই গান গাওয়া হয়। বর্তমানে এই গান দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত। আকবরের সময় এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে'।

ফকীরুল্লার মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আকবরের পূর্বেই খেয়ালের প্রচলন ছিল। আকবরের সময় তার প্রসিদ্ধি ঘটলেও রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে খেয়াল গান অনেকেরই পছন্দ ছিল এবং রাজপরিবারে খেয়াল গান অপরিচিত থাকার কথা নয়। কিন্তু মন্দিরে খেয়াল প্রবেশাধিকার পায়নি। কারণ খেয়াল গানের গড়নের মধ্যে ঐহিকভোগতৃষ্ণা যে পরিমাণে বলবত্তী, আধ্যাত্ম প্রেরণা সে পরিমাণে দুর্বল। খেয়াল পার্থিব ভোগ-সুখপরায়ণ রাজাদের এবং নর্তকীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছিল। ঠাকুর জয়দেব সিং বলেছেন, "Since the style was ornate and romantic, it did not find favour in the temples. It was mostly patronised by the kathiks, the dancing girls and kings." ঠাকুর জয়দেব সিং আরও বলেছেন যে, 'জৌনপুরের শর্কী রাজারা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেয়াল গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ষোড়শ শতকে এই গান রীতিমত জনপ্রিয় ছিল।' ঠাকুর সাহেব দেখিয়েছেন যে শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র গোকুলনাথ ব্রজভাষায় 'চৌরাশি বৈষ্ণবাঁকী বার্তা' নামে যে বই সংকলন করেন তার ভেতরে খেয়াল গানের কথা আছে। শ্রীবল্লভাচার্য ষোড়শ শতকের লোক। সুতরাং খেয়াল তাঁর সময়ে যে প্রচলিত ছিল তা বুঝতে পারা যায়।

মোগল বাদশাদের যুগেই খেয়াল ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি লাভ করে এবং সেই সঙ্গে ধ্রুপদও ধীরে ধীরে স'রে যায়। আকবরের আমল পর্যন্ত এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া তেমন প্রকট হতে পারেনি। কিন্তু তারপর থেকেই ধ্রুপদের বিশুদ্ধি ক্রমশ নষ্ট হয়ে খেয়ালের পথকে সুগম করলো। তানসেন গাইতেন শুদ্ধবাণী ধ্রুপদ—ধীর, স্থির, গম্ভীর তার রূপ। কিন্তু তানসেনের মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত চটুল খাণ্ডার বাণী ধ্রুপদ এসে খেয়ালের প্রতিপত্তির পথ প্রশস্ত করলো। ওস্তাদরা বাদশাহের মনোরঞ্জনের জন্য এবং বাদশাহদের উৎসাহেও বটে ধ্রুপদ ছেড়ে খেয়ালের দিকে ঝুঁকলেন। ফলে ধীরে ধীরে ধ্রুপদ ম্লান হয়ে এলো। এইভাবে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি খেয়ালের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠা করেন শাহ্ সদারঙ্গ।

সদারঙ্গ

সদারঙ্গ অবশ্য ঢিমা খেয়াল প্রবর্তন ক'রে ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দ্রুত লয় বিশিষ্ট খেয়ালের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব ছিল না। সদারঙ্গ ধ্রুপদের অনুসরণে বিলম্বিত খেয়াল প্রবর্তন করলেও দ্রুত খেয়াল-এর আগমন রোধ করা যে সম্ভব ছিল না তার কারণও রয়েছে। ধ্রুপদের মধ্যে সুষমা ও বিকাশের সীমা নির্ধারিত, খেয়ালের বিকাশ সীমাবদ্ধ নয়। খেয়াল গায়ক নিজের অনুভূতি অনুযায়ী রাগের বিস্তার এবং অলংকারের প্রয়োগ করতে পারেন।

সদারঙ্গের খেয়ালের সঙ্গে কাওয়ালী গানের পার্থক্য স্পষ্ট। কাওয়াল মধ্য লয়ে গাওয়ার রীতি ; এতে রাগ কিংবা তানের বিস্তার নেই ; গানের অঙ্গেই তান সন্নিবেশিত। তবে ছোট ছোট তান ব্যবহারের রীতি ছিল। আকবরের রাজত্বকালে চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, বাজবহাদুর, শেখ বহাউদ্দীন, চীর মহম্মদ প্রভৃতি হালকা চালের গান হিসাবেই কাওয়ালী গাইতেন।

সদারঙ্গ যে খেয়ালের প্রবর্তন করেন তার বৈশিষ্ট্য এই : তিনি ধ্রুপদ-ধারার কিছু পরিবর্তন ক'রে খেয়াল গানের প্রবর্তন করেন। এই গানে ধ্রুপদের মত শুধু মীড়ের তান নয়, দ্রুত লয়ের তানেরও প্রয়োগ হয়। গিটকিরি ইত্যাদি লঘু অলংকার এতে ব্যবহৃত হয় : এই গানে শুধু স্থায়ী এবং অন্তরা এই দুই তুক্ থাকে এবং সঞ্চারী ও আভোগের ব্যবহার নেই : বিস্তার ও তানে ধ্রুপদের মত বাট-উপজ হয় না। তার পরিবর্তে বোলতান ও 'আ'কার তানের প্রয়োগ বেশী

দেখতে পাওয়া যায়। বীণার গমক ও জোড়ের অনুকরণে সদারঙ্গ গমক তানের প্রবর্তন করেন। তাঁর অধিকাংশ গানেই রয়েছে মহম্মদ শাহের গুণকীর্তন। সে যুগে এটা প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে শাহের গুণকীর্তন ছাড়া গানও আছে। এখানে সদারঙ্গ-এর একটী খেয়াল গানের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে—

দরবারী কানাড়া | বিলম্বিত একতাল

চটকন বোলিয়ে রি নারী,
হুঁতো রঙ্গীলে লাল রসকী রসাল।
তুম বিন মোহে নিদঁ ন আবে,
অধরনসে মীঠে বোলে রসকী রসাল॥

০ ৩ ৪
সা | রা -সা | -ররা -ণ্া | -সণ্া রসা I
চ ট ০ ০০ ০ ০০ কন

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
II ণ্দা -া | -ণ্া -ম্া | -প্ ম্া প্া | সা -া | -ণ্দা ণ্দা | -ণ্া -সা I
বো ০ ০ ০ ০ ০ লি য়ে ৩ ০০ রি ০ ০

I সা -া | -ণ্সা সা | ণ্া সা | রা মজ্ঞা | -মা -মপা | -পদা পপা I
না ০ ০০ রী হুঁ তো রঙ্ গী ০ ০০ ০০ লে০

I মঃ -জ্ঞঃ | -মজ্ঞা -মা | রা সা | রা -া | -া -া | ণা পদা I
লা ০ ০০ ০ ল র স ০ ০ ০ কী র০

I মপা -মজ্ঞা | -মপা জ্ঞমা | রা সা | রা -সা | -ররা -ণ্া | -সণ্া রসা II
সা ০৩ ০০ ০ ল "চ ট ০ ০০ ০ ০০ কন"

০ ৩ ৪
মা | মা পা | র্সা -া | -ণর্সা র্সা I
তু ম বি ন ০ ০০ মো

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II র্সা -া | র্সণ্া -র্সা | র্রা র্সা | র্রা -র্সা | -ণর্সা -র্রর্রা | -র্সর্সা ণদা I
হে ০ নিঁ০ ০ দ ন আ ০ ০০ ০০ ০০ রে০

I -ণা -পা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা পা | ণদা -ণপা | -ণঃ র্সাঃ | পণা পমা I
০ ০ অ ধ র ন সে০ ০০ ০ ০ মী ঠে০

I মপা -মজ্ঞা | মপা -জ্ঞমা | -রা সা | সা সা | -র্সা -া | না পমা I
বো ০০ ০০ ০ ০ লে র স ০ ০ কী র০

I মপা -মজ্ঞা | -মপা -জ্ঞমা | রা সা | রা -সা | -ররা -ণ্া | -সণ্া রসা II II
সা ০০ ০০ ০ ল "চ ট ০ ০০ ০ ০০ কন"

সদারঙ্গের প্রকৃত নাম নিয়ামৎ খাঁ। সদারঙ্গ নামেই ইনি পরিচিত। মহম্মদ শাহ্-র দরবারে আসবার পর থেকে তিনি এই নামে পরিচিত হ'ন। "সদারঙ্গ" নামটীরও বিশেষ তাৎপর্য আছে। নিয়ামৎ খাঁ বীণায় ও কণ্ঠ সংগীতে "খোসরঙ্গ'' বা হৃদয়গ্রাহী বৈচিত্র্য সুষমা এত প্রচুর পরিমাণে এনেছিলেন যা পূর্ববর্তী কোনও সংগীত-সাধক আনতে পারেন নাই। সদা তাঁর সংগীতে রঙ্গের ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হ'ত ব'লে তাঁর নাম সদারঙ্গ রাখা হয়েছিল।"[১]

ইনি তানসেনের কন্যা বংশের খুশাল খাঁ-র (ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক) পৌত্র এবং লাল খাঁ-র পুত্র। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই তাঁর জন্ম।

সে যুগে কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীতের মানের তারতম্য ছিল। সদারঙ্গ প্রথম জীবনে ছিলেন একজন নিপুণ বীণকার কিন্তু যন্ত্র সম্বন্ধে গায়কগণের অবহেলা

১। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান', কলিকাতা (১৩৬৪) পৃঃ ৫৮

তাঁকে মর্মপীড়িত ক'রে। তাই তিনি কণ্ঠ সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ-এর[১] সভাগায়ক ছিলেন।

বংশ বৈশিষ্ট্য অনুসারে সদারঙ্গ ছিলেন বীণকার এবং ধ্রুপদ-ধামার গায়ক। কেউ কেউ বলেছেন যে ধামার সদারঙ্গের সময়ই সৃষ্টি হয় এবং সদারঙ্গ-কে ধামারের সৃষ্টিকর্তাও বলা হয়। ধামার ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। এর মধ্যে একটু চঞ্চলভাব রয়েছে। ধামার প্রধানত কৃষ্ণের দোললীলামূলক। খেয়ালের বিষয়বস্তুর মধ্যেও কৃষ্ণলীলা-র বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মুসলমান সাধক এবং মহম্মদের স্তুতিবাদও পাওয়া যায় না এমন নয়। সদারঙ্গ বহু ধামার রচনা ক'রেছিলেন এবং ধামারকে তিনি জনপ্রিয় ক'রে তোলেন। সম্ভবত এই জন্যই তাঁকে ধামার-এর সৃষ্টিকর্তা বলা হয়।

সদারঙ্গ কিছু সংখ্যক ধ্রুপদও রচনা করেন। তানসেনের মতই তাঁর রচনায়ও কাব্য সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

সব বনমে কৈসে সোহে ঋতুরাজ দিন আঈ
মন্দ মন্দ পবন বহত বহু বরণ হোয় সুমন।
সদারঙ্গকে প্রভু আজ লেতহি মুবলজী সাজ
বজাবে পঞ্চমরাগ সুর নর হোয় মগন।

সদারঙ্গ প্রায় প্রতিটি রাগের ওপরই ধামার গান রচনা করেন। ধামার গানের ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু একই। তা সত্বেও এর মধ্যেও তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। তাঁর অপূর্ব কবি প্রতিভার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

ধ্রুপদ এবং ধামার রচনা করলেও খেয়াল গায়ক হিসাবেই তার খ্যাতি। তাঁর হাতেই খেয়ালের নূতন ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদ শাহের সময় খেয়াল গান যে উন্নতিলাভ করে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, তা তাঁরই প্রচেষ্টায়। তিনি যে কলাবন্তী খেয়ালের উদ্ভাবক তার মধ্যে নায়িকা ভেদ, নায়ক প্রশংসা, ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশ রয়েছে। তিনি ব্রজভাষা, হিন্দীভাষা, পাঞ্জাবী ভাষা প্রভৃতিতে দক্ষ ছিলেন। তাঁর গানে বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

যন্ত্র-সংগীত অবলম্বনে যিনি তাঁর সাংগীতিক জীবন শুরু করেন, যন্ত্রসংগীতে

১। এঁর প্রকৃত নাম রোশন আখতার। ইনি বাহাদুর শাহ-র চতুর্থ পুত্র জহান শাহ-র ছেলে। ইনি ১৭১৯ থেকে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সুপুরুষ ছিলেন এবং আমোদ প্রমোদের মধ্যে ডুবে থেকে একেবারে বিলাসের জীবন যাপন করেন।

তাঁর দান সামান্য নয়। তিনি সেতারের তিন তারের পরিবর্তে সাতটি তার সংযোজিত করেন। যিনি সেতারে চিকারীর তার সংযোজিত ক'রে ধ্রুপদ ভাঙা বিলম্বিত গৎ প্রবর্তন করেন, বিলাস খাঁ বংশীয় সেই মসীদ খাঁ সদারঙ্গেরই শিষ্য।

অদারঙ্গ

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হিসাবে সদারঙ্গ এর পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন অদারঙ্গ। অদারঙ্গের প্রকৃত নাম ফিরোজ খাঁ। অদারঙ্গ মোগল দরবার প্রদত্ত উপাধি বিশেষ। ইনি সদারঙ্গের প্রথম পুত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এঁর জন্ম। ইনিও মহম্মদ শাহ-এর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। সদারঙ্গের মতই ইনিও বীণকার এবং খেয়াল ও ধামার গানে দক্ষ ছিলেন। অদারঙ্গ-এব একটি গান----

পুরিয়া। ধামার

লাজোই আঁখিয়া তামে কজরা পরো
অতি চতুর সুন্দর নার।
যা দরশ গযো কছু সুধ ন রহত
বাতে মতবারো খেলত ধমার।
চন্দন বন্দন বুকা রোরি
কেশরকী পিচকার।
রঙ্গ মচায়ো গোকুলমে
হোরি খেলত নন্দকুমার।

অদারঙ্গের গানে যেমন ভাব-গাম্ভীর্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি, লক্ষ্য করা যায় তার ভাষার মাধুর্য। তিনি মহম্মদ শাহ-র স্তুতি ক'রে গান রচনা করেছেন। সদারঙ্গের মতই তাঁর গানে নায়িকা ভেদ, ঋতুবর্ণনা প্রভৃতি রয়েছে। অদারঙ্গ ব্রজভাষা এবং পাঞ্জাবীভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে। অদারঙ্গ শুধু গায়ক ন'ন, তিনি স্রষ্টাও বটে। তাঁর রচিত 'ফিরোজখানি টোড়ী' রাগ সংগীত জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

মহারঙ্গ

সদারঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র ভূপৎ খাঁ, মহারঙ্গ নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও পিতা সদারঙ্গ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

অদারঙ্গের মতই একাধারে বীণকার, ধামার এবং খেয়াল গায়ক ছিলেন। বীণা বাদনে ইনি বেশী নিপুণ ছিলেন। এই জন্য ইনি শাহ বীণকার নামে পরিচিত।

মনরঙ্গ

মনরঙ্গ নামটি সদারঙ্গ, অদারঙ্গের অনুকরণ হলেও ইনি কিন্তু তাঁদের বংশের কেউ ন'ন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক; কিন্তু এঁর পরিচয় অজ্ঞাত। তবে, ইনি সদারঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলেই সম্ভবত মনরঙ্গ—এই নাম গ্রহণ করেছিলেন বা এই নামে অভিহিত হয়েছিলেন। ইনি ধ্রুপদও গাইতেন এবং খেয়ালও গাইতেন। ইনি শুধু গায়কই ছিলেন না—সংগীত-রচয়িতাও ছিলেন। এঁর রচিত একটী গানের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

ভৈরবী। বিলম্বিত ত্রিতাল

করনা হোয় সো করলে প্যারে,
নাই জনম জাত দিন রৈন সবারে।
সগরী উমর বীত গয়ি হৈ, ছিন পল—
মাহ বিন সহোজারে।
ধন যৌবন কছু থির নাই হৈ,
চেতনা হোয় তো চেত ভলারে।
মনরঙ্গ প্রভু মত ভুল জগত সঙ্গ,
কাহে কুঁ শির পর লেত তূ ভারে।

মনরঙ্গ নূতন ধরণের 'সাদ্‌রা'-র প্রচার করেছেন। ফকীরুল্লার 'রাগদর্পণ' গ্রন্থে 'সাধ্‌রা' নামে যে গীতের পরিচয় আছে সেই গান চার, ছয়, বা আট কলিতে নিবদ্ধ। এটি যুদ্ধ বিষয়ক গীতি। কিন্তু এখানে যে 'সাদ্‌রা'-র উল্লেখ করা হচ্ছে সেটি অন্য শ্রেণীর। "ঝাঁপতালে রচিত হোরি বা ধ্রুপদ গানকে সাদ্‌রা বলা হয়। দিল্লীর সন্নিকটে শাহদারা গ্রাম-নিবাসী এবং বৈজুবাওরার শিষ্য-পরম্পরাভুক্ত ভ্রাতৃদ্বয় শিবমোহন ও শিবনাথ ঝাঁপতালের ধ্রুপদে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতি প্রচলিত করিয়া স্বীয় গ্রামের নামানুযায়ী উহার নামকরণ করেন। পৃথক-ভাবে ঝাঁপতালের অথবা ধ্রুপদের নাম সাদ্‌রা নহে, কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত নাম সাদ্‌রা প্রখ্যাত হইয়াছে।"[১] ধ্রুপদ বলতে প্রধানত চৌতালের ধ্রুপদ, ধামার

১। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, 'ভারতীয় সঙ্গীতকোষ', কলিকাতা (১৩৭২), পৃঃ ১৫১।

বলিতে ধামার তালের ধ্রুপদ বোঝায়। সাদ্‌রা বলতে বোঝায় ঝাঁপতালে ধ্রুপদ অর্থাৎ যার মধ্যে ধ্রুপদের ভাব এবং খেয়ালের গতি একই সঙ্গে সন্নিবেশিত।

অন্যান্য খেয়াল গায়ক

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন খেয়াল গায়কের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসির খাঁ, গুলাম রসুল এবং তাঁর ভাই জানরসুল প্রভৃতি। হাসির খাঁ কাওয়ালী খেয়াল গাইতেন। সদারঙ্গ দু'টি ভিক্ষুক বালককে খেয়াল গান শেখান। এই সুকণ্ঠ বালকদ্বয় সদারঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে কাওয়ালী গান শেখে। এজন্য এঁরা কাওয়াল ব'লে পরিচিত এবং এঁদের বংশাবলীর গানকে কাওয়ালী ঘরাণার গান বলা হয়। এঁদের গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এঁরা বীণাযন্ত্রের আলাপের অনুকরণে খেয়াল গানের বিস্তার ও বোলতান এবং জোড়-এর অনুকরণে 'আ'-কার তান প্রয়োগ ক'রতেন। গুলাম রসুল এবং জান রসুল পাঞ্জাব প্রদেশের সন্তান। এঁরা আসফদ্দৌলা-র রাজত্বকালেও অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। সদারঙ্গের খেয়ালের প্রচারে এই দুই ভাই-এর অবদান সবচেয়ে বেশী।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে ধ্রুপদ ও খেয়ালের চর্চা

রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশ আজ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্থানে বিভক্ত। শুধু আজকের এই বিভাগ নয়, গুপ্ত যুগ (চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী) থেকে শুরু ক'রে বার বার বাংলা দেশের সীমা এবং নাম পরিবর্তিত হয়েছে। রাজা শশাঙ্কের সময় থেকে গৌড় নামটি ব্যাপকভাবে চালু হয়। অবশ্য গৌড় বলতে প্রধানত পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গকেই নির্দেশ করা হ'ত। পাঠান যুগে সমগ্র বংলা গৌড় নামেই আখ্যাত হয়। মুঘল আমল থেকে 'বাংলা'—নাম পাওয়া যায়। ইংরাজ তার শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বৃহত্তর বঙ্গ থেকে বিহার, ওড়িষ্যা এবং আসাম বা কামরূপকে পৃথক করে এবং সর্বশেষে (১৯৪৭-এ) পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব-পাকিস্থান— বাংলা দেশকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঠিক কোন সময়ে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম মনুষ্যবসতি আরম্ভ হয় তা ঐতিহাসিকরাও স্থির করতে পারেননি।

গঙ্গা নদীর পথ ধ'রে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী থেকে আর্যরা এদেশে আসতে আরম্ভ করেন। এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভূমির প্রায় সর্বত্র আর্যভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের শিক্ষা, বিদ্যাচর্চা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল 'সংস্কৃত' এবং কথ্যভাষা ছিল 'প্রাকৃত'। এই প্রাকৃত ভাষাই পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশ স্তরের মধ্য দিয়ে অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা 'বাংলার' রূপ গ্রহণ করেছে। এই রূপান্তর ঘটেছিল দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে।

বাংলাভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালীরা যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন তা হয় 'সংস্কৃত' না হয় 'প্রাকৃত'। বাংলাসাহিত্য সৃষ্টির জন্ম লগ্নে বাঙালীর সাহিত্য মানস উৎসারিত হয়েছিল উপরোক্ত যে দুটি ভাষায়, তাদের বিভিন্নতা থাকলেও তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। তাই পারস্পারিক পরিপূরকতার প্রভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্য সূচিত হয়েছিল। এই দুই 'বৈচিত্র্য'-এর সঙ্গম স্থলেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির প্রেরণার মূলে রয়েছে ধর্ম—এই নূতন সৃষ্টি কলেবর গ্রহণ করেছে সংগীতের এবং তা পরিচিত হয়েছে 'চর্যাপদ' নামে।

'চর্যাপদ-কে' বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গীত ব'লে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। বাংলাভাষা সৃষ্টির পর তার অগ্রগতির পথে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার থেকে বহু শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রেও বাঙালীরা প্রথম থেকেই প্রাচীন

ঐতিহ্যের ওপরই দাঁড়িয়েছেন। বাংলাভাষার এই প্রথম সংগীত প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধ সংগীত। শার্ঙ্গদেব 'সংগীতরত্নাকর'গ্রন্থে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ পর্যায়ে চর্যা প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে চর্যাপদ শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও প্রচলিত ছিল। অবশ্য ভাষার দিক থেকে বাংলার চর্যাপদের সঙ্গে অন্যত্র প্রচলিত চর্যাপদের পার্থক্য থাকতে পারে।

যে চর্যাপদগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন ব'লে দাবী করা হয়, সেই ৫০টির মত পদ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই পদগুলি রচনা করেছিলেন। চর্যাগীতি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রাগ রাগিণীতে যে গাওয়া হ'ত তার প্রমাণ প্রত্যেকটি চর্যার সঙ্গে শাস্ত্রীয় রাগের উল্লেখ আছে। অবশ্য তালের কোন উল্লেখ নেই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রবন্ধ সংগীতের গ্রন্থ। জয়দেব নিজে তাঁর রচনাকে বলেছেন প্রবন্ধ সংগীত :

"শ্রীবাসুদেব রতি কেলি কথা সমেত
মেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্॥

[দ্বিতীয় শ্লোক]

অর্থাৎ—জয়দেব কবি শ্রীবাসুদেব রতিকেলিকথা সম্বলিত এই প্রবন্ধ (গীতগোবিন্দ) রচনা করলেন।

চর্যাপদে রাগগুলির উল্লেখ থাকলেও তালের উল্লেখ নেই ; কিন্তু গীতগোবিন্দে রাগের সঙ্গে তালের নামও পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে "সংগীতের দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে এই গীতিনাট্য সেই যুগের রচনা যখন দেশে প্রাচীন প্রবন্ধ গায়ন কথঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে এবং নব নব রীতির অভ্যুদয় হচ্ছে। এই গীতি প্রবন্ধটি বিপ্রকীর্ণ জাতীয়।"[১] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পদে বিপ্রকীর্ণ কথাটির পরিবর্তে 'প্রকীর্ণক' কথাটির উল্লেখ আছে। যেমন তাম্বুল খণ্ডের ৭ম পদ, যমুনা খণ্ডের ষষ্ঠ পদ। রাধাবিরহ খণ্ডে ২৩তম, ৪৭তম, ৫০তম প্রভৃতি পদ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরে যে গান বাংলাদেশে আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেছিল তা হচ্ছে কীর্তন গান। কীর্তনের পদ রচনা পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি শুরু করেন। কিন্তু এই কীর্তন গানকে আধ্যাত্ম মার্গে উন্নীত এবং জনপ্রিয় ক'রে তোলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হ'ন এবং তাঁর

১। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'প্রাচীন বাঙলার সংগীত' কলিকাতা (১৩৭১) পৃঃ ৪৯—৫০।

তিরোধান ঘটে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। এই ষোড়শ শতকে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি প্রতিভাবান বৈষ্ণবের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা হিন্দু এবং মুসলমানী উচ্চাঙ্গ সংগীত জানতেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই শুধু গায়কই ছিলেন না, সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বামী কৃষ্ণদাস 'গীত প্রকাশ' নামে সংগীতের একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে) নরোত্তম দাস বিলম্বিত ধ্রুপদকে ভিত্তি ক'রে নূতন ধরণের রসকীর্তন বা লীলাকীর্তনের প্রবর্তন করেন।

ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন

চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা নরোত্তম দাস বর্তমান পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জিলার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি গৃহত্যাগ ক'রে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং জীব গোস্বামীর কাছে তিনি ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এই বৃন্দাবনে সেই সময়ে ধ্রুপদ সংগীতের ব্যাপক চর্চা ছিল এবং স্বভাবতই নরোত্তম দাস তা ভালোভাবে শিক্ষা করেছিলেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্মভূমি খেতরী-তে দশ দিন ব্যাপী এক বিরাট মহোৎসব হয়। এটা খেতরীর মহোৎসব নামে খ্যাত। এই উৎসবে নরোত্তম দাস নূতন ধরণের লীলাকীর্তন করলেন। তাঁর এই পদ্ধতি 'গরাণহাটী'[১] নামে প্রচলিত।

নরোত্তম যে ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তনের প্রবর্তন করেন 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে খেতরীর মহোৎসবে গোকুলানন্দ কীর্তন শুরু করেন। তিনি অনিবদ্ধ গীতক্রম আলাপ করেন; অর্থাৎ কেবল বর্ণন্যাস স্বরালাপের দ্বারা গীত শুরু হ'ল:

আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে
সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে॥

[নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর']

১। কীর্তনের তিনটী ধারা। নরোত্তম প্রবর্তিত 'গরাণহাটী' ছাড়া অন্য দুটী ধারার নাম—মনোহরশাহী এবং রেণেটী। 'মনোহর-শাহী'র উদ্ভব হয় বীরভূম জেলার নিকটস্থ মনোহরশাহী পরগণা থেকে। 'রেণেটী প্রচলিত ছিল ওড়িষ্যায়। এই ধারার প্রচারকর্তা শ্যামানন্দ যাঁকে গৌড়-উৎকলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর 'গরানহাটী' নামের উদ্ভব হয় গড়েরহাট বা গরানহাট পরগণার নামানুসারে।

তিনটী স্বরগ্রাম (মন্দ্র, মধ্য এবং তার সপ্তক) অধিকার ক'রে ক্রমান্বয়ে আলাপচারী চলতে থাকলো। সেই আলাপচারীতে সকলেই মুগ্ধ হ'ল। গায়কেরা তখন শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে গান ধরলেন :

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্‌ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী রহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নহে তার সম॥

[—নরহরি চক্রবর্তী, 'ভক্তিরত্নাকর']

এরপর নরোত্তম দাস নিবদ্ধ গীত পরিবেশন করলেন। ধ্রুপদে যেমন আলাপের পর মূলগান আরম্ভ হয় তেমনি নরোত্তম দাসের কীর্তনেও আলাপের পর মূলগান সম্পাদিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানে খোল ও করতাল ছাড়া আর কোনও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল ব'লে জানা যায় না। খগেন্দ্রনাথ মিত্র নরোত্তমের এই গান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "এই প্রবন্ধগীতই নিবদ্ধ সংগীত এবং ইহাই কীর্তনগানে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। নরোত্তম এই নিবদ্ধ গীতই করিয়াছিলেন। প্রথমে যে অনিবদ্ধ গীত বা আলাপচারীর দ্বারা গীত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ধারা কিছুটা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্তনগানের পূর্বে নায়কেরা এখনও অর্থশূন্য বর্ণন্যাসের দ্বারা আলাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক স্থলে উহা কেবল পরস্পারের কণ্ঠমিলনব্যাপারে পরিণত হয়। এইজন্য এই আলাপচারির নাম হইয়াছে 'মেল' বা 'মেল জমাট'। অর্থাৎ স্বরের 'জমাট' করিয়া গান ধরা হয়।"[১]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র আরও বলেছেন যে, প্রবন্ধ সংগীতের চারটী ধাতু ও ছ'টী অঙ্গ থাকে। অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলীতে উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ এই চারটী ধাতু বা অবয়ব গঠনের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।[২] এ সত্ত্বেও কিন্তু কীর্তনের একটা স্বাতন্ত্র আছে।

১। 'কীর্তন', কলিকাতা (১৩৫২), পৃ: ২৯
২। ঐ , ঐ , পৃ: ২৮

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, "বাংলা দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না..........। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি, সে সমস্ত আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে।"[১] রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, "বাঙালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে এবং সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল......। তার মধ্যে যে বহুশাখান্বিত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।"[২] চৈতন্যদেবের সময় থেকে কীর্তনের যে প্রসার ঘটলো তাতে একই সঙ্গে দেখা যায় গীত এবং নৃত্য। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তম দাসের কীর্তনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, এই কীর্তন রীতিমত অভিজাত সংগীত। এর পরে যে মনোহরশাহী ধারার উদ্ভব হয় তা সরলতর এবং লঘুতর। এর পরে যে 'রেণেটি' ধারার সৃষ্টি হয় তা আরও সরল এবং লঘু।

খেতরীর মহোৎসবের পরে শ্রীখণ্ড ও কাটোয়া-তে যে মহোৎসব হয় তাতেও গরাণহাটী কীর্তনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। পরে অবশ্য এই রীতিতে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয় এবং গায়ন পদ্ধতিকে অপেক্ষাকৃত সরল ক'রে পরিবেশিত হ'তে থাকে।

ধ্রুপদের চর্চা

বাংলা দেশে ধ্রুপদের পুরোপুরি চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ, তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর বংশধর বাহাদুর খাঁ-কে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। বাহাদুর খাঁ-র সঙ্গে এসেছিলেন বিখ্যাত মৃদঙ্গী পীরবক্স। বাহাদুর খাঁ-কে পাঁচশত টাকা বেতনে আনা হয়েছিল।[৩]

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পর মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। ঔরঙ্গজেব তাঁর তিন পুত্র -- মু'আজম, মহম্মদ আজম, মহম্মদ কামবক্স—এর মধ্যে সাম্রাজ্য সমভাবে বিভক্ত ক'রে মৃত্যুর পূর্বে উইল ক'রে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীতচিন্তা' পৃঃ ১৭৩—১৭৪

২। ঐ ঐ পৃঃ ১৭৬

৩। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিষ্ণুপুর,' (১৩৪৮), পৃঃ ৩২

গিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও সিংহাসন নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তরবারির বলে মু'আজম বাহাদুর শাহ (প্রথম শাহ আলম) নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জ্ঞানী, উদার নরপতি ছিলেন। তাঁর সময়েও সংগীতের পৃষ্ঠপোষণার বিশেষ কমতি হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আবার সিংহাসন নিয়ে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তিন পুত্র যুদ্ধে নিহত হওয়ার পরে প্রথম পুত্র জাহান্দার শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। জহান্দারের রাজত্ব সম্পর্কে Khāfi Khān লিখেছেন, "In the brief reign of Jahāndar violence had full sway. It was a fine time for minstrels and singers and all the tribes of dancers and actors."[১]

জহান্দারকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার খাঁ সহ দিল্লী দুর্গে হত্যা করা হয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফারুকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও নামে মাত্র নবাব ছিলেন। তাঁর পরে যাঁরাই দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে অপরের হাতের পুতুল ছিলেন। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিস্তার করছিলেন এবং দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৮০৬ খৃষ্টাব্দ) ইংরাজের পেন্সন ভোগী হয়ে জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় শাহ আলম ক্ষমতা হাতে পেয়ে (১৭৫৯ খৃঃ) নিজেকে দেখলেন বন্দী অবস্থায় বাস করছেন। তিনি তাঁর সর্বশক্তিমান উজীর গাজী উদ্-দীন ইমাদ-উল-মুলুক-এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে বেড়াতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজের শরণাপন্ন হলেন। এই সময়েই দিল্লীর দরবারে যে সমস্ত সংগীতজ্ঞরা ছিলেন তাঁরা ভারতের দেশীয় রাজাদের দরবারে আশ্রয়লাভ করতে থাকেন। এই শাহ আলমের দরবারেরই বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বাহাদুর খাঁ, বিষ্ণুপুরের রাজা, দ্বিতীয় রঘুনাথের রাজসভায় চলে আসেন।

এই সময় থেকেই বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের চর্চা শুরু হয় এবং এই স্থান ক্রমশঃ ধ্রুপদ চর্চার একটী বড় কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে।

বাংলা দেশ ছিল পূর্ব, উত্তর এবং রাঢ় এই তিন ভাগে বিভক্ত। এখন বাঁকুড়া জেলায় রাঢ়ভূমির যে অংশ বর্তমান সেই অংশই অতীতের বিষ্ণুপুর রাজ্যের গৌরব-স্মৃতি বহন ক'রছে। এই বিষ্ণুপুর রাজ্যের খ্যাতি সেই মহাভারতের

১। Khāfi Khān, 'Muntakhab-ul-lubāb,' (Bib. Ind., Calcutta, 1869). Elliot and Dowson vol. VII.

যুগ থেকে প্রবহমান। কেবল বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা নয়, এক সময় মেদিনীপুর, বর্ধমান, এবং বর্তমান বিহারের ছোটনাগপুরের কিছু অংশ বিষ্ণুপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিষ্ণুপুর বহুকাল ধ'রে বঙ্গভূমিতে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিষ্ণুপুর রাজ্য অতি প্রাচীন কাল থেকে মল্লভূম নামে খ্যাতি লাভ ক'রে এসেছে। সপ্তম শতাব্দীতে মল্লরাজ বংশ স্থাপন করেন আদি মল্ল রঘুনাথ। তিনি রাঢ় ও ওড়িষ্যার সীমার মধ্যে বিস্তৃত ভূখণ্ড মল্লরাজের অধিকারভুক্ত করেন। এই হ'ল সেকালের বিষ্ণুপুর রাজ্য।

মল্লবংশের রাজা রাজ মল্লের সময় (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুব সংগীত সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরের আর এক রাজা বীর হাম্বীর। বীর হাম্বীর মোগল সম্রাট আকবর শাহ্-র সমসাময়িক (আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬—১৬০৫) নরপতি। রাজা বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কতকগুলি সংগীত ও পদাবলী রচনা ক'রে বৈষ্ণব সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন।

মল্লবংশের পরবর্তী সমস্ত রাজাই সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে গেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংগীত শাস্ত্রে রীতিমত পণ্ডিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈত সিংহের পুত্র নিমাই সিংহ সংস্কৃত ভাষা এবং সংগীত শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'রাগমালা' গ্রন্থটি সংগীতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করছে।

সংগীতের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবস্থল বিষ্ণুপুর। আলাউদ্দীন খিলজীর যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে মোগল বাদশাহী শাসনের শেষ পর্যন্ত দিল্লী নগরী সংগীত চর্চার জন্য বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছিল। দিল্লী শুধু তাই রাজনৈতিক দিক থেকেই ভারতের রাজধানী নয়, সংগীত জগতেরও রাজধানী ছিল। "বিষ্ণুপুরের সংগীতের অনুশীলন দিল্লীর সংগীত-চর্চার ন্যায় খ্যাতিলাভ করায় বিষ্ণুপুরকে এক সময় 'ছোট দিল্লী' নামে অভিহিতকরা হইত।"[১] রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরের দরবারকে দিল্লীর দরবারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লী থেকে মুসলমান ওস্তাদদের নিয়ে আসেন। বাহাদুর খাঁ এঁদের অন্যতম।

বিষ্ণুপুর রাজ্যে সর্বপ্রথম সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা সুরু হয় মল্লরাজ বংশের ৪২তম রাজা পৃথ্বীমল্লের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লী থেকে

১। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিষ্ণুপুর', কলিকাতা (১৩৪৮, পৃঃ ৩৫

বাহাদুর খাঁ এবং পীরবক্সকে আনা থেকেই বোঝা যায় যে এই রাজ্যে সংগীতের সুষ্ঠু অনুশীলন এবং প্রচারের জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কি পরিমাণে অর্থব্যয় করা হয়েছে।

রাজা রঘুনাথ সিংহ আনলেন বাহাদুর খাঁকে। এই বাহাদুর খাঁ-র প্রধান শিষ্য হলেন গদাধর চক্রবর্তী। চক্রবর্তী পরিবার সংগীতকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের বহু বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ তাঁদের সংগীত সাধনা দ্বারা বিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এঁদের মধ্যে শ্যামচাঁদ, কানাই, মাধব চক্রবর্তী অন্যতম। কানাই ও মাধব সংগীত সাধনায় এতই একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে, সাধারণ লোকে তাঁদের পাগল মনে করতো। সংগীত শিক্ষার জন্য তাঁদের বহুদেশ ঘুরতে হয়। গদাধরের অন্যতম বংশধর নীলমণি চক্রবর্তী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীত-শিক্ষক ছিলেন। বাহাদুর খাঁ-র পর গদাধর চক্রবর্তী রাজসভার সংগীত অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ও তাঁর শিষ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরের রাজসভায় সংগীত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

বাংলাদেশের সংগীত জগতে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য স্বাতন্ত্র্যে এবং মনীষায় একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগেই বিষ্ণুপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা গদাধর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুর রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অল্প বয়সেই রামশঙ্কর পিতার ন্যায় শাস্ত্র ও পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ছোটবেলায় সংগীতের সঙ্গে রামশঙ্করের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বড় হয়ে তিনি যখন রাজসভায় যাতায়াত শুরু করলেন, তখনই রামশঙ্কর সন্ধান পেলেন নিজের জগতের। প্রতিভাশালী সংগীত শিল্পীদের সাধনা তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করল। তিনি সংগীত সাধনা শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংগীতের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিকেই পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিষ্ণুপুরের সংগীতকলাবিদগণ এই প্রতিভাকে চিনতে ভুল করলেন না, তাঁরা তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিলেন। বিষ্ণুপুররাজ রামশঙ্করকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন।

রামশঙ্কর তাঁর স্বরচিত গানের বিশুদ্ধ মধুর আলাপে বাণীর যে অর্চনা করে গেছেন তা আজও আবেদন জানায়। তাঁর রচিত 'অজ্ঞান-তমো-নিকরে' গানটি প্রায় সব সংগীতরসজ্ঞেরই মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সংগীতগুরু রামশঙ্করের দানে সংগীত-সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

সংগীতশাস্ত্রানুযায়ী রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধ রাগ বিস্তারে রামশঙ্কর প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ভাবপূর্ণ উচ্চাঙ্গের গীত রচনাতেও তিনি সাহিত্য ও সংগীতের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর গানগুলি নির্দিষ্ট রাগরাগিণীতে এবং ধামার, ঝাঁপতাল প্রভৃতি ধ্রুপদাঙ্গের তালে রচিত। বাংলা ভাষায় রচিত উচ্চ ভাবপূর্ণ গীত যে কতদূর প্রীতিপদ ও মর্মস্পর্শী হ'তে পারে, এবং তাতে ভাষাগত গাম্ভীর্য কি পরিমাণে প্রকাশ পায় — সংগীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিটি গানে তার পরিচয় বর্তমান।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের পরেই সংগীতাচার্য রামকেশব ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের এই সংগীতবেত্তা পুত্রটিও পিতার ন্যায় বিখ্যাত গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন।

এক সময় রামকেশব ভট্টাচার্য কুচবিহারাধিপতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সভায় সংগীত আলাপের জন্য আমন্ত্রিত হ'ন। মহারাজ গুণীর পূজারী ছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুসৃত উচ্চাঙ্গের গান শুনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন যে রামকেশবকে তিনি একটী হাতী ও নগদ পাঁচহাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের শেষ জীবন কাটে কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বাড়ীতে সংগীত চর্চা ক'রে। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সংগীত-গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশবলাল চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কলকাতায় বাস করতেন। এখানেই তিনি উচ্চদরের গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর বড় হওয়ার মূলে তদানীন্তন কলকাতার স্বনামধন্য ধনী নাগরিক তারকনাথ প্রামাণিকের দান অপরিসীম।

কেশবলাল চক্রবর্তীর তিন পুত্র রামতারণ চক্রবর্তী, রামসুন্দর চক্রবর্তী, আশুতোষ চক্রবর্তী—প্রত্যেকেই সংগীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

রামশঙ্করের আর একজন শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত দাঁতনা-মেদিনীপুরে ১৮১৩-এ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই কথকতা-র প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরে কথকতার উপযোগী গান শেখার জন্য সংগীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সংগীত গুরুর সংস্পর্শে এসে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে

তিনি কথকতা করাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং গুরুর অনুমতি পেয়ে তাঁর কাছেই উচ্চাঙ্গ সংগীত অনুশীলন করতে শুরু করেন।

কিছুকাল পর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। সেখানে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। প্রথিতযশা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংগীতজগতের দিকপাল স্বরূপ বাংলার ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন-এর সভায় তিনি শ্রেষ্ঠ সংগীতাচার্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সংগীত-শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রধান সহযোগী ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সংগীত-সাহিত্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দানও যথেষ্ট। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় কলকাতায় সর্বপ্রথমে যে 'বঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত সম্পর্কে কয়েকটী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেক গানও রচনা করেন।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অর্কেষ্ট্রা গঠন করেছিলেন। এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন যদুনাথ পাল। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের সময় ঐকতান বাদন দেওয়া হয়েছিল।[১]

ঠাকুরবাড়ী থাকাকালীন বারাণসীর বিখ্যাত বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের কাছে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ধ্রুপদ ও বীণাবাদ্য শিক্ষা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'একতানিক স্বরলিপি', 'সংগীতসার' 'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি', 'কণ্ঠকৌমুদী', 'আশুরঞ্জনী তত্ত্ব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্রমোহনের শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে তিন জন ছিলেন স্বনামধন্য—পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন, প্রতিভাদীপ্ত ও অসামান্য সংগীত-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ন্যাসতরঙ্গ বাদক এবং সেতারী সুরবাহারী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্য দীনবন্ধু গোস্বামী সংস্কৃতিসম্পন্ন গায়ক ছিলেন। তিনি সংগীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কৃতী শিষ্যগণের অন্যতম। দীনবন্ধু গোস্বামী

১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'ভারতীয় সাংস্কৃতির উৎসধারা' (১৩৭২-এর সংস্করণ), পৃঃ ৬৯৯-৭০০

খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী প্রকৃতি সব রকম গানেই অভিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য 'খেয়াল' গানেই তিনি যশস্বী হ'ন। তিনি সংগীত রচনাতেও দক্ষ ছিলেন।

ভারতবর্ষব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছিলেন বিষ্ণুপুরের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন যদুনাথ ভট্টাচার্য। তিনি প্রসিদ্ধ যন্ত্রসংগীত শিল্পী মধু ভট্টাচার্যের পুত্র ছিলেন। যদুনাথ পরে 'যদুভট্ট' নামে সংগীতজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সংগীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য যদুভট্ট পিতার কাছে সুরবাহার, সেতার, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রসংগীত অনুশীলন করেন। এই কারণে যদুভট্ট কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্রসংগীত এ সমান দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি দিল্লী গোয়ালিয়র, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ঐ সব স্থানে সে যুগের বিখ্যাত ওস্তাদদের সংস্পর্শে আসেন।

যদুভট্ট হিন্দীভাষাতে ভাবপূর্ণ সংগীত রচনা করতে পারতেন। হিন্দীভাষাতে তাঁর দখল থাকায় অ-বাঙালী সংগীত রসিকদেরও তিনি অতি সহজে মুগ্ধ করতে পারতেন। এজন্যই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর হিন্দী ও বাংলাভাষায় রচিত গানগুলি সংগীত বিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'সংগীত মঞ্জরী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজসভায় যদুভট্টকে সংগীতাচার্যপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। পঞ্চকোটরাজ তাঁকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দান করেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তাঁর সংগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সংগীত গুরুদের অন্যতম। ত্রিপুরার রাজসভায় থাকাকালে যদুভট্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিষ্ণুপুরে ফিরে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি চুয়াল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন।

সংগীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের পরলোকগমনের পর তাঁর কৃতী শিষ্যগণের প্রায় সকলেই অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভের আশায় বিষ্ণুপুর ছেড়ে কলকাতা বা অন্যান্য স্থানে চলে যান। মাত্র দুজন শিষ্য বিষ্ণুপুরে থেকে বাংলার এই সংগীত-তীর্থের গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধ-পরিকর হ'ন। এই দুই সংগীত-সাধক হলেন সংগীত গুরুর পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য এবং রামশঙ্করের প্রিয়তম শিষ্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্যের শূন্যপদ পূর্ণ করেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদের মর্যাদা সসম্মানে রক্ষা ক'রে গেছেন।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে সংগীত-গুরু রামশঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গুরুর দেহত্যাগের পর অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যার বিষ্ণুপুরের সংগীত-সিংহাসনে আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। তখন দ্বিতীয় গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরের মহারাজা। বিষ্ণুপুর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এই সময়ে কিছুটা ভাঙনের দিকে। কিন্তু অনন্তলালের আর্থিক লালসা ছিল না। তাই তিনি বিষ্ণুপুর রাজ্যেই থেকে যান। তাঁর চরিত্র এবং ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। মহারাজা গোপাল সিংহ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ সংগীত-নৈপুণ্য দেখে তাঁকে 'সংগীত কেশরী' উপাধি দান করেন। মহারাজের দুই পুত্র তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা ক'রে কৃতবিদ্য হ'ন।

মহারাজা গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরে সর্বপ্রথম সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটিকেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সংগীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয়। গোপাল সিংহের পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ দেবের রাজত্বকালে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠ-সংগীত শিক্ষাদানের ভার নেন। এই বিদ্যালয়টি আজও বিষ্ণুপুরেব সংগীতগৌরব অক্ষুন্ন রেখেছে।

এই সংগীত বিদ্যালয়ে সংগীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংগীত শিক্ষা ক'রে কালক্রমে যাঁরা দিকপাল সংগীতজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উদয়চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা সংগীত সমাজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ের আচার্য বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, নড়াজোল রাজসভার সংগীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান রাজসভার সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন চক্রবর্তী, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীতকেশরী অনন্তলালের কৃতী সন্তান।

এঁদের মধ্যে গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি তাঁর পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তের বছর ধ'রে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। তিনি খেয়াল গান শিক্ষা করেন প্যার খাঁ-র শিষ্য গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে। গুরুপ্রসাদ মিশ্রের বড় ভাই রামপ্রসন্ন মিশ্রের কাছে তিনি শিক্ষা করেন টপ্পা ও ঠুংরী। বর্ধমান রাজ তাঁকে 'সংগীত নায়ক' উপাধি দান করেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দান করেন 'স্বরসরস্বতী' উপাধি। তিনি পাঁচ হাজার ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা

আয়ত্ত করেছিলেন ব'লে জানা যায়। তিনি 'গীতমালা', 'তানমালা', 'সংগীত-লহরী', 'সংগীত চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ বিশারদ জগৎচাঁদ গোস্বামীর পুত্র সংগীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী আবাল্য সংগীতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। প্রায় বিশ বছর ধ'রে সংগীত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এই সাধনায় তাঁর গুরু ছিলেন সংগীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যদুভট্ট।

মহানগরী কলকাতাকেই তিনি তাঁর কষ্টার্জিত সংগীত-বিদ্যা প্রকাশের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন।

কলকাতায় রাধিকাপ্রসাদ বেতিয়া ঘরাণার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। বেতিয়া ঘরাণা মূলত ধ্রুপদ গানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও গুরুপ্রসাদ মিশ্র খেয়াল গানও করতেন। রাধিকাপ্রসাদ গুরুপ্রসাদের কাছে কিছু খেয়াল গানও শেখেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে জোড়াসাঁকোর ভবনে নিয়ে এসে তাঁর সংগীত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেন। এই সূত্রে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ভারত সংগীত সমাজের সংস্রবে আসেন; ফলে সারা ভারতে তাঁর সংগীত প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়ে। কিছুকাল পরে কাশীমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে সসম্মানে কাশীমবাজারে নিয়ে গিয়ে তাঁর সংগীত-সভায় আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেন।

রাধিকাপ্রসাদ তিন পুত্র রেখে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেন। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ গোস্বামীকে তিনি সংগীত বিদ্যা দান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। পরে রাধিকাপ্রসাদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে সংগীত শিক্ষা দেন। রাধিকাপ্রসাদের এই শিষ্যটি গুরুর মুখ উজ্জ্বল করেন।

ধ্রুপদ চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত বিশেষভাবে ধ্রুপদ-এর চর্চা ব্যাপকভাবে সুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চুঁচুড়া (হুগলী জেলার অন্তর্গত), কৃষ্ণনগর (নদীয়া জেলায়) এবং মুর্শিদাবাদ উচ্চাঙ্গ সংগীত, বিশেষভাবে ধ্রুপদ চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ওস্তাদ মান্ খাঁ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন। এর কাছাকাছি সময়ে ওস্তাদ

বড়ে মিয়াঁ, হাস-সু খাঁ, হরদু খাঁ, হীরা এবং বুলবুল মুর্শিদাবাদে এসে বাস করতে থাকেন। ওস্তাদ রসুল বক্স প্রথমে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। পরে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বসবাস আরম্ভ করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম্ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন ইংরাজের পেনসনভোগী নবাব এবং তাঁর সময়েই দিল্লীর দরবারের সংগীতজ্ঞরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন মুসলমান নবাব, হিন্দু রাজা এবং জমিদারদের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরূপ জানা যায় যে এঁদের অধিকাংশই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা দেশে স্থায়ী ভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। হায়দার খাঁ বেতিয়ায় চলে যান, ছজ্জু খাঁ যান লক্ষ্ণৌ-এ এবং ওস্তাদ মান খাঁ, ওস্তাদ বড়ে মিয়া, হস-সু খাঁ প্রভৃতি বাংলা দেশে আসেন।

চুঁচুড়ার রামচন্দ্র শীল ওস্তাদ মান খাঁর প্রথম শিষ্য। এছাড়া গোপাল চন্দ্র পাঠক, পরাণ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পাল, রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংগীতজ্ঞরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ওস্তাদ রসুল বক্সের যোগ্য শিষ্য ছিলেন রামদাস গোস্বামী। এই রামদাস গোস্বামীর কাছেই শ্রীরামপুরের নিমাইচাঁদ ঘোষাল এবং বারাণসীর হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। হরিনারায়ণ অবশ্য আরও কয়েকজন হিন্দু এবং মুসলমান ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ গান শিখেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের সংগীতজ্ঞরা হিন্দী, ব্রজবুলি এবং বাংলা—এই তিন ভাষাতেই ধ্রুপদ রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁরা এমনভাবে শব্দ চয়ন করেছেন যাতে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের স্বরবিন্যাসে অসুবিধা না হয়। এই সব গানের কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল:

'সংগীত মঞ্জরী' গ্রন্থে সংকলিত যদুভট্টের একটি গান—

তিলক-কামোদ। ঝাঁপতাল

কওন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ
আজু নয়ন নিরখি রঙ্গনাথ গাওএ।
তজি অগুরু চন্দন, বিভূতি অঙ্গ ভূষণ,
জটা মকুট ক্যায়সী বনি আওএ।

ক্যায়সো মুখমণ্ডল, ঝলস শ্রুতি-কুণ্ডল,
ভঙ্গী-চন্দ ভাল মৃগছাল পাওএ।
বরজি বর অম্বর, পহন বাঘম্বর
শীধ পর গঙ্গাধর ধরসি ধাওএ॥

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর একটী গান—

ছায়ানট। ঝাঁপতাল

নব ঘন বরণ জাকে ঝলক অতি সুন্দর,
নিরখ মন ভাওঅ লগী আ্যায়্সে নহী জগ পর।
মুরলী জব কর ধুন বস হোয় সকল জন,
তেজ প্রগট কিয়ো গোবরধন ধারণ কর।
অ্যায়্সে নিয়ে ত্রিভুবন পূজে তু আ চরণ,
ধন ধন তুঁ রাজ নন্দকুমার বর।
রাধিকাপ্রসাদ ক্যায়্সে চরণমেঁ শরণ পাওএ,
নিত নাম ভাওএ হো হো নবরূপ ঈশ্বর।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দিন উপাসনা শেষে 'শ্ব শ্বতমভয় শোকং', 'বিগত বিশেষং' এবং 'ভাবো সেই একে' এই তিনটি সংগীত গাওয়া হয়েছিল। এই তিনটি গানকেই প্রথম ব্রহ্ম-সংগীত বলা যায়। এই গানগুলিতে ধ্রুপদের ভাব-গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হয়। রামমোহন রায় উচ্চাঙ্গ সংগীতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এবং সংগীতকে পূর্ব গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সংগীতকে একটী বিশেষ অংগ রূপে পরিণত করেন। রামমোহনের গানগুলি শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ ও খেয়ালের সুর ও ছন্দ অবলম্বনে রচিত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ উপাসনা সভায় যোগদান করতেন। এই প্রসঙ্গে ওস্তাদ গোলাম রসুলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর সঙ্গে সংগত করতেন গোলাম আব্বাস।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা শহর উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্যতম কেন্দ্র ব'লে পরিগণিত হয়। এই উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১—১৯০৮) এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০—১৯১৪)। যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন কলকাতার পাথুরিয়া-

ঘাটার বিখ্যাত জমিদার হরকুমার ঠাকুরের পুত্র। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে যতীন্দ্রমোহন সাহিত্য এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহিত্য কীর্তি থাকলেও সংগীতজ্ঞ হিসাবে তিনি বেশী পরিচিত। দেশীয় সংগীতের সংস্কার এবং উন্নতির জন্য তিনি অজস্র অর্থব্যয় করেন। তিনি 'বেঙ্গল একাডমী অব মিউজিক'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'ফিলাডেলফিয়া' এবং 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধি লাভ করেন। তিনি কাশীতে এবং কলকাতায় মহম্মদ আলী খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট সেতার বাদক। ধ্রুপদে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় একটি সংগীত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিন্দু এবং মুসলমান ওস্তাদেরা জলসা ও মাইফিল উপলক্ষে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে থাকেন। এই সব জলসার প্রধান আকর্ষণ ছিল ধ্রুপদ গান। বরদা থেকে মৌলাবক্স, লাহোর থেকে আলিবক্স, দৌলত খাঁ এবং গয়া থেকে হনুমান দাসজী প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদরা কলকাতায় আসতে থাকেন।

পাথুরিয়া ঘাটার যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন ছাড়া বাংলা দেশের আর যাঁরা ধ্রুপদ চর্চায় সাক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেতিয়ার মহারাজা আনন্দ কিশোর এবং মহারাজা নওল কিশোর; গৌরীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী; মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, মুক্তাগাছার জগৎকিশোর আচার্য, গোবর ডাঙার বাবু শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, উত্তর পাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর, নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়, আগরতলার রাজা বীরবিক্রম বাহাদুর প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যে সব ওস্তাদ আসতেন তাঁরা সবাই ধ্রুপদ গাইতেন বটে তবে তাঁদের গায়নভঙ্গী একরূপ ছিল না; তার ফলে বিভিন্ন ধ্রুপদী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

বাইরে থেকে যে সব ধ্রুপদী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় আসেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলী খাঁ এবং উজীর খাঁ-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলী মহম্মদ খাঁ-র কাছে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ধ্রুপদ শিক্ষা করেন।

আমীর খাঁ-এর পুত্র উজীর খাঁ উনবিংশ শতাব্দীর একজন নামকরা ধ্রুপদী।

আনুমানিক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি পিতার নিকট ধ্রুপদ এবং বীণাবাদ্য শিক্ষা করতে থাকেন। রবাব যন্ত্রেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি মতামহ বাহাদুর সেনের কাছ থেকেও ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। ফলে একই সঙ্গে তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রামপুরের নবাব কাল্বে আলি খাঁ-র দরবারে তিনি প্রতিপালিত হ'ন। কাল্বে আলি খাঁ-র মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হায়দার আলি খাঁ তাঁকে বিলসিতে নিয়ে যান। রামপুর ও বিলসিতে অবস্থানকালে তিনি সংগীত শাস্ত্র এবং হিন্দু ও মুসলমানী শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন। তিনি শুধু গান রচনা নয় নাটক রচনা এবং চিত্রাংকনেও পারদর্শী ছিলেন।

উজীর খাঁ-র দুই মাতামহ সাদেক আলি খাঁ ও নিসার আলি খাঁ বারাণসীতে রাজসভার গায়ক ছিলেন। উজীর খাঁ এখানে নিসার আলি খাঁ-এর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। এই কাশী থেকেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় তিনি সাত-আট বছর ছিলেন। তাঁর মাতুল কাশিম আলি খাঁ ছিলেন ত্রিপুরার রাজদরবারে। এই দরবার থেকে উজীর আলি খাঁ বিশেষ সম্মান লাভ করেন। দ্বারভাঙ্গা, ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজদরবারে তিনি গান গেয়েছেন। কলকাতায় মেটিয়াবুরুজের নবাব পরিবার থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন রাজবাড়ীতে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়েছেন। কলকাতায় কয়েক বছর থাকবার পর উজীর খাঁ রামপুরের নবাব হামেদ আলি খাঁ-র সংগীত-গুরুর পদ গ্রহণ ক'রে সেখানে যান। শুধু নবাব নয় আরও কয়েকজনকে তিনি এখানে ধ্রুপদ এবং বীণাবাদন শিক্ষা দেন। এঁদের মধ্যে আছেন পঞ্চেৎগড়ের রাজা যাদবেন্দ্রবাবু, নাসির আলি, মহম্মদ হোসেন, আবদার রহিম, হাফেজ আলি এবং আলাউদ্দীন খাঁ প্রভৃতি।

উজীর খাঁ-র তিন পুত্র নাজির খাঁ বা প্যারে মিয়াঁ, নাসির খাঁ, এবং সগীর খাঁ পিতার মতই গুণী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খাঁ এবং পৌত্র দবীর খাঁ বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম ধ্রুপদী। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে উজীর খাঁ পরলোক গমন করেন।

এই কলকতা শহরে যে সব সংগীতজ্ঞ ধ্রুপদ গানকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র, বিশ্বনাথ ধামারী, সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু), মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সংগীত জগতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বল রত্ন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সংগীতের সাধনা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি ধ্রুপদ গাইলেও ঠুংরীর বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সংগীতের সুরমিশ্রণেও তাঁর সমর্থন ছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ ওস্তাদই বাংলা ভাষায় লেখা ধ্রুপদ, খেয়াল গান না—এ ব্যাপারটী কৃষ্ণধনকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছেন। তিনি 'বাঙালীর কবি ও কলাবৎ' উভয়কে এক হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থটিতে সংগীতের মূল পদ্ধতি নিয়ে মূল্যবান আলোচনা আছে। এছাড়াও তিনি 'Hindusthani airs arranged for the pianoforte,' 'সংগীত শিক্ষা', 'সেতার শিক্ষা', 'বঙ্গ ঐকতান' পুস্তক রচনা করেন।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ঠুংরী গায়ক হিসাবে পরিচিত হলেও তিনি যে একজন উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদী ছিলেন একথাও সত্য। তিনি খেয়ালও গাইতে পারতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের যখন অবসান হয় (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ) তখন তিনি কলকাতায় আসেন। বহরমপুরে তাঁর জন্ম (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে)। তিনি প্রথমে আর্টস্ স্কুলে চিত্রাংকন বিদ্যা শিক্ষা করেন। আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি বড় বড় সংগীতজ্ঞের নিকট সংগীত শিক্ষালাভ করতে থাকেন। তিনি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ে আট বছর ধ'রে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তিনি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ, নবাব ছম্মন সাহেব ও উজীর খাঁ-এর কাছে হোরি ধ্রুপদের তালিম নেন। তিনি খেয়াল শিক্ষা করেন ওস্তাদ মুন্নে খাঁ এবং দিল্লীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ খেয়ালী মুজাফ্ফর খাঁ-র কাছে। তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সহায়তায় গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক ভাইয়া সাহেব, গণপৎরাও এবং মইজুদ্দীনের কাছে ঠুংরী শিক্ষা করেন।

বাংলাদেশে ধ্রুপদের প্রচার প্রসঙ্গে আরও যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন—সংগীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০—১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে), অমরনাথ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মৃত্যু ১৯৬৪) প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশক, রবীন্দ্রনাথের যখন শৈশবকাল, সেই সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে ধ্রুপদ গানের ব্যাপক চর্চা ছিল। ঠাকুর বাড়ীতে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হত তার বেশীরভাগই ছিল ধ্রুপদ এবং ধামার। "উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গান শিশুরাও গাইত, কারণ বাড়ীর নানা উৎসবের জন্য রচিত বাংলা ধ্রুপদ গানে তাঁদের যোগ দিতে হত। শিশু বয়সেই মাঘোৎসবে

গুরুদেবও বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গান গাইতেন।"[১] এইজন্য ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত রবীন্দ্রনাথের ওপর শিশুবয়সেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রে। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন। "মোট কথা ধ্রুপদ গান গাওয়া ছিল তখনকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ও স্বাভাবিক। বাংলাদেশের জলবায়ুতে দিল্লী গোয়ালিয়র থেকে আমদানী করা ধ্রুপদ গান বেশ একটু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং পরে তার বিকাশক্ষেত্র বোধ হয় বাংলাদেশেরই মর্যাদার কৃতিত্ব ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। এখনও সেই স্বকীয়তা বাংলাদেশ বজায় রেখেছে বললে অসঙ্গত বলা হ'বে না।"[২]

রাজা রামমোহনের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-এর প্রচেষ্টায় উপাসনা গৃহে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীতের বিশেষভাবে ধ্রুপদ. সংগীতের ধারায় ব্রহ্মসংগীত চালু হয়। দেবেন্দ্রনাথ নিজে এই ধরণের উচ্চাঙ্গ সংগীত রচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী সংগীতের পথচারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন অগ্রণী। তাঁর রচিত "কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে জগত জননি, দূর কর ভয়, ভীত যে আমি" (সিন্ধু রাগ, চৌতাল), "বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিব-সুন্দর, অরূপ সে রূপ হেরি, অনন্দে হও মগন" (জয়জয়ন্তী রাগ, ঝাঁপতাল) প্রভৃতি ধ্রুপদ গান বিখ্যাত হয়ে আছে। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথের "হৃদয়চাতক মোর চায় তোমারি পানে শান্তি দাতা ; শান্তি-পীযুষবারি হে বরিষ বরিষ" (নটনারায়ণ রাগ, চৌতাল), হেমেন্দ্রনাথের "আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি, হৃদাকাশ মাঝে কত চন্দ্রমা বিরাজে" (শঙ্করাভরণ রাগ, চৌতাল), প্রভৃতি গান ধ্রুপদ সংগীতের ঐতিহ্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী বিষ্ণু চক্রবর্তী এবং শ্রীকণ্ঠ সিংহ। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক। এই বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, "বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদরা যেমন তান-অলঙ্কারে প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমনি কিছু করিতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন

১। শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসংগীত', কলিকাতা (১৩৬৯), পৃঃ ৩১।
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান,' কলিকাতা (১৯৬৫), পৃঃ ৬৩

না। ইহা ছাড়া, কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটাও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ-খেয়ালই বেশী গাহিতেন।"

দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপাসনা সংগীত রচনার পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের দাদারা সে যুগের বড় বড় ওস্তাদদের সহযোগিতায় প্রায় ষাট্টী ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। "এই সব গান রচনায় যে কয়জন বড়ো বড়ো ওস্তাদ তাঁদের সাহায্য করেছিলেন তার মধ্যে গৃহশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের রাজচন্দ্র রায় ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[১] ঠাকুর বাড়ীতে ওস্তাদরা নিয়মিত আসতেন এবং আশ্রয় গ্রহণ ক'রতেন। "বাংলা দেশের বাইরের ওস্তাদদের মধ্যে বরোদার তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও তাঁদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। অযোধ্যা, গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকে ওস্তাদরা তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন।"[২]

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে সবাই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বড় ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সে যুগের নামকরা সেতারী জুয়ালা প্রসাদের শিষ্য। সারদাপ্রসাদ ধ্রুপদ গানও গাইতেন।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে যাঁরা তাঁর মনে সাংগীতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী ছাড়াও শ্রীকণ্ঠ সিংহ, এক অজানা গাইয়ে এবং যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকণ্ঠ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন……তাঁর একটা প্রিয় গান ছিল—ম্যায় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী। এই গানটি আমার মুখে সকলকে গান শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ম্যায় ছোড়োঁ', সেইখানটীতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।"[৩]

১। শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসংগীত', কলিকাতা (১৯৬২), পৃঃ ৩১
২। ঐ ঐ পৃঃ ৩১
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীত চিন্তা', কলিকাতা (১৯৬৬) পৃঃ ১৮৩-৮৪।

বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য হ'ল, "বাঙলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"

এই সমস্ত ওস্তাদের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথও বেশ কিছু সংখ্যক ধ্রুপদ ও ধামার গান রচনা করেন। তাঁর ধ্রুপদ গানের মধ্যে রয়েছে "(তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন" (বড়হংস-সারং, চৌতাল), "বাণী তব ধায় অনন্ত গগণে লোকে লোকে" (আড়ানা, চৌতাল), "আমারে করো জীবন-দান" (শঙ্করা, চৌতাল) প্রভৃতি এবং ধামার গানের মধ্যে রয়েছে, "বীণা বাজাও হে মম অন্তরে" (পূরবী, ধামার), "এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়" (বাহার, ধামাব), "গরব মম হরেছ প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ" (দেশ-মল্লার, ধামার) প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ চৌতাল ছাড়াও আড়াচৌতাল, তেওড়া, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, রূপক প্রভৃতি তালে বহু ধ্রুপদ গান রচনা করেন।

খেয়ালের চর্চা

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে বৃহত্তর বঙ্গে (অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলা দেশ, আসাম, ওড়িষ্যা ও বিহার) ধ্রুপদের চর্চা চ'লে আসছে। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনেরা হিন্দু এবং মুসলমানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে দক্ষ ছিলেন। তাঁরা শুধু গায়ক ছিলেন না, সংগীত শাস্ত্রেও তাঁদের বিশেষ দখল ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বামী কৃষ্ণদাস ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে 'গীতপ্রকাশ' নামে সংগীত সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। এই ষোড়শ শতকেই নরোত্তম দাস ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন প্রবর্তন করেন। হরিনারায়ণ সুধী, গজপতি নারায়ণ দেব, কবি নারায়ণ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যে সব সংগীত গ্রন্থ রচনা করেন তা থেকে বোঝা যায় যে বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা অব্যাহত ছিল। নরোত্তম দাস, ঘনশ্যাম, নরহরি দাস প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সময়ে খেয়াল গান বাংলা দেশে আসেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা দেশে 'টপ্পা' এবং 'টপ্-খেয়ালের' (বা টপ্খ্যাল) প্রচলন হয়। এই যুগে যাঁরা টপ্পা এবং টপ্খেয়ালের প্রচলন করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রভৃতি। টপ্-খেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল টপ্পা এবং খেয়াল রীতির মিশ্রণে।

এটা একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব রীতি। এতে মোটা দানার তান ও গমক-গিটকিরির অলংকার ছিল।

এখানে টপ্‌খ্যাল-এর একটি নমুনা দেওয়া গেল। গানটি শোরী মিঞার রচনা—

টপ্‌খ্যাল

ভৈরবী-বাহার। মধ্যমান

কি বহার রন্দিনা লে চম্পেদি ডারিয়াঁ।
হেরিয়াঁ ভেবিয়াঁ শুনায়ে সাখিয়াঁ মান
করন্দা রঙ্গবে লিয়া উমঙ্গ সোঁ।
শোরীরাগ বহার মান্ খুশ রঙ্গ
প্যারা তোম্ মিল ররিয়াঁ॥

সর্ণা ণণা -ণর্সা I
কি বহা র্‌০

১ ২
II ণর্স: -ণ০ণ:০ দণদা পা ম: | দদপমা -পমজ্ঞা -মজ্ঞমা ণদা |
র০ ০ন্ দি০ না লে চ০০০ ম্পে০ ৩০দি ডা০

০ ॥ ৩
| -ণদণা র্সা -া ন: ন: | র্সা: র্র্: র্সর্স: ণ০ -দা০ I
০০রি য়াঁ ০ হে রি য়াঁ ভে০ রি৩ য়া০ ০

১´ ২
I প: পা ম: ণদা -ণ০ -দ:০ | ন: র্সা: -নর্সর্রা -র্সনর্সা I
শু না ৩ য়ে০ ০ ০ স খি ০০০০ ০০ ০

০ ৩
| -া ণদা: র্সা -র্: ণ: | র্স: জ্ঞর্জ্ঞ: র্ঋ০ র্স:৩ ণদা: I
০ য়াঁ৩ মা ০ ন ক র০ ০ ন্ দা

১ ২

I পমা -দপা মজ্ঞা -া | -মঋা সা -া দা I
র০ ঙ্গ রে ০ ৩লি য়া ০ উ

০ ৩

| -ঃমা জ্ঞা মদণর্সা -ঋর্সঃ | -ণদপপা র্সা ণণা -ণর্সা II
০মঙ্ গ সৈ০০০ ০০ ০০০০ "কি বহা ০র"

৩

জ্ঞর্জ্ঞা | -ঃর্সঋ জ্ঞর্মা র্মজ্ঞঋর্জ্ঞা ঋঃ র্সা I
শোরী ০বা০০০ ০০০০ গ ব

১´ ২

II ণর্সঋর্সা ণর্সঃ -ণ০দঃ০ মঃণ০দঃ০ | ণঃ ণঃ র্সা র্সঃ ণর্সঃ জ্ঞর্মঃ র্পর্পঃ I
হাঁ০০০ ০০ ব ০ মা ণু০ খু শ রঙ্ গ প্যারা তোম মিল

০ ৩

| -ঃদদণর্সা -জ্ঞর্জ্ঞর্রর্রা -জ্ঞর্মজ্ঞর্রা -জ্ঞর্সঃ | ণদপপা র্মা ণণা -ণর্সা II II
০বাঁ০০০ ০০০০ ১০০০ ০রি য়াঁ০০০ "কি বহা ০র"

এই সময়ে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শুধু যে চর্চাই ছিল তাই নয়, বাংলাদেশ তার নিজস্ব গায়ন-রীতির উদ্ভব ঘটাচ্ছিল। বাংলার দেবীমণ্ডপে, বৈঠকখানায় শ্যামাসংগীত, বাংলা টপ্পা এবং টপ্-খেয়াল প্রভৃতি 'বৈঠকী' গানের আলোচনা হ'ত। এই সময়ে প্রসিদ্ধ কবিয়াল হরু ঠাকুর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, দেওয়ান রামদুলাল, কবিয়াল রাম বসু প্রভৃতি বহু সংগীত রচনা করেন। এই-সময়ে নূতন ঢং-এর উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং রোমান্টিক টপ্পা ও টপ্-খেয়াল বাংলা-দেশে খুবই জনপ্রিয় হয়। রামনিধি গুপ্ত নূতন ধরণের টপ্পা[১]-র প্রবর্তন ক'রে

১। Captain N. Augustus Willard তাঁর 'Treatise on the Music of Hindoostan নামক বইতে লিখেছেন "টপ্পারীতির গান পাঞ্জাবের উষ্ট্রচালকদের জাতীয় সংগীত ছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক শোরী মিঞা তাকে নানা অলংকারে ভূষিত ক'রে উন্নত করেছেন।" পাঞ্জাবী উপভাষায় টপ্পা রচনা করলেও তিনি অযোধ্যার লোক। তাঁর প্রকৃত নাম গোলাম নবী। তিনি তাঁর প্রণয়িনী বা স্ত্রী শোরীর নামে ভনিতা দিয়ে গাইতেন। এই জন্যই শোরী মিঞা টপ্পা রচয়িতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটা নবজাগরণ সৃষ্টি করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন, "Specially Rāmnidhi Gupta brought a renaissance in the classico-Bengali songs by composing and improvising new type of tappā, and from this it can be presumed that tappā was introduced in Bengal earlier than Hindusthāni Kheyāl and that Bengal of the 18th-19th century had her full share of the legacy of traditional music; which came to be known as the aristocratic vaithaki sangita."[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটা নূতন জাগরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ, যেমন—বসন্ত, গৌড়ী, সাহানা, পূরবী বা পুর্ব্বী, বাগেশ্রী, লুম, খাম্বাজ, ভীমপলশ্রী, মূলতান প্রভৃতি রাগে এবং আট মাত্রার যৎ, ১৬ মাত্রার আড়াঠেকা, বত্রিশ মাত্রার মধ্যমান, বারো মাত্রার একতাল (ত্রিমাত্রিক), আড়া, পোস্তা প্রভৃতি তালে বাংলা গান স্বতন্ত্ররূপ নিয়ে বিকশিত হ'তে থাকে। এই সময়ে বাংলা গানে রাগরূপ ও গীত-রীতি হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল এবং এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পাঁচালী গায়ক দাশরথী রায়, রসিকচন্দ্র রায়, নাট্যকার মনোমোহন বসু, শ্রীধর কথক, যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী, ঢপ গায়ক মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান প্রভৃতির গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই নূতন রূপ ফুটে ওঠে। বাংলার কৃষ্ণযাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান, ঝুমুর, কবিগান, তরজা, শ্যামাসংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে পাঁচালী, টপ্পা এবং টপখেয়াল প্রভৃতি রাগাশ্রয়ী গানের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। ঠিক এই সময়েই দেখা যায় কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চল, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, হুগলী, গোবরডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, আগরতলা (ত্রিপুরা), আসাম-গৌড়ীপুর এবং বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত নাটোর, মৈমনসিংহ, গৌড়ীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে রাজা মহারাজা এবং জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধ্রুপদ এবং খেয়ালের চর্চা হ'তে থাকে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই চর্চা সম্ভব হওয়ার কারণ, এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান বহু ওস্তাদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা হলেন রহিম বক্স, মহম্মদ খাঁ, মান খাঁ,

১। Swami Prajnānānanda, 'A Historical Study of Indian Music', Calcutta (1965), pp. 220-221.

বড়ে মিয়াঁ, হদ্দু খাঁ, দেলোয়ার খাঁ, হস্‌-সু খাঁ, নবী কাওয়াল মিরণ, ইমদাদ হোসেন খাঁ, আলি বক্স, ককুভ খাঁ, নিয়ামৎ উল্লা খাঁ, দৌলৎ খাঁ, নাম্রে খাঁ, উজীর খাঁ, বসৎ খাঁ, কালে খাঁ, মোরাদ আলি খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, আলাদিয়া খাঁ, মৌলা বক্স, আমীর খাঁ, সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, কৈয়াজ খাঁ, রজবআলি খাঁ, রহমৎ খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েৎ হোসেন খাঁ, কাশেমআলী খাঁ, খলিফা বাদল খাঁ, পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, ভাস্কর রায় (বুয়া), রামচন্দ্র শীল, গোপালচন্দ্র পাঠক, শিবনারায়ণ মিশ্র, রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ মিশ্র, বিশ্বনাথ রাও, গয়ার হনুমান দাসজী, সোনীজী, লক্ষ্মী প্রসাদ, ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও, মৈজুদ্দীন খাঁ. অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী, যদু ভট্ট, মুলো গোপাল (প্রসাদ মুখোপাধ্যায়), রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতি। তাঁরা সবাই ধ্রুপদ এবং খেয়াল এই দুই প্রকার 'গানেরই চর্চা করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌড়ীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নাটোরের মহারাজা, মুক্তাগাছার সূর্যকান্ত আচার্য, গোবরডাঙ্গার শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরার বীরবিক্রম বাহাদুর, পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলকাতার শ্যামলাল ক্ষেত্রী, শেট দুলিচাঁদ বাবু, লালচাঁদ বড়াল, প্রভৃতি ধ্রুপদ এবং খেয়াল দুই ধারারই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

হিন্দুস্থানী খেয়াল বাংলাদেশে প্রথম প্রচার করেন হরিনাভির অঘোরনাথ চক্রবর্তী, কলকাতার মুলো গোপাল এবং শিবনারায়ণ মিশ্র, পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি। অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী এবং মুলো গোপাল ধ্রুপদী হিসাবেই বেশী পরিচিত। তবুও খেয়াল গানে তাঁদের দক্ষতা কম ছিল না। তাঁরা ধীরগতির গমকের তানযুক্ত বিলম্বিত-খেয়াল গাইতেন। অঘোরনাথ চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শিবপুরের নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, হরেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি অনেক বাংলা গান রচনা করে হিন্দুস্থানী ঢং-এ পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সংগীত শিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুস্থানী এবং বাংলা খেয়াল গানের প্রচলন করেন।

এই সময়ে অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রমুখ সংগীতজ্ঞ যাঁরা ধ্রুপদ গান গাইতেন তাঁরা গানে সামান্য বিস্তার ক'রে, দু-একটি বাঁটের ব্যবহার ক'রে টপ্পা ভঙ্গের তান প্রয়োগ করতেন। অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর "দানাদার

টপ্পার তান"-এর কথা দিলীপকুমার রায় উল্লেখ করেছেন ('সাঙ্গীতিকী', ১৯৩৮, পৃঃ ১৫৯)। সুরেন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই পশ্চিম ভারতে মানুষ। তাই হিন্দুস্থানী গায়নরীতি তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাঁর গান সম্পর্কেও দিলীপকুমার রায় বলেছেন, "বাংলা গানে কথার স্বরবর্ণে তানকে সহজ ক'রে গাঁথায় তাঁর জুড়ি ছিল না সে সময়ে। 'রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'আমার মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে', 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো', 'কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল', 'বিয়োগ বিধুরা রাজবালা' প্রভৃতি গানে তিনি হিন্দুস্থানী টপ্ খেয়ালের যে-লীলায়িত আনন্দের ঢেউ তুলতেন তাতে রসজ্ঞমাত্রেরই প্রাণ উঠত দুলে।"[১] এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল দু'জনেই ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এই তিন শ্রেণীর গানই রচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল যেমন ধ্রুপদের দিকে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবণতা ছিল তেমনি টপ্ খেয়াল এবং খেয়ালের দিকে। দ্বিজেন্দ্রলালের, "আজিগো তোমার চরণে জননি" (ইমন কল্যাণ, একতালা), "আজি নূতন রতনে" (ভৈরবী, ত্রিতাল) প্রভৃতি খেয়াল এবং "আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে" (ভৈরবী, মধ্যমান), "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে" (নটমল্লার, যৎ), "আজি তোমারি কাছে ভাসিয়া যায়" (ঝিঁঝিট, মধ্যমান) প্রভৃতি টপ্-খেয়াল।

এঁদের সমসাময়িক অতুলপ্রসাদ সেন এর গানে যদিও ঠুংরী-রীতির প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায় তথাপি তিনিও টপ-খেয়াল রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ "পাগলা মনটা-রে তুই বাঁধ" (ভৈরবী, একতাল), "কি আর চাহিব বল" (ভৈরবী, যৎ) প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যায়।

এই যুগের বিখ্যাত দু'জন আলাপীয়া সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আব্দুল করিম খাঁ (মৃত্যু—২৭-১০-১৯৩৭)। তাঁদের আলাপ শ্রুতি, গ্রাম, বাদী, বিবাদী-র প্রাণহীন বৈয়াকরণিক কসরৎ ছিল না। তাঁদের আলাপে ছিল শাস্ত্ররস সমৃদ্ধ গভীর সুরব্যঞ্জনা। সেই আলাপ ছিল অন্তর্মুখী; সেই আলাপের মধ্য দিয়ে রাগের একটী ধ্যান-মূর্তি ফুটে উঠত। আব্দুল করিম খাঁ-ই খেয়ালে প্রথম আলাপ সংযোজিত করেন এবং তিনিই প্রথম খেয়ালে সরগম (স্বরগ্রাম) ব্যবহার করেন।

১। দিলীপকুমার রায়, 'সাঙ্গীতিকী', কলিকাতা (১৯৩৮) পৃঃ ১৬২।

বাংলা দেশে খেয়াল গানের প্রচলন হওয়ার পরে ওস্তাদ নামে খাঁ খেয়াল-এ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত লয়ে খেয়াল গাইতেন। তাঁর পরে কলকাতায় আসেন ওস্তাদ কালে খাঁ এবং মৈজুদ্দিন খাঁ। বাংলা দেশে এই তিন জনই প্রথম খেয়ালে দ্রুত 'হল্‌কা' তান ব্যবহার করেন। গওহরজান এবং আরও অনেকে ওস্তাদ কালে খাঁ-র নিকট খেয়াল শিক্ষা করেন। বাংলা দেশে খেয়াল গান প্রচারের সঙ্গে যাঁদের নাম যুক্ত তাঁদের মধ্যে আগ্রার ফৈয়াজ খাঁ, গয়ার হনুমান দাসজী, নসিরুদ্দিন খাঁ, গোয়ালিয়ারের খলিফা বাদল খাঁ, বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুপদ ও খেয়ালের ঘরাণা

উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে 'ঘরোয়ানা' বা 'ঘরাণা' কথাটি রীতিমত চালু আছে। সংস্কৃত 'গৃহ' শব্দ প্রাকৃতে গৃহ > বাংলায় এবং হিন্দীতে 'ঘর' শব্দটির সৃষ্টি। এই ঘর বলতে শুধু প্রকোষ্ঠ নয় সংসার, পরিবার বা বংশও বুঝায়। সংগীতে 'ঘরাণা' শব্দের অর্থ বংশ-বৈশিষ্ট্য বুঝায়। অবশ্য বংশ শব্দটির অর্থ এখানে ব্যাপক অর্থাৎ শুধু পুত্র-কন্যা পরম্পরায় নয় শিষ্য-শিষ্যা পরম্পরায়ও এই বংশ-বৈশিষ্ট্য ধরা হয়ে থাকে।

এক একটি ঘরাণায় সংগীতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য থাকে বলেই বিভিন্ন সংগীতজ্ঞের সংগীত বিভিন্ন আস্বাদন সৃষ্টি ক'রে থাকে। গুরুর কাছে শিক্ষাকালীন গুরু দ্বারা শিক্ষা যথাযথভাবে অনুকরণ ক'রে গাওয়াকে নায়কী বলে। এক্ষেত্রে গায়কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। কিন্তু গুরুপরম্পরায় নায়কী শিক্ষালাভের পর গুরুমুখী প্রাপ্ত জ্ঞান এবং অন্যান্য গুণীদের সংগীত শ্রবণ ক'রে নিজ প্রতিভার দ্বারা রাগ-রাগিণীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাকে গায়কী বলা যায়। গায়কের এই যে নিজস্ব গাইবার ভঙ্গী, রীতি-পদ্ধতি বা ষ্টাইল—এই হচ্ছে ঘরাণার ব্যাবহারগত অর্থ। গায়কের ভাব-কল্পনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব নূতন ভঙ্গী বা ষ্টাইলের সৃষ্টি করে এবং তাঁর থেকেই শিষ্যপরম্পরায় একটি ঘরাণা চলতে থাকে। "কোন সংগীতবিদ্ তাঁহার প্রতিভাগুণে কোনও নূতন পদ্ধতি অথবা নূতন অলংকারের ধারা প্রয়োগ করিলে এবং সেই পদ্ধতি বা অলংকার-ধারা তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় প্রচলিত হইলে একটি ঘরাণার সৃষ্টি হইয়া থাকে।[১]

এই 'ঘরাণা' কথাটির সঙ্গে আবার 'খান্দানী—এই বিশেষণটি যোগ করা হয়ে থাকে। 'খান্দান্'—এই পার্শী শব্দটির অর্থ বংশ। এইজন্যই 'ঘরাণা' ও 'খান্দানী' কথা দুটি আবার সমার্থক বলে প্রতিভাত হয়। তবে, খান্দানীর প্রকৃত অর্থ বংশগৌরবযুক্ত। কিন্তু কিসের গৌরব? এ সম্পর্কে অমিয়নাথ সান্যাল বলেছেন, "যে বংশের বা সংগীত সম্প্রদায়ের কোন শিল্পী পূর্বেকার কোনও বাদশাহী আমলে শাহের সভায় যাতায়াত করতেন ও খাতির পেয়েছিলেন, সেই

১। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, 'ভারতীয় সংগীতকোষ', কলিকাতা (১৩৭২), পৃঃ ৩২

বংশের সৌভাগ্যের কারণেই পরবর্তী বংশধরেরা খানদানী মর্যাদা দাবী করতেন। পরে শব্দটী আর 'ঘরাণা' শব্দ প্রায় এক রকম অর্থে প্রয়োগ করা হ'তো। তখনকার কালে অর্থাৎ আমাদের কালে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল—তানসেনের দৌহিত্র বংশের প্রখ্যাত গুণী পুরুষ রামপুর ষ্টেটের ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব। বংশানুক্রমে এই ধারা বাদশাহ বা শাহদের সংশ্রব বজায় রেখেছিল। অথচ তানসেনের পুত্র-পৌত্রদের ধারা পশ্চিমদিকে চলে গিয়ে যে সেনী ঘরাণা বা পঁছাওবাজী সম্প্রদায় নামে অভিহিত হতো তাকে খানদানী বলা হতো না। কারণ বাদশাহ বা শাহদের সাক্ষাৎ পোষকতা থেকে ঐ সম্প্রদায় বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল।··· খেয়ালীদের মধ্যে গোলাম আব্বাসের ঘরই খানদানী।"[১]

ঘরাণার মূল কথা হচ্ছে গায়ন পদ্ধতির বিশেষ ষ্টাইল। যদিও কোন কোন বিশেষ গানের বাণীকে কোন বিশেষ ঘরের গান ব'লে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তথাপি গানের বাণীটাই প্রকৃতপক্ষে আসল নয়। সুর তথা রাগ ও তালের প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যই ঘরাণার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে সামাজিক রুচিও দায়ী। তাছাড়া এই গায়কী সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভিত্তিও অস্বীকার করা যায় না। ধ্রুপদ গান বিভিন্ন অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক সময়ে বিভিন্ন শিল্পীর মাধ্যমে গৌড়হার, ডাগর, খাণ্ডার, নৌহার—এই চারটি গায়কী ঢং-এ আত্মপ্রকাশ করেছিল। "অবশ্য এর সংগে রীতি, বৃত্তি, রসাদিরও সম্পর্ক ছিল। বৈদর্ভী বা বৈদর্ভিকা, পাঞ্চালিকা, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি, কৈশিকী, আরভটী, সাত্ত্বত্যভিখ্যা প্রভৃতি বৃত্তি এবং শান্ত, শৃঙ্গারাদি রস পদ্ধতি বৈচিত্র্যের সৃষ্টির পক্ষে কতকগুলি কারণ বটে। তবে বিভিন্ন স্থানের বা শিল্পীর বিকাশভঙ্গির পার্থক্যই ঘরোয়ানা-সৃষ্টির পিছনে মূল কারণ।"[২]

গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গানের ষ্টাইল চলতে থাকে। এ থেকে আবার শাখা সৃষ্টি হয়। প্রধানত দেখা গেছে যে কোন বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করে যেমন শিল্পীর বিশেষ প্রকাশ বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয় তেমনি সেই স্থানের নামানুসারেই ঘরাণা-র নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন, গোয়ালিয়র ঘরাণা, আগ্রা ঘরাণা, দিল্লী ঘরাণা, উদয়পুর ঘরাণা, অত্রৌলী ঘরাণা, বারানসী ঘরাণা, বিষ্ণুপুর ঘরাণা, জয়পুর ঘরাণা, কিরাণা ঘরাণা, পাঞ্জাব ঘরাণা, অযোধ্যা ঘরাণা, লক্ষ্ণৌ ঘরাণা, বুন্দি ঘরাণা বিষ্ণুপুর ঘরাণা প্রভৃতি।

১। 'স্মৃতির অতলে', কলিকাতা (১৩৫৯), পৃঃ ৫০
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান', কলিকাতা (১৯৬৫) পৃঃ ৬৭।

একই ঘরাণার যেমন বিভিন্ন শাখা পাওয়া যায়, তেমনি আবার একই স্থানের নামাঙ্কিত বিভিন্ন ঘরাণা পাওয়া যায়। যেমন সেনী ঘরাণায় তিনটী শাখা। আবার ধ্রুপদের দিল্লী ঘরাণা যেমন আছে, তেমনি খেয়ালের দিল্লী ঘরাণাও রয়েছে। শিল্পীর নামাঙ্কিত ঘরাণার মধ্যে তানসেনী বা সেনী ঘরাণা অনেকের মতে প্রধান।

ঘরাণা-র বৈশিষ্ট্য

কণ্ঠ-সংগীত এবং যন্ত্র সংগীত দু'-এরই ঘরাণা আছে। কণ্ঠ-সংগীতের ক্ষেত্রে বাণীর উচ্চারণের কায়দাই ঘরাণা-র প্রধান বৈশিষ্ট্য. বিভিন্ন ঘরাণায় গানের কথা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন, কখনো অর্ধ-উচ্চারিত, কখনো অনুচ্চারিত, এবং কখনো গমক সহকারে পরিবর্তিত আবার কখনো বা ছেদ অথবা দম প্রযুক্ত—বাক্য রূপান্তরিত, কখনো আবার উচ্চারণের সময় অতিরিক্ত স্বরও (vowel) যোগ করা হয়। অবশ্য উচ্চারণের ব্যাপারে আঞ্চলিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না; তবে সুরের প্রয়োজনে গায়কেরা ব্যক্তিগত কায়দা দেখাতে গিয়ে উচ্চারণের পরিবর্তন ক'রে থাকেন। গায়কীর কায়দায় উচ্চারণ স্বতন্ত্র হলে একই বাণী অন্যরূপ শোনায়। অবশ্য উচ্চারণ ছাড়া আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ঘরাণার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ ক'রে সেগুলি এই: গমকের প্রাধান্য বা স্বল্পতা, অলংকারের প্রাধান্য বা কম ব্যবহার, বাঁটের অনুপস্থিতি, মীড়ের কাজের প্রাচুর্য, রাগরাগিণীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ স্বরের বিশেষভাবে ব্যবহার বা বিশেষ স্বর বর্জন ঘরাণার বৈশিষ্ট্য সূচিত ক'রে। যেমন পাতিয়ালা ঘরাণার বিখ্যাত ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ মালকোষ রাগে পঞ্চম ব্যবহার করতেন; অথচ সনাতন রাগিণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে মালকোষে পঞ্চম বর্জিত। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ মালকোষ রাগে পঞ্চম প্রয়োগ করলেও ঐ রাগের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এখানেই তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রাগের স্বর পরিবর্তন ক'রে সনাতন রাগিণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নূতনত্ব আনার প্রচেষ্টায় হয় রাগ পরিবর্তন হয়, না হয় নূতন রাগ সৃষ্টি হয়। যেমন 'বিভাস'। কোমল "রে" এবং কোমল "ধ" যুক্ত এই রাগ। শুদ্ধ "রে" "ধ" যুক্ত বা কোমল "রে" ও শুদ্ধ "ধ" যুক্ত 'বিভাস' রাগ আছে। "রে" ও "ধ"র শ্রুতির পরিবর্তন ক'রে গায়করা তিন চার রকম বিভাস গাইতেন। তারই মধ্যে একটি "দেশকার" নামে পরিচিত।

আবার "ললিত" রাগে কেউ তীব্র ধৈবত ব্যবহার করেছেন, কেউ কোমল ধৈবত ব্যবহার করেছেন। তাতে ঠাটের পার্থক্য ঘটেছে (যেমন প্রথম ক্ষেত্রে মাড়োয়া এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্বী ঠাট) অথচ দুই-ই ললিত রাগ হিসাবেই প্রচলিত।

ঘরাণা-র ক্ষেত্রে অনেক সময় গোঁড়ামিও লক্ষ্য করা যায় বা গায়কদের বিশেষ কোন নির্দেশ মেনে চল্‌তে হয়। যেমন গোয়ালির ঘরাণায় ঠুংরী গাওয়া নিষিদ্ধ। আবার সেনী ঘরাণায় বাদ্যযন্ত্রীদেরও কণ্ঠসংগীতের সংগে পরিচয় অপরিহার্য।

ঘরাণার উদ্ভব

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিন্তু 'ঘরাণা' সৃষ্টির ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। 'ঘরাণা' র সৃষ্টি হয় ধ্রুপদ সৃষ্টির আগে অর্থাৎ আলাউদ্দীন খিলজীর সময় থেকে। তারপব ধ্রুপদ এবং খেয়ালের বিভিন্ন ঘরাণার সৃষ্টি হতে থাকে। গমক, সূক্ষ্ম তান, মীড়, বোল বা বাণী, লয়—এইগুলি প্রয়োগের পার্থক্য বিভিন্ন ঘরাণা সূচিত করেছে।

আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে প্রধানত দু'টি ঘরাণার উদ্ভব হয়: (১) কলাবন্ত ঘরাণা, (২) কাওয়াল ঘরাণা।

কলাবন্ত ঘরাণা—এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন বৈজুবাওরা। দক্ষিণ ভারতের নায়ক গোপাললাল এই ঘরাণাকে রক্ষা করেন।

কাওয়াল ঘরাণা—আলাউদ্দীন খিলজীর সভাগায়ক আমীর খসরু কাওয়াল ঘরাণার প্রবর্তক। বলা হয়ে থাকে যে, জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী এ ঘরাণার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

এই ঘরাণা দু'টি যখন সৃষ্টি হয় তখন যে-সব বিখ্যাত গায়ক এবং বাদকরা ছিলেন তাঁরা নিজেদের এই দুই ঘরাণায় বিভক্ত করেন।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মত অনুসারে তৃতীয় ঘরাণার সূচনা করেন সানাই ও তবলা বাদকেরা। চতুর্থ ঘরাণার সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, রাজদরবারে মহিলা গায়ক এবং নর্তকীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বাদকেরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করতেন তাঁরাই চতুর্থ ঘরাণার প্রবর্তন করেন। তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘরাণার ওস্তাদের বলা হ'ত মীরাসি এবং ঢাঢ়ী।[১]

১। "With the increase of the number of female singers and dancing girls in the Royal court, there arose a fourth gharānā of the instrumen-

সেনী ঘরাণা

তানসেনের মৃত্যুর পর সেনী ঘরাণার উদ্ভব হয়। তবে এই ঘরাণার তিনটি শাখা: (১) প্রথম শাখার উদ্ভব হয় তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ থেকে। এই ঘরানার গায়করা গৌড়বাণী ধ্রুপদের গায়ক। (২) দ্বিতীয় শাখার উদ্ভাবক তানসেনের অপর পুত্র সুরত সেন। এই ঘরাণার গায়করা ডাগরবাণী ধ্রুপদ-এর গায়ক। সুরত সেনের বংশধরেরা জয়পুরে বাস করতে থাকেন। (৩) তৃতীয় শাখার সুরু তানসেনের জামাতা (সরস্বতীদেবীর স্বামী) মিশ্রি সিং থেকে। মিশ্রি সিং-এর বংশধরেরা প্রধানত বীণকার এবং তাঁরা ডাগরবাণী এবং খাণ্ডারবাণী এই দুটি বাণীর ধ্রুপদ পরিবেশন করতেন।

বিভিন্ন ঘরাণা

সেনী ঘরাণার উপরোক্ত তিনটি শাখা ছাড়া আরও দুটি বিখ্যাত ঘরাণার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিজচাঁদ ও সুরদাস। মথুরাকে কেন্দ্র করে এই ঘরাণা গড়ে ওঠে অপর ঘরাণাটির স্রষ্টা চাঁদ খাঁ ও সুরয খাঁ। এই ঘরাণা হ'ল পাঞ্জাবে প্রচলিত ধ্রুপদের তিলমন্ডী ঘরাণা। ক্রমশ আরও ঘরাণা গড়ে উঠতে থাকে। এই সমস্ত ঘরাণার মধ্যে কোনটি ধ্রুপদের ঘরাণা, কোনটি খেয়ালের ঘরানা, কোনটি বা খেয়াল এবং ধ্রুপদের ঘরাণা। আবার কণ্ঠ সংগীতের ঘরাণার পাশে যন্ত্রসংগীতের ঘরাণাও গড়ে ওঠে। বিখ্যাত বীণকার এবং সংগীতজ্ঞ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর 'Hindusthani Music and Mian Tansen' নামক গ্রন্থে পনেরটি ঘরানার উল্লেখ করেছেন:

(১) ধ্রুপদ এবং রবাব-এর সেনী ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্নৌ এবং বারাণসী-র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এবং বাসৎ খাঁ।

(২) সেনী-বীণকার-ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্নৌর নির্মল শাহ।

(৩) কাওয়াল ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্নৌ এবং গোয়ালিয়রের বড়ে মহম্মদ খাঁ কাওয়াল।

---

talists accompanying them. The Ustads of the third and the fourth gharānās were called Mirāsis and Dhādis"—B. K. Roychoudhury. 'Hindusthani Music and Mian Tānsen', Calcutta. p. 25.

(৪) খেয়ালের গোয়ালিয়র ঘরাণা। বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হস্‌সু খাঁ এবং নাথ্‌থু খাঁ এই ঘরাণার উদ্ভাবক।

(৫) ধামারের আগ্রা ঘরাণা। এই ঘরাণার স্রষ্টা খাঁ (ধামার)-এর বংশধরেরা। তাঁরা পরবর্তীকালে শাহ সদারঙ্গ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

(৬) ধ্রুপদের বেতিয়া ঘরাণা। লক্ষ্ণৌএর হায়দার খাঁ সেনীর শিষ্যবৃন্দ এই ঘরাণার সৃষ্টি করেন। এঁরা বারাণসীর কথক। এই ঘরাণার সঙ্গে কল্পীর মুসলমান ওস্তাদদের নামও জড়িত।

(৭) ধ্রুপদের বিষ্ণুপুর ঘরাণা। এই ঘরাণার স্রষ্টা বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য।

(৮) পাঞ্জাবে প্রচলিত ধ্রুপদের তিলমনড়ী ঘরাণা।

(৯) লাহোর ঘরাণা। শাহ সদারঙ্গ-এর শিষ্য পাঞ্জাবী খেয়াল গায়করা এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন।

(১০) খেয়াল এবং ধ্রুপদের অতরুলী ঘরাণা। মথুরার ব্রাহ্মণরা এই ঘরাণার সৃষ্টি করেন। এঁরা পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নেন।

(১১) ডাগর ঘরাণা। বিখ্যাত বাঙ্গরাম খাঁ ডাগর এই ঘরাণার প্রবর্তক। তিনি মথুরার পুরোহিতদের বংশধর।

(১২) সেতারের সেনী ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা হয় জয়পুরে। প্রতিষ্ঠাতার নাম অমৃত সেন।

(১৩) শাহারানপুরের সরোদ ঘরাণা। নির্মল শাহ সেনীর পুত্র এবং ওমরাও খাঁ-র শিষ্যবৃন্দ এই ঘরাণার স্রষ্টা।

(১৪) বাসৎ খাঁ সেনী-র শিষ্য নিয়ামতুল্লা খাঁ একটি সরোদ ঘরাণা সৃষ্টি করেন।

(১৬) লক্ষ্ণৌ-এর সেতার ঘরানা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা ওমরাও খাঁ সেনীর শিষ্য মহম্মদ খাঁ।

সেনী ঘরাণার একটি শাখার স্রষ্টা বিলাস খাঁ।

বিলাস খাঁ-এর পৌত্র করিম সেনের দুই পুত্র সুধর খাঁ ও রাজরস খাঁ। রাজরস খাঁ-এর পুত্র মসীদ খাঁ-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। সুধর খাঁ-এর পুত্র হাসান খাঁ এবং তাঁর পুত্র গোলাপ খাঁ—দু'জনেই উত্তম ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। গোলাপ খাঁ-এর তিন পুত্র ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ এবং জীবন খাঁ। এদের

মধ্যে ছজ্জু খাঁ ছিলেন রবাব যন্ত্রে পারদর্শী এবং জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ ছিলেন ধ্রুপদী। এঁরাই দিল্লীর দরবারের শেষ সংগীতজ্ঞ।

দিল্লীর দরবার ভেঙে গেলে তানসেনের নিজ বংশধরগণ পূর্বদিকে চলে গেলেন এবং তাঁর শিষ্যবংশীয় সংগীতজ্ঞগণ রাজপুতানার রাজাদের সভায় স্থান লাভ করলেন। তানসেনের পুত্র বংশীয় রবাবীগণ কাশীধামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এবং নিকটবর্তী হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই সময় (অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) অযোধ্যার নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেওয়ার রাজা, কাশীর রাজা প্রভৃতি সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

উপরে যে ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ-র কথা বলা হয়েছে এঁদের মধ্যে জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন। জীবন খাঁ-র তিন পুত্র বাকর খাঁ, হায়দার খাঁ, বাহাদুর খাঁ। এঁদের মধ্যে বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইতিপূর্বেই বিষ্ণুপুরে চলে আসেন। হায়দার খাঁও একজন সুনিপুণ ধ্রুপদী ছিলেন। তাঁর শিষ্যবংশ কানপুরের নিকটে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

ছজ্জু খাঁ-র তিন পুত্র—জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এবং বাসৎ খাঁ। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এই ত্রিরত্নের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। গীত এবং বাদ্যে তাঁদের সমসাময়িক কালে তাঁরা ছিলেন সবার শীর্ষে। ছজ্জু খাঁ-র পূর্ব পুরুষ ধ্রুপদ গেয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁরা যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী হ'লেও যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান বিশেষ করতেন না। ছজ্জু রবাব যন্ত্রের চর্চা করেন এবং রবাবের কয়েকটি নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। জাফর খাঁ, প্যার খাঁ পিতা ছজ্জুর কাছে সংগীত বিদ্যা শিক্ষা করেন। বাসৎ খাঁ-র গুরু ছিলেন তাঁর খুল্লতাত জ্ঞান খাঁ। এছাড়া তানসেনের দৌহিত্র বংশের নির্মল শাহ-এর কাছেও এই তিন ভাই সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন।

বাসৎ খাঁ-র নাম কলকাতা শহরে এক সময়ে খুবই পরিচিত ছিল। লক্ষ্ণৌ-এর দরবার ভেঙে যাওয়ার পর নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ[১]-র মেটিয়াবুরুজ দরবারে স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জাফর খাঁ, প্যার খাঁ,

১। ওয়াজেদ আলী শাহ-র বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগ এনে লর্ড ডালহৌসী তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন।

বসৎ খাঁ—এই তিন ভাই-ই লক্ষ্ণৌ দরবারে ছিলেন। তাছাড়া ওমরাও খাঁ, বীণকার গোলাম মহম্মদ খাঁ এবং কাওয়ালঘরের বিশিষ্ট খেয়াল গায়কগণও লক্ষ্ণৌ দরবারে ছিলেন। কলকাতার রাজা হরকুমার ঠাকুর বাসৎ খাঁ-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হরকুমার ঠাকুর তাঁকে 'সংগীত নায়ক' উপাধি দান করেন। এই কলকাতায় অবস্থান কালেই জাফর খাঁ-র পৌত্র কাশীম আলী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিখ্যাত সরোদবাদক নিয়ামতুল্লাও তাঁর শিষ্য।

জাফর খাঁ যন্ত্র সংগীতে সিদ্ধ ছিলেন। বীণা এবং রবাব এই উভয় যন্ত্রের বাদন প্রণালীর মিশ্রণ ক'রে তিনি সুরশৃঙ্গার বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি করেন। প্যার খাঁও সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। জাফর খাঁ এবং প্যার খাঁ সংগীত বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শীতা লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু বাসৎ খাঁ-র শিক্ষা ছিল নানামুখী। তিনি শুধু যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতেই যে পারদর্শী ছিলেন তা নয়। সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। দৈব দুর্বিপাকে তাঁর হাত পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় রবাব বাদন তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু আজীবন তিনি কণ্ঠ-সংগীত সাধনাকে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

বাসৎ খাঁ-র শিষ্যদের মধ্যে আমরা পাই কাশেম আলী, নিয়ামতুল্লা খাঁ (সরোদ), হরকুমার ঠাকুর প্রভৃতিকে। বাসৎ খাঁ-র তিন পুত্র; আলী মহম্মদ, মহম্মদ আলী, বিয়াসৎ আলী। প্রথমোক্ত দুইজনের সঙ্গে বাংলা দেশের সংগীত জগতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। আলী মহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে যেমন রয়েছেন পাটনার প্যারে নবাব খাঁ, বারাণসীর মিঠাইলাল, জলন্ধরের মীর সাহেব, তেমনি রয়েছেন বাংলা দেশের তারা প্রসাদ ঘোস, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নান্নে খাঁ, রামসেবক মিশ্র প্রভৃতি। মহম্মদ আলী খাঁ-র শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন গয়ার কানাইলাল টেড়ী, ঠাকুর নবাব আলী খাঁ (এঁর শিষ্য মুর্শিদাবাদের কাদের বক্স, নবাব সাদৎ আলী খাঁ, ছম্মন সাহেব) গয়ার বিহারীলাল পাণ্ডা এবং বাংলা দেশের গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সওকৎ আলী খাঁ প্রভৃতি।

প্যার খাঁ-কে শুধুমাত্র গায়ক বা বাদক বলা চলে না। তিনি ছিলেন উঁচুদরের সংগীত স্রষ্টা। তিনি 'তিলক-কামোদ' নামক গভীর অথচ সুমধুর রাগ সৃষ্টি করেন। 'দেশ', 'বিহাগ' ও 'কামোদ' এই তিন রাগের মিশ্রণে এই রাগিণীর সৃষ্টি। নূতন সৃষ্টিতে প্যার খাঁ ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি রবাবী গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন বীণার ঝংকার, ধ্রুপদের ধীর উদাত্ত রসের সঙ্গে

মিশিয়েছিলেন হোরির লালিত্ব। এই অপূর্ব মিশ্রণ তাঁর সংগীতকে করেছিল আকর্ষণীয়।

প্যার খাঁ-র যুগপৎ উত্তর সাধক ও প্রতিযোগী তানসেনের দৌহিত্র বংশের বীণকার ওমরাহো খাঁ। এঁর দুই পুত্র আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ। ওমরাহো খাঁ-র সংগীত পদ্ধতি ছিল প্যার খাঁ-রই অনুরূপ। অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে লীলায়িত ছন্দ।

প্যার খাঁ-র শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন বেতিয়ার আনন্দকিশোর, গুরুপ্রসাদ মিশ্র (গুরুপ্রসাদের দুই শিষ্য—লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার), নবাব হসমৎ জং, বখ্‌ তাওরজী, বাহাদুর সেন (ছজ্জু খাঁ-র দৌহিত্র), শিবনারায়ণ মিশ্র।

বেতিয়ার 'কথক' ঘরাণা

প্যার খাঁ রেওয়ার অধিপতি মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের দরবারে যেতেন। বিশ্বনাথ সিংহ সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি ছিলেন জাফর খাঁ-র শিষ্য। প্যার খাঁ-র শিষ্য বেতিয়ার মহারাজ আনন্দ কিশোর একজন দক্ষ ধ্রুপদী ছিলেন। ইনি নিজে ধ্রুপদ রচনা করতেন এবং কথক ব্রাহ্মণদের সংগীত শিক্ষা দিতেন। বেতিয়ার কথক ঘরাণার ওস্তাদরা তাঁর শিষ্য বংশ থেকেই এসেছেন।

উপরে উল্লিখিত বখ্‌ তাওরজী, শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি বেতিয়ার কথক ঘরাণার সংগীতজ্ঞ। কলকাতার বিখ্যাত ধামার গায়ক বিশ্বনাথ রাও শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য। জোড়াসাঁকো-ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শেষ গুরু শ্যামসুন্দর মিশ্রও এই শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য। এছাড়া সংগীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী বেতিয়ার এই শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে খেয়াল গান শিক্ষা করেন।

তানসেনের কন্যাবংশ

তানসেনের কন্যাবংশ শুরু হয় তানসেন কন্যার দ্বিতীয় পুত্র হাসান খাঁ থেকে। এই বংশের লাল খাঁ-র পুত্র নিয়ামৎ খাঁ (সদারঙ্গ) খেয়াল গানের প্রচারক হিসাবে বিখ্যাত। নিয়ামৎ খাঁ-র দুই পুত্র ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) এবং ভূপৎ খাঁ (মহারঙ্গ)। মহারঙ্গের দুই পুত্র জীবন শাহ এবং প্যার খাঁ। জীবন

শাহর দুই পুত্র ছোট নবাৎ খাঁ (রসবীণ খাঁ বা রাঙারঙ্) ও নির্মল শাহ বীণকার হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নির্মল শাহ ধ্রুপদের চার বাণীতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি শিষ্যদের খেয়াল এবং ধ্রুপদ দুই-ই শিক্ষা দিতেন। রসবীণ খাঁ-র বাদ্য ছিল ললিত-মধুর, আর নির্মল শাহর বাদ্যে ছিল উদাত্ত ভাবের রস।

নির্মল শাহ-র প্রিয় শিষ্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ওমরাও খাঁ। এই ওমরাও খাঁ-এর বহু শিষ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে কুতুবুদ্দৌলা, গোলাম মহম্মদ খাঁ এবং তাঁর পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, বান্দার নবাব হস্মৎ জং প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ দীর্ঘকাল কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাবাদক ছিলেন।

জয়পুর বা বিকানীর ঘরাণা

তানসেনের বংশের যাঁরা সেতারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তাঁরাই জয়পুর বা বিকানীর ঘরাণার প্রবর্তক। এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হ'ল যন্ত্রসংগীতের ঢং-এ কণ্ঠসংগীত পরিবেশন। তানসেন বংশের অমৃত সেন সেতারে অপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর পরে নিহাল সেন সেতারী হিসাবে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

মনরঙ্গ বংশজাত আহম্মদ আলী খাঁ-থেকে এই ঘরাণা পরিচিত লাভ করে। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এই ঘরাণার একজন উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ।

জয়পুর ঘরাণার কণ্ঠ-সংগীতের বৈশিষ্ট্য এইরূপ: (১) গানের সংক্ষিপ্ত বন্দিশ, (২) বক্রতান এবং আলাপে ছোট ছোট তান, (৩) খোলা আওয়াজ।

আগ্রা ঘরাণা

অলক দাস, খলক দাস, লবঙ্গ দাস এবং মলক দাস—এঁরা চার ভাই। এঁদের মধ্যে অলক দাস এবং মলকে দাস সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। এঁরা দু'জনই আগ্রা ঘরাণার স্রষ্টা। এই ঘরাণার প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে আমীর বক্স (এঁর, শিষ্য—কিরাণাবাসী ধ্রুপদী কেরামত্ খাঁ), নথন খাঁ, গুলাম আব্বাস খাঁ, লতাফত হোসেন, ফৈয়াজ খাঁ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে ফৈয়াজ

খাঁ-র খ্যাতি ছিল ব্যাপক, মহীশূরের মহারাজা তাঁকে 'আফ্‌তাব্‌ এ মৌসিকী' অর্থাৎ সংগীতের ভাস্কর উপাধি দান করেন। ফৈয়াজ খাঁ ছিলেন গোলাম আব্বাস খাঁ-র শিষ্য।

আগ্রা ঘরাণার বিশেষত্ব হ'ল—(১) 'নোম তোম' শব্দ সহযোগে আলাপ, (২) খোলা আওয়াজ, (৩) খেয়াল গায়কীর সাথে ধ্রুপদ ধামার গাওয়া, (৪) বোলতানের বিশেষ ব্যবহার।

গোয়ালিয়র ঘরাণা

গুলাম রসুলের কন্যা বংশের ধারা থেকেই গোয়ালিয়র ঘরাণার উদ্ভব হয়েছে। কাওয়াল বংশে গুলাম রসুলের জন্ম হয়। শাহ সদাবঙ্গ যে দু'জন কাওয়াল বালককে প্রতিপালন করেছিলেন গুলাম রসুলকে তাদের একজন বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে, অপরজন মিঞা জানী। গুলাম রসুল লক্ষ্ণৌ এ বাস করতেন। তিনি কাওয়ালী রীতির সঙ্গে সদারঙ্গ প্রবর্তিত রীতির মিশ্রণে খেয়াল গাইতেন। গুলাম রসুলের দুই দৌহিত্র শক্কর এবং নত্থন পীর বক্স (মত্থন পীরবক্স) ছিলেন গোলিয়রের অধিবাসী। নত্থন পীরবক্স ধ্রুপদী হলেও সদারঙ্গ প্রবর্তিত খেয়াল গাইতেন। তাঁর পৌত্র হদ্দু, হস্সু ও নথু খেয়াল গানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই তিন বংশ থেকে খেয়ালের তিনটী রীতির প্রচলন হয়। কাওয়ালী রীতি, খেয়াল রীতি এবং খেয়ালের ধ্রুপদী রীতি। এই শেষোক্ত রীতির মধ্যে রয়েছেন নিসার হোসেন, বিষ্ণুদিগম্বর, বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন প্রভৃতি। এঁদের প্রচারিত সূত্রে প্রবাহিত গোয়ালিয়র ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল: (১) খোলা আওয়াজ, (২) ধ্রুপদাঙ্গের খেয়াল, (৩) সপাট তান, (৪) বোলতান লয়কারী, (৫) গমকের প্রয়োগ।

কিরাণা ঘরাণা

যন্ত্র সংগীতে কিরাণা ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা বন্দে আলি খাঁ। ইনি তানসেনের বংশের নির্মল শাহ-এর শিষ্য। কণ্ঠ-সংগীতে কিরাণা ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা বাজিদ আলী। কিরাণা ঘরাণার (কণ্ঠ-সংগীত) প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে আব্দুল করিম, আব্দুল ওয়াহিদ, হীরাবাঈ বরদেকার, সরস্বতী বাঈ রাণে, ভীমসেন যোশী, আমীর খাঁ, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, মৈজুদ্দীন খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই ঘরাণায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল : (১) স্বর লাগাবার বিশেষ ঢং, (২) এক একটি স্বর ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ প্রয়োগ, (৩) আলাপ প্রধান গায়কী, (৪) ঠুংরী অঙ্গ।

দিল্লী ঘরাণা

দিল্লী ঘরাণা-র প্রবর্তক তানরস খাঁ। এই ঘরাণার বিখ্যাত ওস্তাদ হলেন জহুর খাঁ, আলতাফ হোসেন, আজমত্ হোসেন প্রভৃতি।

এই ঘরাণার বিশেষ লক্ষণ হল : (১) তৈরী তান, (২) খেয়ালের কলাপূর্ণ বন্দিশ, (৩) দ্রুতলয়ে বোলতান।

অত্রৌলি ঘরাণা

নথ্যু খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক। এই ঘরাণার প্রসিদ্ধ ওস্তাদের মধ্যে আল্লাদিয়া খাঁ, নথন খাঁ, নাসিরুদ্দিন, বদরুদ্দিন, কেশরবাঈ প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

অত্রৌলি ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল : (১) বক্রগতি সম্পন্ন গায়কী, (২) বোল অঙ্গের বিশেষ যোগ্যতা, (৩) অপ্রচলিত রাগ পরিবেশন, (৪) রাগের চলনে বিভিন্ন তানের প্রয়োগ, (৫) বিলম্বিতলয়ের খেয়াল।

পাঞ্জাব (আলিয়াফত্তু) ঘরাণা

পাঞ্জাব ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতার নাম বাবা কালিদাস। এই ঘরাণার বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দদের মধ্যে আলী বক্স, কালে খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঞ্জাব ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হ'ল : (১) খেয়ালের কলাপূর্ণ বন্দিশ, (২) সংক্ষিপ্ত খেয়াল, (৩) দ্রুত তানের কলাত্মক প্রয়োগ, (৫) টপ্পা এবং ঠুংরী অঙ্গে বিশেষ দক্ষতা।

বিষ্ণুপুর ঘরাণা

তানসেন-এর পুত্র বংশের জীবন খাঁ-র তৃতীয় পুত্র বাহাদুর খাঁ থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরাণার সৃষ্টি। বাংলা দেশের অন্তত তিন জন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের লিখিত

পুস্তক থেকে একথা জানা যায়।[১] রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিষ্ণুপুর' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্য ছাড়াও অন্যত্র বাহাদুর খাঁ-র সাংগীতিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

"বাহাদুর খাঁ-এর কাছে যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছিল তাতে যে সমস্ত গান ছিল তার অধিকাংশই তানসেনের। প্রথম পৃষ্ঠায় শোভিত ছিল তানসেনের নিজের হস্তাক্ষর। এই পাণ্ডুলিপিটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এই পাণ্ডুলিপিকে বাহাদুর খাঁ পবিত্র ব'লে মনে করতেন। একাশী বছর বয়সে তিনি তীর্থ ক'রতে মক্কায় যান এবং তিরাশী বছর বয়সে রামপুরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে যে উক্তি করেন তা নানা দিক থেকে স্মরণীয়: 'যে সংগীত আমি রেখে যাচ্ছি তার কোনো ক্ষয় নেই এবং অনন্তকাল ধ'রে তা বিকশিত থাকবে। যে সংগীত আমি প্রচার করেছি সে সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আমার মহান পূর্বপুরুষ তানসেনের ঐতিহ্য।"[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাহাদুর খাঁ তানসেনের ধ্রুপদের যে ঐতিহ্য বহন করেছিলেন তারই ওপরে বাংলাদেশের বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের এক নূতন ঘরোয়ানা গ'ড়ে ওঠে। এই বিষ্ণুপুর বহু পূর্ব থেকেই সংগীত চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল।

বিষ্ণুপুরে বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য গদাধর চক্রবর্তী এবং তাঁর থেকেই বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ সংগীতের ধারা প্রবাহিত। এই সংগীতধারার যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এই বিষ্ণুপুরের সংগীতধারা কলকাতায় ঠাকুরবাড়ীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে; রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন যদুভট্ট। রবীন্দ্রনাথের পিতা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে আমন্ত্রণ ক'রে এনে ব্রাহ্মসমাজের সংগীতাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এঁর অবদান সংগীতের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি

১। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিষ্ণুপুর', কলিকাতা (১৩৪৮), পৃঃ ৩২; বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান', কলিকাতা (১৩৬৪), পৃঃ ৬১; বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, 'ভারতীয় সংগীতকোষ', কলিকাতা (১৩৭২), পৃঃ ১৬৮।

২। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত 'তানসেন উৎসব'-এ সংগীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ।

করে। ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের শেষ সংগীত-শিক্ষকদের অন্যতম এই রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। যদুভট্ট এবং রাধিকাপ্রসাদ—এই দু'জনের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। যদুভট্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "এ রকম ওস্তাদ বাংলাদেশে জন্মায় নি।" রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশী।"[১]

রাধিকাপ্রসাদ যদুভট্ট ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং যদুভট্ট তো তাঁর সংগীত শিক্ষকই ছিলেন। সুতরাং বলা যায় "রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ও ধামারের ঘরোয়ানা ছিল বিষ্ণুপুর ধারার অনুবর্তী। বিষ্ণুপুর-ঘরোয়ানা বা ঘরাণায় সংগীতের ছিল একটা নিজস্ব ঢঙ্ ও একটি নিজস্ব গতি। রাগে ও বিকাশভঙ্গিতে ছিল একটু পৃথক ও বিশিষ্ট ভাব, -যদিও তার সৃষ্টির উৎস ছিল পশ্চিমী ঘরাণার সংগীত।"[২]

বাহাদুর খাঁ যেমন কণ্ঠ সংগীতের দিক থেকে বিষ্ণুপুরে সংগীতের ধারা সৃষ্টি করেন তেমনি ওস্তাদ পীরবক্স তাঁর শিষ্যদের মৃদঙ্গ বাদ্যে পারদর্শী ক'রে তোলেন। রামমোহন চক্রবর্তী তাঁর শিষ্য। মৃদঙ্গ বাদ্যে বিষ্ণুপুরের আর যাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগৎচাঁদ গোস্বামী, কুঞ্জচাঁদ গোস্বামী, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি অধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। 'রবীন্দ্রসংগীত', শান্তিদেব ঘোষ, কলিকাতা (১৯৬২), পৃঃ ৩৭।
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান', কলিকাতা (১৯৬৫), পৃঃ ৬৬।

উপসংহার

ভারতীয় সংগীতের যে দুটি প্রধান ধারা নিয়ে আলোচনা করা হ'ল এই দু'টী ধারা বর্তমানে সুস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত। ধ্রুপদ-এর চারটি তুক্ (অংশ)—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। দুই তুক্ (স্থায়ী, অন্তরা)-বিশিষ্ট ধ্রুপদও আছে। সেইজন্য একথা বলা ঠিক নয় যে দুই তুক্ বিশিষ্ট গান হ'লে খেয়াল গান আর চার তুক্ বিশিষ্ট গানকে ধ্রুপদ বলে। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের বিষয়বস্তুতে পার্থক্য বর্তমান। ধ্রুপদের বিষয়বস্তু প্রধানত হ'ল ঈশ্বরের লীলা বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা এবং রাজবন্দনা। খেয়াল-এর বিষয়বস্তু সাধারণত শৃঙ্গার রসাত্মক; অবশ্য কিছু কিছু প্রকৃতির বর্ণনাও পাওয়া যায় এই গানে।

ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে ব্যবহৃত তালেও পার্থক্য আছে। ধ্রুপদ গান গাওয়া হয় চৌতাল, ব্রহ্মতাল, সুরফাঁক, তেওড়া, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালে। খেয়াল গানে ব্যবহৃত হয় ঝুমরা, তিলুয়াড়া রূপক, তেওড়া, ঝাঁপতাল ও ত্রিতাল প্রভৃতি। অবশ্য এই ব্যাপারে উভয় প্রকার সংগীতে মিলও বর্তমান। যেমন—তেওড়া এবং ঝাঁপতালে ধ্রুপদ এবং খেয়াল দু-ই গাওয়া হয়।

ধ্রুপদ এবং খেয়াল-এর গায়কী রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধ্রুপদ গানের প্রকৃতি গম্ভীর, গতি ধীর। এই গানে গমক-এর প্রাধান্য। গিটকিরি বা তান এই গানে ব্যবহৃত হয় না। ধ্রুপদে গানটি সম্পূর্ণ গাইবার পর গানের বাটে বিভিন্ন ছন্দ দেখানো হয়; গানের বিভিন্ন অংশ (কলি) নিয়ে বিভিন্ন সুরে গেয়ে উপজ করা হয়। খেয়াল গানে বিস্তার, সরগম্, বোলতান এবং বিভিন্ন প্রকার তান প্রয়োগ করা হয়। এই গানে গমক-এর প্রয়োগ খুবই কম দেখা যায়। তান প্রয়োগে গিটকিরির ব্যবহার বেশী।

খেয়াল গানের ভাষার দিক থেকে বলা যায় যে, হিন্দী, গ্রাম্য হিন্দী, পাঞ্জাবী ও উর্দু মিশ্রিত ভাষায় খেয়াল রচিত হয়েছে। এই বাংলা দেশে বাংলা ভাষাতেও খেয়াল রচিত হয়েছে। রাধিকামোহন গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্তী বাংলা খেয়াল গেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বাংলা খেয়াল গাইতেন ব'লে জানা যায়। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ও বাংলা খেয়াল প্রচলনের প্রচেষ্টা করেছিলেন।[১] ইদানীং কালেও এ-দিক থেকে কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১। রবীন্দ্রলাল রায়, 'রাগ-নির্ণয়', কলিকাতা (১৩৫৬), ভূমিকা।

অবশ্য ভাষাটা খুব বড় কথা নয়—গানের প্রকৃতি তার গায়ন পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত।

খেয়াল গান আবার দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত—এই তিন লয়ে গাওয়া হয়। বিলম্বিত খেয়ালকেই প্রকৃতপক্ষে খেয়াল গানের প্রাণ বলা যায়। তবে দ্রুতলয়ে এবং দ্রুততান সহযোগেও খেয়াল গাওয়া হয়ে থাকে।

বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের খেয়াল ছাড়াও নানা ভাবে খেয়াল গানে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা হয়েছে। তার ফলে কয়েক ধরণের গীতি-রীতি প্রচলিত হয়েছে।

খেয়ালের অন্তর্ভুক্ত এই রীতিগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে 'তরাণা বা তেলেনা'। নাদের্ দের দানি দিন তানা আলা সুম তোম নোম্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ ক'রে রাগ ও তাল যোগে গান করাকে তরাণা বলে। রাগের আলাপে এবং তরাণায় ব্যবহৃত শব্দগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু তাদের গঠন ছন্দ অনুযায়ী। সুর ছন্দ ও লয়ের বাহন হিসেবেই এগুলির ব্যবহার চ'লে আসছে। যন্ত্রসংগীতে যেমন ভাষার পরিবর্তে বোলের মাধ্যমে স্বরগুলি সুন্দর ছন্দে ধ্বনিত হয়, কণ্ঠেও ঐরূপ বোলের মত তরাণার বাণী ধ্বনিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, গানের সুর মাধুর্য উপভোগের পক্ষে ভাষা অন্তরায়। তরাণায় সেই অন্তরায় অপসারিত হয় এই গানে শব্দ ঝঙ্কার এবং সুরমাধুর্যই শ্রোতার কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

'ত্রিবট'ও খেয়াল অঙ্গের এক প্রকার গান। এতে থাকে তিনটী তুক। এই তিনটীর একটীতে গানের কথা (অর্থবোধক শব্দ বা বাক্য)। আর একটিতে তরাণা (নিরর্থক শব্দ) এবং অপরটীতে বাদ্যের বোল, রাগ ও তাল যোগে গীত হয়। এই তিনটী তুকের মধ্যে যে কোনও একটীতে 'ত্রিবট' শব্দের উল্লেখ থাকে।

'চতুরঙ্গ'ও খেয়ালেরই পর্যায়ভুক্ত। এতে চারটী তুক। এই চারটী তুকের মধ্যে একটীতে বাণী (অর্থবোধক শব্দ বা বাক্য), একটীতে তরাণা (নিরর্থক শব্দ), একটীতে সরগম এবং একটীতে বাদ্যের বোল যথাক্রমে উচ্চারিত হয়। এই গানের প্রথম কলিতে চতুরঙ্গ শব্দটীর প্রয়োগ থাকবে।

আগের অধ্যায়ে ঘরোয়ানা আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঘরোয়ানার বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। গায়নরীতির নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সূচিত হয়েছে, তাও কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এবং থাকতে পারে না। কারণ পরিবর্তন বা গতিশীলতাই শিল্পের প্রাণ এবং পরিবর্তন বা গতিশীলতাই বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক।

খেয়াল গান তাল ও মাত্রায় নিবদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিলম্বিত খেয়ালে নিবদ্ধতার মধ্যে ও আলাপের অনিবদ্ধ প্রকৃতি আসতে পারে। আলাপচারী খেয়াল তার উদাহরণ। রহমৎ খাঁ এবং আবদুল করিম খাঁ এই ধরণের খেয়ালের প্রচলন করেন। আব্দুল করিম খেয়ালে 'সরগম'-এর সাহায্যে ছন্দ ও রাগ বিস্তার-এর রীতি চালু করেন।

খেয়ালে আর একটা নূতনত্ব হচ্ছে কম্পিত স্বরে তান দেওয়া। এই কম্পিত স্বরে তান দেওয়ার ফলে শ্রুতির ব্যবহার স্বভাবতই কমে যায়। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে স্বর-কম্পন ছিল না - এমন নয়। সেই স্বর-কম্পন ছিল গমকের অঙ্গ এবং তা পাশাপাশি স্বরের সাহায্যে নেওয়া হতো। কিন্তু খেয়াল গানে বর্তমানে কম্পিত স্বরে যখন তান দেওয়া হয় তখন মূল স্বরই কাঁপে। তার ফলেই পাশাপাশি স্বরের শ্রুতির ব্যবহার সম্ভব হয় না।

ভারতীয় সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, গায়ক শুধু যান্ত্রিক ভাবে গানের আবৃত্তি করেন না—গায়ক সর্বত্রই রচয়িতা। অপরের রচনার বিস্তার ও তার পরিবর্তনের অধিকার তাঁর থাকে। শুধু রাগ-সংগীত নয়, কীর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কীর্তনীয়ারা আখর দিয়ে কীর্তনের ভাব ও ভাষার বিস্তার ক'রে থাকেন। এই স্বাধীনতার জন্যেই যেমন ভারতীয় সংগীতের আকর্ষণ বেড়েছে, তেমনি এই স্বাধীনতাই নানা ঘরাণার সৃষ্টি করেছে।

গানের স্বরলিপিতে গানের কাঠামোটাকে ধরা যায় সত্যি কিন্তু গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে গায়কের যে গায়কীর ওপরে তাকে যথাযথ ভাবে ধ'রে রাখা কঠিন। অথচ বিশিষ্ট গায়ন-রীতি থেকেই নূতনের পথ মুক্ত হয়ে গেছে বার বার।

শব্দসূচী